# সূর্যাবর্ত

# সূর্যাবর্ত

## রবীন্দ্রকবিতা-সংকলন

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলকাতা

# সূচনা

সঞ্চয়িতার কোনো বিকল্প নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যাঁরা পড়েন, পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় জুড়ে এ-বই তাঁদের জীবনযাপনেরই একটা অংশ হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত সংগ্রহে বেশ-কিছু বাংলা বই আছে অথচ সঞ্চয়িতা নেই, এমন পাঠকের কথা আজ কল্পনা করাও শক্ত, আজও পর্যন্ত অনেকেরই কাছে এ-বই রবীন্দ্রসাহিত্যের সহজতম প্রবেশপথ। আর, এ-পথে চলবার অভ্যাস এতই দৃঢ়মূল আর দীর্ঘস্থায়ী যে এর আকস্মিক কোনো পরিবর্তন আজ সম্ভবও নয়, হয়তো-বা কাম্যও নয়। কাম্য নয়, কেননা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব রুচির একটা নিশানা এর মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে, পাঠকদের দিক থেকে সব সময়েই আগ্রহ থাকবে এই রুচিটাকে বুঝবার। তাই, সঞ্চয়িতার কোনো বিকল্প হতে পারে না।

কিন্তু তাই যদি হবে, তা হলে আবারও এক বা একাধিক রবীন্দ্রকাব্য-সংকলনেব প্রস্তাব কেন ওঠে, কখনো কখনো?

সে-প্রস্তাবের একটা কারণ হতে পারে সঞ্চয়িতার আয়তনগত বিপুলতা। অনেকসময়ে এ-রকম মনে হয় যে, দ্রুততার এই যুগে কোনো হ্রস্বতর সীমার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটা পরিচয় হয়তো তুলে ধরা সম্ভব, সঞ্চয়িতার পাশাপাশি যে-পরিচয় একদিন ছিল চয়নিকার মধ্যে। চয়নিকার প্রথম প্রকাশ অবশ্য সঞ্চয়িতার বাইশ বছর আগে, কিন্তু দ্বিতীয়টি ছাপা হতে শুরু করবার পরেও প্রথমটিকে তুলে নেওয়া হয় নি, বরং তার পরেও বেশ-কিছুদিন পর্যন্ত এর কয়েকটি পুনর্মুদ্রণ আমরা দেখতে পাই। আজ সে-বই দুর্লভ, কিন্তু অনুরূপ-কোনো সংকলনের প্রয়োজন হয়তো-বা ফুরোয় নি আজও।

আয়তনটাই যে একমাত্র সমস্যা তা অবশ্য নয়। সমস্যা আছে নির্বাচনেরও। সঞ্চয়িতায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব রুচির একটা নিশানা আছে, এ কথা বলেছি। কিন্তু ও-বইয়ের বিপুল আয়তনের মধ্যেও তাঁর পছন্দমতো সব কবিতাই কি আশ্রয় পেয়েছিল সেদিন? আমাদের মনে পড়ে, আবু সয়ীদ আইয়ুব আর হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' (১৯৪০) বইটি প্রকাশিত হবার পর বুদ্ধদেব বসুকে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ: 'সংকলনকর্তার কাছে আমার একটা কৃতজ্ঞতা নিবেদন করবার আছে। দীর্ঘকাল হোলো শিশুতীর্থ ব'লে একটি গদ্যছন্দের রচনা বানিয়েছিলেম। আজ পর্যন্ত সেটা যে কারো চোখে পড়েছে তার কোনো প্রমাণ পাই নি। তোমরা যে সেই কক্ষচ্যুত পথহারাকে অখ্যাতি থেকে উদ্ধার করেছ এতে খুশি হয়েছি।' খুশির এই খবরটি শুনবার পরেই আমাদের কৌতূহল জাগে: রবীন্দ্রনাথ নিজেই-বা কেন সেই পথহারাকে তাঁর সংকলনে জায়গা দেন নি? 'আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রকাশের আগেই সঞ্চয়িতার যে তিনটি সংস্করণ আর চারটি মুদ্রণ পাওয়া যাবে, তার অনেক গ্রহণবর্জনের ইতিহাসে কখনোই কেন পৌঁছতে পারে না 'শিশুতীর্থ'র মতো কবিতা?

এই একটিমাত্র লেখার কথাই নয়। ধরা যাক একেবারে ভিন্ন স্বাদের আরো একটি কবিতার প্রসঙ্গ। 'প্রহাসিনী'র 'আধুনিকা' (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫) বিষয়ে মৈত্রেয়ী দেবীকে একদিন বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, 'ওটা ভালো কবিতা, তোমরা ওটা বেশি লক্ষ্য কর নি।' এই লক্ষ্যে-আনাটাই তো সংকলনগ্রন্থের অন্যতম একটা কাজ? অথচ আমরা দেখতে পাই যে তাঁর নিজের বিবেচনামতো সেই 'ভালো কবিতা'টিও কিন্তু সঞ্চয়িতার অন্তর্গত নয়, তার তৃতীয় সংস্করণে। গদ্যকবিতা পছন্দ হয় না শুনে মৈত্রেয়ী দেবীকেই আরো একবার তিনি বলেছিলেন,

'দেখ একবার, contradiction কি রকম তোমার মধ্যে। "লিপিকা" কেন ভালো লাগে? সে তো গদ্য কবিতা, বিশুদ্ধ গদ্য কবিতা। লেখাটা গদ্যের ছাঁচে, এই মাত্র তফাৎ।' কয়েকটি কবিতাই যে আছে 'লিপিকা'র প্রথম অংশে, বইটির প্রথম প্রকাশের সময়ে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীনভাবে তা বলতে পারেন নি। সে-কুণ্ঠা দূর হয়েছিল 'পুনশ্চ'র কবিতাগুলি প্রকাশ করবার সময় থেকে। কিন্তু পাঠকের অনভ্যাসের কথা তো জানতেন তিনি; কতই ভালো হত যদি 'লিপিকা'রও কয়েকটি রচনা সঞ্চয়িতার অন্তর্গত থেকে গদ্যকবিতার একটা নতুন ধারণা দিত সেদিনকার পাঠককে।

এ-রকম আরো কিছু উদাহরণ সংগ্রহ করা নিশ্চয় সম্ভব। সম্ভব এইটে দেখা যে আমাদের অনেক প্রিয় কবিতা (কখনো কখনো কবির নিজেরও যা প্রিয়) এই সংকলনে পাই না আমরা, পাই না 'ভাষা ও ছন্দ' বা 'পতিতা'র মতো সমৃদ্ধ রচনাগুলি, 'কড়ি ও কোমল' থেকে পনেরোটি কবিতা গৃহীত হলেও সেখানে দেখতে পাই না 'যৌবনস্বপ্ন'র মতো মেদুর কবিতা: 'আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ/ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।'

কিন্তু কেন-যে বইতে থাকে না এসব, সেটা বোঝাও এমন-কিছু শক্ত নয়। নির্বাচনের সময়ে রুচির একটা অস্থিরতা সবসময়েই কাজ করে, কখনো একটির দিকে কখনো অন্যটির দিকে ঝোঁক যায় মনের; তার ওপর সংকলয়িতাকে ভাবতে হয় আয়তনেরও কথা। 'মনের অবস্থা-পরিবর্তন হয়, মনোযোগের তারতম্য ঘটে', এ কথাও যেমন রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন সঞ্চয়িতার ভূমিকায়, তেমনি তিনি লিখেছিলেন যে ইচ্ছে থাকলেও কোনো-কোনো কবিতা দেওয়া হয় নি ওখানে, কেননা 'ছাপা অগ্রসর হতে হতে আয়তনের স্ফীতি দেখে ভীতমনে আত্মসংবরণ করেছি।'

আর তখনই মনে হয় আরো এক বা একাধিক সংকলনের সম্ভাবনার কথা, সঞ্চয়িতার বিকল্প হিসেবে নয়, তার পরিপূরক হিসেবে।

## ২

পরিপূরক হতে পারে অবশ্য দুভাবে। ওইসব উপেক্ষিত অথচ লক্ষযোগ্য কবিতাগুলিকে নিয়ে স্বতন্ত্র একটি সংকলন গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু সেক্ষেত্রে এই একটা সমস্যা থেকে যায় যে তার নিজস্ব কোনো ধারাবাহিকতা থাকে না, কবিমনের বিকাশের স্পষ্ট কোনো ছবি মেলে না সেখানে, একেবারেই বিচ্ছিন্ন আর দূরবর্তী কয়েকটি ভালো কবিতার সংগ্রহ হিসেবে দেখতে হয় তাকে। কিন্তু একটা সামগ্রিকতার কথা ভেবে, ভিন্ন-একটা নীতিও মানা সম্ভব, আর সেইটেই মানতে হয়েছে আমাদের এই সংকলনে। সঞ্চয়িতায় ব্যবহৃত কবিতামাত্রকেই বর্জন করা হয় নি এখানে, বরং তার বড়ো-একটা অংশ এ-বইতেও পাওয়া যাবে। 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত কবিতার একটা সাধারণ পরিচয় যাতে পেতে পারেন পাঠক, সে কথা মনে রেখে সবকটি কাব্যগ্রন্থ থেকেই অল্পবিস্তর কবিতা নেওয়া হয়েছে এখানে, কিন্তু নেওয়া হয়েছে সঞ্চয়িতার তুলনায় ন্যূনতর সংখ্যায়, আর, কিছু-বা ভিন্নতর নির্বাচনে। ছোটো বড়ো নানা মাপের প্রায় পাঁচশোটি কবিতা পাওয়া যাবে সঞ্চয়িতায়, আর এ-সংকলনে আছে দুশো বাহাত্তরটি, যার মধ্যে একশো তিরিশটি রচনা সঞ্চয়িতারই অন্তর্গত। অর্থাৎ, সঞ্চয়িতায় আছে এ-বইতে নেই, এমন কবিতার সংখ্যা সাড়ে-তিনশোর কিছু বেশি; আর, সঞ্চয়িতায় নেই কিন্তু এ-বইতে আছে, এমন লেখা পাওয়া যাবে একশো বিয়াল্লিশটি।

সব বই থেকে কবিতা নিলেও, নির্বাচনের সময়ে এখানে মনে রাখতে হয়েছে আরো দু-একটি কথা। এ-বইটির সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি সংগ্রহের পরিকল্পনা ছিল বিশ্বভারতীর, ছাপাও হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের কিশোরপাঠ্য রচনার সেই সংকলন: কৈশোরক। সাধারণভাবে তাই কিশোরপাঠ্য রচনাকে এই সংগ্রহের বাইরে রাখা আছে, 'শিশু'-জাতীয় বই থেকে নেওয়া হয়েছে ঈষৎ ভিন্ন ধরনের লেখা। এ ছাড়াও, এখানে গণ্য হয় নি গীতবিতানের গান। গানের বিস্তৃত জগৎ থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র এক সংকলন তৈরি করা সম্ভব এবং সংগত, কাব্যগ্রন্থ-বহির্ভূত গানকে রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর নির্বাচনের বাইরে রেখেছিলেন, প্রচলিত সঞ্চয়িতায় গীতবিতান-এর অংশটি হল উত্তরকালীন সংযোজন। বইয়ের আয়তনের কথা ভাবতে গিয়ে সে-সংযোজনের ঝুঁকি এখানে নেওয়া হয় নি, যদিও কাব্যগ্রন্থগুলির অন্তর্গত গান থেকে বেশ-কিছু রচনার নির্বাচন এখানে পাওয়া যাবে।

কবিতাগুলিকে সাজাবার সময়ে গ্রন্থানুক্রমকে কখনো কখনো যে ভেঙে দিতে হয়েছে, পাঠকেরা তা নিশ্চয় লক্ষ করবেন। কাব্যগ্রন্থের কাল নয়, এখানে অনুসৃত হল কবিতাগুলিরই কালক্রম। ফলে এখানে 'পুনশ্চ' কাব্যের 'শিশুতীর্থ' আর 'বাঁশি'র মাঝখানে চলে আসে 'পরিশেষ' বা 'বিচিত্রিতা'র কবিতা, 'পত্রপুট'-এর দুই কবিতার মাঝখানে এসে যায় 'শ্যামলী'র রচনা। ইচ্ছাকৃতভাবেই এই সাধারণ নীতির লঙ্ঘন আছে একটিমাত্র ক্ষেত্রে, যেখানে 'গান্ধারীর আবেদন'-এর ঠিক পরেই দেখা যাবে 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'। এ-দুটি রচনার ব্যবধান একেবারে দু-বছরের, কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন-যে দুটিকে সংলগ্ন রাখা হল তা হয়তো না বললেও চলে।

বিভিন্ন সংকলনে ব্যবহার করবার সময়ে কবিতার স্তবক বা পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসকে ঠিক একই চেহারায় রাখেন নি রবীন্দ্রনাথ। বিশেষত সঞ্চয়িতায় আমরা অনেকসময়েই দেখতে পাব কবিতার হ্রস্বতর বিন্যাস, বোঝাই যায় যে স্থানসংকুলানের জন্যই অগত্যা ওই হ্রস্বীকরণ। কিন্তু এই সংকলনে, স্তবক বা পঙ্‌ক্তির বিন্যাসে মূল কাব্যগ্রন্থেরই অনুসরণ আছে। দু-একটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে থাকলে 'পাঠপ্রসঙ্গ' অংশে তার উল্লেখ পাওয়া যাবে।

'পাঠপ্রসঙ্গ'টি অন্য একটি কারণেও দ্রষ্টব্য। কবির জীবনকালেই প্রকাশিত নানা সংকলনে আর সংস্করণে, কবিতাগুলির পাঠের অনেক বৈষম্য দেখা যায়। এর কোন্ পাঠ যে শেষ পর্যন্ত তাঁর অভিপ্রেত ছিল, আজ আর তা নিশ্চিত ভাবে বলা সহজ নয়। নানারকম বিবেচনার পর এসব বিকল্প পাঠ থেকে কোনো-একটিকে নির্বাচন করতেই হয়, এখানেও করা হয়েছে তা। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে বিকল্প পাঠগুলিরও যথাসম্ভব উল্লেখ আছে 'পাঠপ্রসঙ্গ' অংশে।

## ৩

আমাদের— আর রবীন্দ্রনাথের নিজেরও— অনেক প্রিয় কবিতা সঞ্চয়িতায় নেই, এ কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে পারে যেন এ-সংকলনে সবারই সব প্রিয় কবিতা মিলবে। কিন্তু তা নিশ্চয় অসম্ভব। পৃথিবীতে এমন কোনো কাব্যসংকলন সম্ভব নয় যার নির্বাচন সবাইকে খুশি করতে পারে। আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিষয়ে আরো একটু এগিয়ে এসে বলা যায় যে তাঁর কবিতার নতুন কোনো নির্বাচন কোনো একজন পাঠককেও তৃপ্তি দিতে পারবে না। কেননা, রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটা গৌরবই হয়তো এই যে প্রায় প্রতিটি পাঠকেরই মনে-মনে তাঁর

নিজস্ব একখানি রবীন্দ্রসংকলন আছে। ব্যক্তিভেদে রুচিভেদ অনিবার্য, এমন-কি এও অসম্ভব নয় যে একই ব্যক্তি হয়তো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রুচির বশবর্তী হন। অন্তত, বর্তমান নির্বাচনের কাজটি করতে গিয়ে এ-গ্রন্থের সংকলয়িতা তিনবার তিন ভিন্ন সূচী সাজিয়েছেন, আর ছাপার কাজ শেষ হয়ে আসবার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যেন আবারও পালটে দেওয়া যায় তাকে। হয়তো এ কথাই বলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতায় যখন তিনি লিখেছিলেন যে 'মনের অবস্থা-পরিবর্তন হয়, মনোযোগের তারতম্য ঘটে। অবিচার না হয়ে যায় না।'

অবিচার এখানেও তাই চোখে পড়বে অনেক। কোনো কবিতা কেন আছে, কোনো কবিতা কেন নেই, এ নিয়ে অনেকেরই ক্ষোভের সৃষ্টি হবে। পাঠকদের তখন কেবল মনে করিয়ে দেব চয়নিকার পুরোনো এই ভূমিকাংশটুকু : ' .... পাঠকদের সকলকেই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করিতে পারেন এমন চয়নকর্ত্তা কোথাও মিলিবে না। আমরাও এ অসাধ্যসাধনে কৃতকার্য্য হইব এমন আশা করি না। আমরা এমন অনেক কবিতাকে এ গ্রন্থে নিশ্চয় স্থান দিয়াছি যাহা কবির কোনো না কোনো ভক্তের নিকট মাঝারি বা তাহার চেয়ে নীচের দরের জিনিষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে— এবং এমন অনেক কবিতা ছাড়িয়াছি যাহা তাঁহাদের কাছে বিশেষ আদরের। ইহাতে এই প্রমাণ হয়, কবি বিচিত্র লোককে বিচিত্রভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকেন— তিনি অনেকের কাছে অনেক রকমে পরিচিত। ... তবে পাঠকসমাজের নিকট হইতে এইটুকু ভরসা রাখি যে "গোলাপফুলকে ভালোবাসিলে পদ্মফুলকে অবজ্ঞা করিবার তাঁহাদের কোনো কারণ নাই।" চয়নিকায় যদি গোলাপফুল বাদ গিয়া থাকে অন্য কোন ফুল দিয়াই তো সাজি ভরিয়াছি ... ।'

৪

সাজি ভরবার নানাপর্বে অবশ্য নানাজনের সাহায্য নিতে হয়েছে। কাজটির দায়িত্ব নিতে হয়েছিল উপাচার্য শ্রীনিমাইসাধন বসুর আগ্রহে। নিরন্তর সাহচর্য আর পরামর্শ পেয়েছি গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক, শ্রীসুমিত মজুমদার আর শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর কাছে। রবীন্দ্রভবন থেকে প্রয়োজনমতো দু-একটি উপকরণ পাঠিয়েছেন শ্রীমতী সুপ্রিয়া রায়, শ্রীসনৎকুমার বাগচী এবং শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল। সযত্নে প্রেসকপি মিলিয়ে দিয়েছেন শ্রীসুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়।

বইয়ের নামটির জন্য সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি প্রবন্ধের কাছে আমার ঋণ। সুধীন্দ্র-অনুসরণে রবীন্দ্রশতবর্ষের একটি প্রবন্ধসংকলনও যে ছাপা হয়েছিল এই নামে, সে কথাও এখানে স্মরণযোগ্য।

শঙ্খ ঘোষ

# সূচীপত্র

শিরোনাম। প্রথম ছত্র বা ছত্রাংশ

শিরোনাম। প্রথম ছত্র বা ছত্রাংশ

শিরোনাম। প্রথম ছত্র বা ছত্রাংশ

শিরোনাম। প্রথম ছত্র বা ছত্রাংশ

শিরোনাম। প্রথম ছত্র বা ছত্রাংশ

শিরোনাম। প্রথম ছত্র বা ছত্রাংশ

শিরোনাম। প্রথম ছত্র বা ছত্রাংশ

শিরোনাম। প্রথম ছত্র বা ছত্রাংশ



বিন্দুচিহ্নিত কবিতাগুলি সঞ্চয়িতার অন্তর্ভুক্ত

## চিত্রসূচী

## তারকার আত্মহত্যা

জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধারসাগরে
ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা,
একেবারে উন্মাদের পারা।
চৌদিকে অসংখ্য তারা রহিল চাহিয়া
অবাক হইয়া—
এই যে জ্যোতির বিন্দু আছিল তাদের মাঝে
মুহূর্তে সে গেল মিশাইয়া।
যে সমুদ্রতলে
মনোদুঃখে আত্মঘাতী
চির-নির্বাপিত-ভাতি
শত মৃত তারকার
মৃতদেহ রয়েছে শয়ান
সেথায় সে করেছে পয়ান।

কেন গো কী হয়েছিল তার।
একবার শুধালে না কেহ—
কী লাগি সে তেয়াগিল দেহ।

যদি কেহ শুধাইত
আমি জানি কী যে সে কহিত।
যতদিন বেঁচে ছিল
আমি জানি কী তারে দহিত।
সে কেবল হাসির যন্ত্রণা,
আর কিছু না!
জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড, ঢাকিতে আঁধার হৃদি
অনিবার হাসিতেই রহে,
যত হাসে ততই সে দহে।

তেমনি-তেমনি তারে হাসির অনল
দারুণ উজ্জ্বল—
দহিত দহিত তারে, দহিত কেবল।
জ্যোতির্ময় তারাপূর্ণ বিজন তেয়াগি
তাই আজ ছুটেছে সে নিতান্ত মনের ক্লেশে
আঁধারের তারাহীন বিজনের লাগি।

কেন গো, তোমরা যত তারা
উপহাস করি তারে হাসিছ অমন ধারা।
তোমাদের হয় নি তো ক্ষতি,
যেমন আছিল আগে তেমনি রয়েছে জ্যোতি।

সে কি কভু ভেবেছিল মনে—
(এত গর্ব আছিল কি তার)
আপনারে নিবাইয়া তোমাদের করিবে আঁধার।

গেল, গেল, ডুবে গেল, তারা এক ডুবে গেল,
আঁধারসাগরে—
গভীর নিশীথে,
অতল আকাশে।
হৃদয়, হৃদয় মোর, সাধ কি রে যায় তোর
ঘুমাইতে ওই মৃত তারাটির পাশে
ওই আঁধারসাগরে,
এই গভীর নিশীথে,
ওই অতল আকাশে।

প্র· জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮

## মরণ

মরণ রে,
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।
মেঘ বরন তুঝ, মেঘ জটাজুট,
রক্তকমলকর, রক্তঅধরপুট,
তাপবিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু-অমৃত করে দান।
আকুল রাধা-রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়নদউ অনুখন ঝরঝর—
তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর,
তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও,
মরণ, তু আও রে আও।
ভুজপাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু দেহ তু রোধয়ি,

কোর-উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
নীদ ভরব সব দেহ।
তুঁহুঁ নহি বিসরবি, তুঁহুঁ নহি ছোড়বি,
রাধাহৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি
হিয়-হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন—
'অতুলন তোঁহার লেহ।
গগন সঘন অব, তিমিরমগন ভব,
তড়িতচকিত অতি, ঘোর মেঘরব,
শালতালতরু সভয়-তবধ সব—
পন্থ বিজন অতি ঘোর।
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
তুঁহুঁ মম প্রিয়তম, কি ফল বিচারে—
ভয়বাধা সব অভয় মুরতি ধরি,
পন্থ দেখায়ব মোর।
ভানু ভনে, 'অয়ি রাধা, ছিয়ে ছিয়ে
চঞ্চল চিত্ত তোহারি।
জীবনবল্লভ মরণ-অধিক সো
অব তুঁহুঁ দেখ বিচারি।'

প্র· শ্রাবণ ১২৮৮

## মহাস্বপ্ন

পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন,
নিদ্রামগ্ন মহাদেব দেখিছেন মহান্ স্বপন।
বিশাল জগৎ এই প্রকাণ্ড স্বপন সেই,
হৃদয়সমুদ্রে তাঁর উঠিতেছে বিম্বের মতন।
উঠিতেছে চন্দ্র সূর্য, উঠিতেছে আলোক আঁধার,
উঠিতেছে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের জ্যোতি-পরিবার।
উঠিতেছে, ছুটিতেছে গ্রহ উপগ্রহ দলে দলে,
উঠিতেছে ডুবিতেছে রাত্রি দিন আকাশের তলে।
একা বসি মহাসিন্ধু চিরদিন গাইতেছে গান,
ছুটিয়া সহস্র নদী পদতলে মিলাইছে প্রাণ।
তটিনীর কলরব, লক্ষ নির্ঝরের ঝর ঝর,
সিন্ধুর গম্ভীর গীত, মেঘের গম্ভীর কণ্ঠস্বর,

ঝটিকা করিছে হা হা আশ্রয়-আলয় তার ছাড়ি
বাজায়ে অরণ্যবীণা ভীমবল শত বাহু নাড়ি,
রুদ্র রাগ আলাপিয়া গড়ায়ে পড়িছে হিমরাশ
পর্বতদৈত্যের যেন ঘনীভূত ঘোর অট্টহাস,
ধীরে ধীরে মহারণ্য নাড়িতেছে জটাময় মাথা—
ঝর ঝর মর মর উঠিতেছে সুগম্ভীর গাথা।
চেতনার কোলাহলে দিবস পুরিছে দশ দিশি,
ঝিল্লিরবে একমন্ত্র জপিতেছে তাপসিনী নিশি,
সমস্ত একত্রে মিলি ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া চারি ভিত
উঠাইছে মহা-হৃদে মহা এক স্বপন-সংগীত।
স্বপনের রাজ্য এই স্বপন-রাজ্যের জীবগণ
দেহ ধরিতেছে কত মুহুর্মুহু নূতন নূতন।
ফুল হয়ে যায় ফল, ফুল ফল বীজ হয় শেষে,
নব নব বৃক্ষ হয়ে বেঁচে থাকে কানন-প্রদেশে।
বাষ্প হয়, মেঘ হয়, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিবারিধারা
নির্ঝর তটিনী হয়, ভাঙি ফেলে শিলাময় কারা।
নিদাঘ মরিয়া যায়, বরষা শ্মশানে আসি তার
নিবায় জ্বলন্ত চিতা বরষিয়া অশ্রুবারিধার।
বরষা হইয়া বৃদ্ধ শ্বেতকেশ শীত হয়ে যায়,
যযাতির মতো পুন বসন্তযৌবন ফিরে পায়।
এক শুধু পুরাতন, আর সব নূতন নূতন,
এক পুরাতন হৃদে উঠিতেছে নূতন স্বপন।
অপূর্ণ স্বপন-সৃষ্ট মানুষেরা অভাবের দাস,
জাগ্রত পূর্ণতা-তরে পাইতেছে কত-না প্রয়াস।
চেতনা ছিঁড়িতে চাহে আধো-অচেতন আবরণ—
দিনরাত্রি এই আশা, এই তার একমাত্র পণ।
পূর্ণ আত্মা জাগিবেন, কভু কি আসিবে হেন দিন?
অপূর্ণ জগৎ-স্বপ্ন ধীরে ধীরে হইবে বিলীন?
চন্দ্র সূর্য তারকার অন্ধকার স্বপ্নময়ী ছায়া
জ্যোতির্ময় সে হৃদয়ে ধীরে ধীরে মিলাইবে কায়া।
পৃথিবী ভাঙিয়া যাবে, একে একে গ্রহতারাগণ
ভেঙে ভেঙে মিলে যাবে একেকটি বিম্বের মতন।
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ চেয়ে জ্যোতির্ময় মহান্ বৃহৎ
জীব-আত্মা মিলাইবে, একেকটি জলবিম্ববৎ।
কভু কি আসিবে, দেব, সেই মহাস্বপ্ন-ভাঙা দিন—
সত্যের সমুদ্র-মাঝে আধো সত্য হয়ে যাবে লীন?

আধেক প্রলয়জলে ডুবে আছে তোমার হৃদয়,
বলো, দেব, কবে হেন প্রলয়ের হইবে প্রলয়।

প্র মাঘ ১২৮৮

## নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত-পাখির গান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়,
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায়
কোথায় কারার দ্বার।
কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন ?
ভাঙ্‌ রে হৃদয় ভাঙ্‌ রে বাঁধন,
সাধ্‌ রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের 'পরে আঘাত কর্‌।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরান
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ!
উথলি যখন উঠেছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর!

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগলপারা ;
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
দিব রে পরান ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল
তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে এত গান আছে
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে এত সাধ আছে
প্রাণ হয়ে আছে ভোর।

কী জানি কী হল আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান—
ওরে, চারি দিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর !
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্ !
ওরে, আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এসেছে রবির কর !

প্র· অগ্রহায়ণ ১২৮৯

## পূর্ণিমায়

যাই যাই ডুবে যাই
আরো আরো ডুবে যাই,
বিহ্বল অবশ অচেতন !
কোন্‌খানে কোন্ দূরে
নিশীথের কোন্ মাঝে
কোথা হয়ে যাই নিমগন।
হে ধরণী, পদতলে

দিয়ো না দিয়ো না বাধা
দাও মোরে দাও ছেড়ে দাও—
অনন্ত দিবসনিশি
এমনি ডুবিতে থাকি,
তোমরা সুদূরে চলে যাও।
এ কী রে উদার জ্যোৎস্না
এ কী রে গভীর নিশি,
দিশে দিশে স্তব্ধতা বিস্তারি!
আঁখি দুটি মুদে আমি
কোথা আছি কোথা গেছি
কিছু যেন বুঝিতে না পারি।
দেখি দেখি আরো দেখি,
অসীম উদার শূন্যে
আরো দূরে আরো দূরে যাই—
দেখি আজি এ অনন্তে
আপনা হারায়ে ফেলে
আর যেন খুঁজিয়া না পাই।
তোমরা চাহিয়া থাকো
জোছনা অমৃতপানে
বিহ্বল বিলীন তারাগুলি।
অপার দিগন্ত ওগো
থাকো এ মাথার 'পরে
দুই দিকে দুই পাখা তুলি।

গান নাই, কথা নাই,
শব্দ নাই, স্পর্শ নাই,
নাই ঘুম, নাই জাগরণ—
কোথা কিছু নাহি জাগে,
সর্বাঙ্গে জোছনা লাগে,
সর্বাঙ্গ পুলকে অচেতন।
অসীমে সুনীলে শূন্যে
বিশ্ব কোথা ভেসে গেছে
তারে যেন দেখা নাহি যায়—
নিশীথের মাঝে শুধু
মহান একাকী আমি
অতলেতে ডুবি রে কোথায়।

গাও বিশ্ব গাও তুমি
সুদূর অদৃশ্য হতে
গাও তব নাবিকের গান—
শত লক্ষ যাত্রী লয়ে
কোথায় যেতেছ তুমি
তাই ভাবি মুদিয়া নয়ান।
অনন্ত রজনী শুধু
ডুবে যাই নিভে যাই
মরে যাই অসীম মধুরে—
বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে
মিশায়ে মিলায়ে যাই
অনন্তের সুদূর সুদূরে।

প্র· পৌষ ১২৯০

## যৌবনস্বপ্ন

আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।
পরানে পুলক বিকাশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস
যেথা ছিল যত বিরহিণী সকলের কুড়ায়ে নিশ্বাস!
বসন্তের কুসুমকাননে গোলাপের আঁখি কেন নত?
জগতের যত লাজময়ী যেন মোর আঁখির সকাশ
কাঁপিছে গোলাপ হয়ে এসে, মরমের শরমে বিব্রত।
প্রতি নিশি ঘুমাই যখন পাশে এসে বসে যেন কেহ,
সচকিত স্বপনের মতো জাগরণে পলায় সলাজে।
যেন কার আঁচলের বায় উষায় পরশি যায় দেহ।
শত নূপুরের রুনুঝুনু বনে যেন গুঞ্জরিয়া বাজে।
মদির প্রাণের ব্যাকুলতা ফুটে ফুটে বকুলমুকুলে।
কে আমারে করেছে পাগল— শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে,
যেন কোন্ উর্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে।

## স্মৃতি

ওই দেহপানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্বজনমের স্মৃতি।
সহস্র হারানো সুখ আছে ও নয়নে,
জন্ম-জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।
যেন গো আমারি তুমি আত্মবিস্মরণ,
অনন্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক,
কত নব জগতের কুসুমকানন,
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক।
কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ,
সেই হাসি সেই অশ্রু সেইসব কথা
মধুর মুরতি ধরি দেখা দিল আজ।
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন
জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন।

## বিবসনা

ফেলো গো বসন ফেলো, ঘুচাও অঞ্চল।
পরো শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ—
সুরবালিকার বেশ কিরণবসন।
পরিপূর্ণ তনুখানি— বিকচ কমল,
জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা।
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে দাঁড়াও একেলা।
সর্বাঙ্গে পড়ুক তব চাঁদের কিরণ,
সর্বাঙ্গে মলয়বায়ু করুক সে খেলা।
অসীম নীলিমা-মাঝে হও নিমগন
তারাময়ী বিবসনা প্রকৃতির মতো।
অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।
আসুক বিমল উষা মানবভবনে,
লাজহীনা পবিত্রতা শুভ্র বিবসনে।

## হৃদয়-আসন

কোমল দুখানি বাহু শরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়,
তারি মাঝখানে কি রে রয়েছে লুকায়ে
অতিশয় সযতন গোপন হৃদয়!
সেই নিরালায় সেই কোমল আসনে
দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়
কিশোর প্রেমের মৃদু প্রদোষকিরণে
আনত আঁখির তলে রাখিবে আমায়!
কত-না মধুর আশা ফুটিছে সেথায়—
গভীর নিশীথে কত বিজন কল্পনা,
উদাস নিশ্বাসবায়ু বসন্তসন্ধ্যায়,
গোপনে চাঁদিনী রাতে দুটি অশ্রুকণা!
তারি মাঝে আমারে কি রাখিবে যতনে
হৃদয়ের সুমধুর স্বপন-শয়নে।

## তনু

ওই তনুখানি তব আমি ভালোবাসি।
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।
শিশিরেতে টলমল ঢলঢল ফুল
টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকাশি।
চারি দিকে গুঞ্জরিছে জগৎ আকুল,
সারানিশি সারাদিন ভ্রমর পিপাসী।
ভালোবেসে বায়ু এসে দুলাইছে দুল,
মুখে পড়ে মোহভরে পূর্ণিমার হাসি।
পূর্ণ দেহখানি হতে উঠিছে সুবাস—
মরি মরি, কোথা সেই নিভৃত নিলয়
কোমল শয়নে যেথা ফেলিছে নিশ্বাস
তনুঢাকা মধুমাখা বিজন হৃদয়!
ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব, বালা,
পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা।

## পূর্ণ মিলন

নিশিদিন কাঁদি, সখি, মিলনের তরে—
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন।
লও লও বেঁধে লও, কেড়ে লও মোরে—
লও লজ্জা, লও বস্ত্র, লও আবরণ।
এ তরুণ তনুখানি লহো চুরি করে—
আঁখি হতে লও ঘুম, ঘুমের স্বপন।
জাগ্রত বিপুল বিশ্ব লও তুমি হ'রে—
অনন্ত কালের মোর জীবন মরণ।
বিজন বিশ্বের মাঝে মিলনশ্মশানে
নির্বাপিত সূর্যালোক, লুপ্ত চরাচর—
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর।
এ কী দুরাশার স্বপ্ন, হায় গো ঈশ্বর—
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে!

## বন্দী

দাও খুলে দাও, সখি, ওই বাহুপাশ।
চুম্বনমদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরান।
কোথায় উষার আলো, কোথায় আকাশ!
এ চিরপূর্ণিমারাত্রি হোক অবসান।
আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ—
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ।
আকুল অঙ্গুলিগুলি করি কোলাকুলি
গাঁথিছে সর্বাঙ্গে মোর পরশের ফাঁদ।
ঘুমঘোরে শূন্যপানে দেখি মুখ তুলি—
শুধু অবিশ্রামহাসি একখানি চাঁদ।
স্বাধীন করিয়া দাও, বেঁধো না আমায়—
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়।

## রাত্রি

জগতেরে জড়াইয়া শত পাকে যামিনী-নাগিনী
আকাশ পাতাল জুড়ি ছিল পড়ে নিদ্রায় মগনা,
আপনার হিম দেহে আপনি বিলীনা একাকিনী।
মিটিমিটি তারকায় জ্বলে তার অন্ধকার ফণা।
উষা আসি মন্ত্র পড়ি বাজাইল ললিতরাগিণী।
রাঙা আঁখি পাকালিয়া সাপিনী উঠিল তাই জাগি—
একে একে খুলে পাক, আঁকিবাঁকি কোথা যায় ভাগি!
পশ্চিমসাগরতলে আছে বুঝি বিরাট গহ্বর,
সেথায় ঘুমাবে বলে ডুবিতেছে বাসুকিভগিনী
মাথায় বহিয়া তার শতলক্ষ রতনের কণা।
শিয়রেতে সারাদিন জেগে রবে বিপুল সাগর।
নিভৃতে স্তিমিতদীপে চুপি চুপি কহিয়া কাহিনী
মিলি কত নাগবালা স্বপ্নমালা করিবে রচনা।

## চিরদিন

কোথা রাত্রি, কোথা দিন, কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য তারা!
কেবা আসে, কেবা যায়, কোথা বসে জীবনের মেলা!
কেবা হাসে, কেবা গায়, কোথা খেলে হৃদয়ের খেলা!
কোথা পথ, কোথা গৃহ, কোথা পান্থ, কোথা পথহারা!
কোথা খসে পড়ে পত্র জগতের মহাবৃক্ষ হতে,
উড়ে উড়ে ঘুরে মরে অসীমেতে না পায় কিনারা,
বহে যায় কালবায়ু অবিশ্রাম আকাশের পথে,
ঝরঝর মরমর শুষ্কপত্র শ্যামপত্রে মিলে।
এত ভাঙা, এত গড়া, আনাগোনা জীবন্ত নিখিলে,
এত গান, এত তান, এত কান্না, এত কলরব—
কোথা কেবা, কোথা সিন্ধু, কোথা ঊর্মি, কোথা তার বেলা—
গভীর অসীমগর্ভে নির্বাসিত নির্বাপিত সব।
জনপূর্ণ সুবিজনে, জ্যোতির্বিদ্ধ আঁধারে বিলীন
আকাশমণ্ডপে শুধু বসে আছে এক 'চিরদিন'।

২

কী লাগিয়া বসে আছ, চাহিয়া রয়েছ কার লাগি !
প্রলয়ের পরপারে নেহারিছ কার আগমন !
কার দূর পদধ্বনি চিরদিন করিছ শ্রবণ !
চিরবিরহীর মতো চিররাত্রি রহিয়াছ জাগি !
অসীম অতৃপ্তি লয়ে মাঝে মাঝে ফেলিছ নিশ্বাস,
আকাশ প্রান্তরে তাই কেঁদে উঠে প্রলয়বাতাস—
জগতের উর্ণাজাল ছিঁড়ে টুটে কোথা যায় ভাগি !
অনন্ত আঁধারমাঝে কেহ তব নাহিকো দোসর !
পশে না তোমার প্রাণে আমাদের হৃদয়ের আশ,
পশে না তোমার কানে আমাদের পাখিদের স্বর !
সহস্র জগতে মিলি রচে তব বিজন প্রবাস,
সহস্র শবদে মিলি বাঁধে তব নিঃশব্দের ঘর—
হাসি কাঁদি ভালোবাসি, নাই তব হাসি কান্না মায়া—
আসি, থাকি, চলে যাই কত ছায়া কত উপছায়া।

৩

তাই কি ? সকলি ছায়া ? আসে, থাকে, আর মিলে যায় ?
তুমি শুধু একা আছ, আর-সব আছে আর নাই ?
যুগ যুগান্তর ধরে ফুল ফুটে, ফুল ঝরে তাই ?
প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই, সে কি শুধু মরণের পায় ?
এ ফুল চাহে না কেহ ? লহে না এ পূজা-উপহার ?
এ প্রাণ, প্রাণের আশা টুটে কি অসীম শূন্যতায় ?
বিশ্বের উঠিছে গান, বধিরতা বসি সিংহাসনে ?
বিশ্বের কাঁদিছে প্রাণ, শূন্যে ঝরে অশ্রুবারিধার ?
যুগ-যুগান্তের প্রেম কে লইবে, নাই ত্রিভুবনে ?
চরাচর মগ্ন আছে নিশিদিন আশার স্বপনে,
বাঁশি শুনে চলিয়াছে—সে কি হায় বৃথা অভিসার ?
বোলো না সকলি স্বপ্ন, সকলি এ মায়ার ছলন—
বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্বপন কাহার স্বপন ?
সে কি এই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার ?

৪

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ।
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।

অসীমে উঠিছে প্রেম শুধিবারে অসীমের ঋণ—
যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।
যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতি দিন,
যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ।
যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে উঠে দীনহীন—
অসীমে জগতে এ কী পিরীতির আদান প্রদান!
কাহারে পূজিছে ধরা শ্যামল যৌবন-উপহারে!
নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন।
প্রেমে টেনে আনে প্রেম, সে প্রেমের পাথার কোথা রে!
প্রাণ দিলে প্রাণ আসে, কোথা সেই অনন্ত জীবন!
ক্ষুদ্র আপনারে দিলে কোথা পাই অসীম আপন—
সে কি ওই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকারে!

জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩

## সিন্ধুতরঙ্গ

পুরী-তীর্থযাত্রী তরণীর
নিমজ্জন উপলক্ষে

দোলে রে প্রলয় দোলে অকূল সমুদ্রকোলে
উৎসব ভীষণ।
শত পক্ষ ঝাপটিয়া বেড়াইছে দাপটিয়া
দুর্দম পবন।
আকাশ সমুদ্র-সাথে প্রচণ্ড মিলনে মাতে,
অখিলের আঁখিপাতে আবরি তিমির।
বিদ্যুৎ চমকে ত্রাসি, হা হা করে ফেনরাশি,
তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসি জড়-প্রকৃতির।
চক্ষুহীন কর্ণহীন গেহহীন স্নেহহীন
মত্ত দৈত্যগণ
মরিতে ছুটেছে কোথা, ছিঁড়েছে বন্ধন।

হারাইয়া চারি ধার নীলাম্বুধি অন্ধকার
কল্লোলে ক্রন্দনে
রোষে ত্রাসে ঊর্ধ্বশ্বাসে অট্টরোলে অট্টহাসে
উন্মাদগর্জনে,

ফাটিয়া ফুটিয়া উঠে, চূর্ণ হয়ে যায় টুটে,
খুঁজিয়া মরিছে ছুটে আপনার কূল—
যেন রে পৃথিবী ফেলি বাসুকি করিছে কেলি
সহস্রৈক ফণা মেলি আছাড়ি লাঙুল।
যেন রে তরল নিশি টলমলি দশ দিশি
উঠেছে নড়িয়া,
আপন নিদ্রার জাল ফেলিছে ছিঁড়িয়া।

নাই সুর, নাই ছন্দ, অর্থহীন নিরানন্দ
জড়ের নর্তন!
সহস্র জীবনে বেঁচে ওই কি উঠিছে নেচে
প্রকাণ্ড মরণ?
জল বাষ্প বজ্র বায়ু লভিয়াছে অন্ধ আয়ু,
নূতন জীবনস্নায়ু টানিছে হতাশে।
দিগ্‌বিদিক নাহি জানে, বাধাবিঘ্ন নাহি মানে,
ছুটেছে প্রলয়পানে আপনারি ত্রাসে।
হেরো, মাঝখানে তারি আট শত নরনারী
বাহু বাঁধি বুকে
প্রাণে আঁকড়িয়া প্রাণ চাহিয়া সম্মুখে।

তরণী ধরিয়া ঝাঁকে— রাক্ষসী ঝটিকা হাঁকে,
'দাও দাও দাও!'
সিন্ধু ফেনোচ্ছলছলে কোটি ঊর্ধ্বকরে বলে,
'দাও দাও দাও!'
বিলম্ব দেখিয়া রোযে ফেনায়ে ফেনায়ে ফোঁসে,
নীল মৃত্যু মহাক্রোশে শ্বেত হয়ে উঠে।
ক্ষুদ্র তরী গুরুভার সহিতে পারে না আর,
লৌহবক্ষ ওই তার যায় বুঝি টুটে।
অধ ঊর্ধ্ব এক হয়ে ক্ষুদ্র এ খেলেনা লয়ে
খেলিবারে চায়।
দাঁড়াইয়া কর্ণধার তরীর মাথায়।

নরনারী কম্পমান ডাকিতেছে ভগবান,
হায় ভগবান!
'দয়া করো' 'দয়া করো' উঠিছে কাতর স্বর,
রাখো রাখো প্রাণ!

কোথা সেই পুরাতন রবি শশী তারাগণ !
কোথা আপনার ধন ধরণীর কোল !
আজন্মের স্নেহসার কোথা সেই ঘরদ্বার—
পিশাচী এ বিমাতার হিংস্র উতরোল।
যে দিকে ফিরিয়া চাই পরিচিত কিছু নাই,
নাই আপনার—
সহস্র করাল মুখ সহস্র-আকার।

ফেটেছে তরণীতল, সবেগে উঠিছে জল,
সিন্ধু মেলে গ্রাস।
নাই তুমি ভগবান, নাই দয়া, নাই প্রাণ—
জড়ের বিলাস !
ভয় দেখে ভয় পায়, শিশু কাঁদে উভরায়—
নিদারুণ 'হায় হায়' থামিল চকিতে।
নিমেষেই ফুরাইল, কখন জীবন ছিল
কখন জীবন গেল নারিল লখিতে।
যেন রে একই ঝড়ে নিবে গেল একত্তরে
শত দীপ-আলো—
চকিতে সহস্র গৃহে আনন্দ ফুরাল !

প্রাণহীন এ মত্ততা না জানে পরের ব্যথা,
না জানে আপন।
এর মাঝে কেন রয় ব্যথাভরা স্নেহময়
মানবের মন !
মা কেন রে এইখানে, শিশু চায় তার পানে,
ভাই সে ভায়ের টানে কেন পড়ে বুকে !
মধুর রবির করে কত ভালোবাসা-ভরে
কতদিন খেলা করে কত সুখে দুখে !
কেন করে টলমল্ দুটি ছোটো অশ্রুজল,
সকরুণ আশা !
দীপশিখাসম কাঁপে ভীত ভালোবাসা !

এমন জড়ের কোলে কেমনে নির্ভয়ে দোলে
নিখিল মানব !
সব সুখ সব আশ কেন নাহি করে গ্রাস
মরণ-দানব !

ওই-যে জন্মের তরে জননী ঝাঁপায়ে পড়ে,
কেন বাঁধে বক্ষোপরে সন্তান আপন!
মরণের মুখে ধায় সেথাও দিবে না তায়,
কাড়িয়া রাখিতে চায় হৃদয়ের ধন!
আকাশেতে পারাবারে দাঁড়ায়েছে এক ধারে,
এক ধারে নারী—
দুর্বল শিশুটি তার কে লইবে কাড়ি?

এ বল কোথায় পেলে! আপন কোলের ছেলে
এত ক'রে টানে!
এ নিষ্ঠুর জড়স্রোতে প্রেম এল কোথা হতে
মানবের প্রাণে?
নৈরাশ্য কভু না জানে, বিপত্তি কিছু না মানে,
অপূর্ব-অমৃত-পানে অনন্ত নবীন—
এমন মায়ের প্রাণ যে বিশ্বের কোনোখান
তিলেক পেয়েছে স্থান, সে কি মাতৃহীন?
এ প্রলয়-মাঝখানে অবলা জননীপ্রাণে
স্নেহ মৃত্যুজয়ী—
এ স্নেহ জাগায়ে রাখে কোন্ স্নেহময়ী?

পাশাপাশি এক ঠাঁই দয়া আছে, দয়া নাই—
বিষম সংশয়।
মহাশঙ্কা মহা-আশা একত্র বেঁধেছে বাসা,
একসাথে রয়।
কেবা সত্য, কেবা মিছে— নিশিদিন আকুলিছে,
কভু ঊর্ধ্বে কভু নীচে টানিছে হৃদয়।
জড় দৈত্য শক্তি হানে, মিনতি নাহিকো মানে—
প্রেম এসে কোলে টানে, দূর করে ভয়।
এ কি দুই দেবতার দ্যূতখেলা অনিবার
ভাঙাগড়াময়?—
চিরদিন অন্তহীন জয়পরাজয়?

৪৯ পার্ক স্ট্রীট
আষাঢ় ১২৯৪

## নিষ্ঠুর সৃষ্টি

মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়মনিগড়ে,
আনাগোনা মেলামেশা সবই অন্ধ দৈবের ঘটনা।
এই ভাঙে, এই গড়ে,
এই উঠে, এই পড়ে,
কেহ নাহি চেয়ে দেখে কার কোথা বাজিছে বেদনা।

মনে হয় যেন ওই অবারিত শূন্যতলপথে
অকস্মাৎ আসিয়াছে সৃজনের বন্যা ভয়ানক—
অজ্ঞাত শিখর হতে
সহসা প্রচণ্ড স্রোতে
ছুটে আসে সূর্য চন্দ্র, ধেয়ে আসে লক্ষকোটি লোক।

কোথাও পড়েছে আলো, কোথাও বা অন্ধকার নিশি—
কোথাও সফেন শুভ্র, কোথাও বা আবর্ত আবিল—
সৃজনে প্রলয়ে মিশি
আক্রমিছে দশ দিশি,
অনন্ত প্রশান্ত শূন্য তরঙ্গিয়া করিছে ফেনিল।

মোরা শুধু খড়কুটো স্রোতোমুখে চলিয়াছি ছুটি,
অর্ধ পলকের তরে কোথাও দাঁড়াতে নাহি ঠাঁই।
এই ডুবি, এই উঠি,
ঘুরে ঘুরে পড়ি লুটি—
এই যারা কাছে আসে এই তারা কাছাকাছি নাই।

সৃষ্টিস্রোতকোলাহলে বিলাপ শুনিবে কেবা কার!
আপন গর্জনে বিশ্ব আপনারে করেছে বধির।
শতকোটি হাহাকার
কলধ্বনি রচে তার—
পিছু ফিরে চাহিবার কাল নাই, চলেছে অধীর।

হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানবহৃদয়,
খসিয়া পড়িলি কোন্ নন্দনের তটতরু হতে?
যার লাগি সদা ভয়,
পরশ নাহিকো সয়,
কে তারে ভাসালে হেন জড়ময় সৃজনের স্রোতে?

তুমি কি শুনিছ বসি হে বিধাতা, হে অনাদি কবি,
ক্ষুদ্র এ মানবশিশু রচিতেছে প্রলাপজল্পনা ?
সত্য আছে স্তব্ধ ছবি
যেমন উষার রবি,
নিম্নে তারি ভাঙে গড়ে মিথ্যা যত কুহককল্পনা।

গাজিপুর
১৩ বৈশাখ ১২৯৫

## একাল ও সেকাল

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী—
গাঢ় ছায়া সারাদিন,
মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।

আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা-অভিসার
পাগলিনী রাধিকার,
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে।

সেদিনও এমনি বায়ু রহিয়া রহিয়া—
এমনি অশ্রান্ত বৃষ্টি,
তড়িৎ-চকিত দৃষ্টি,
এমনি কাতর হায় রমণীর হিয়া।

বিরহিণী মর্মে-মরা মেঘমন্দ্র স্বরে—
নয়নে নিমেষ নাহি,
গগনে রহিত চাহি,
আঁকিত প্রাণের আশা জলদের স্তরে।

চাহিত পথিকবধূ শূন্যপথপানে—
মল্লার গাহিত কারা,
ঝরিত বরষাধারা,
নিতান্ত বাজিত গিয়া কাতর পরানে।

যক্ষনারী বীণা কোলে ভূমিতে বিলীন—
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ,
অযত্নশিথিল বেশ,
সেদিনও এমনিতরো অন্ধকার দিন।

সেই কদম্বের মূল, যমুনার তীর,
সেই সে শিখীর নৃত্য
এখনো হরিছে চিত্ত—
ফেলিছে বিরহছায়া শ্রাবণতিমির।

আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে—
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে—
এখনো প্রেমের খেলা
সারা দিন, সারা বেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়কুটিরে।

২১ বৈশাখ ১২৯৫

## বধূ

'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল্!'
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে—
কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল!
কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশথতল!
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে 'জলকে চল্'।

কলসী লয়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা—
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূ ধূ,
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।

দিঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দু ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে,
পিক কুহরে তীরে অমিয়মাখা।
পথে আসিতে ফিরে আঁধার তরুশিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা।

অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি,
সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি।
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল,
করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি।
প্রাচীর বেয়ে বেয়ে সবুজে ফেলে ছেয়ে
বেগুনি-ফুলে-ভরা লতিকা দুটি।
ফাটলে দিয়ে আঁখি আড়ালে বসে থাকি,
আঁচল পদতলে পড়েছে লুটি।

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এ ধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁষে।
বাঁধের জলরেখা ঝলসে যায় দেখা,
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।
চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি,
কে জানে কত শত নূতন দেশে।

হায় রে রাজধানী পাষাণকায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে
ব্যাকুল বালিকারে, নাহিকো মায়া।
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথঘাট,
পাখির গান কই, বনের ছায়া!

কে যেন চারি দিকে দাঁড়িয়ে আছে—
খুলিতে নারি মন, শুনিবে পাছে।
হেথায় বৃথা কাঁদা, দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন-কাছে।

আমার আঁখিজল কেহ না বোঝে।
অবাক হয়ে সবে কারণ খোঁজে।
'কিছুতে নাহি তোষ, এ তো বিষম দোষ,
গ্রাম্যবালিকার স্বভাব ও যে।
স্বজন প্রতিবেশী এত যে মেশামেশি,
ও কেন কোণে বসে নয়ন বোজে?'

কেহ বা দেখে মুখ, কেহ বা দেহ—
কেহ বা ভালো বলে, বলে না কেহ।
ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি—
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন করে কাটে সারাটা বেলা!
ইঁটের 'পরে ইঁট, মাঝে মানুষ-কীট;
নাইকো ভালোবাসা, নাইকো খেলা।

কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো,
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁ গো!
উঠিলে নবশশী ছাদের 'পরে বসি
আর কি উপকথা বলিবি না গো!
হৃদয়বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি, মা, আঁখিজলে রজনী জাগো—
কুসুম তুলি লয়ে প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো।

হেথাও উঠে চাঁদ ছাদের পারে,
প্রবেশ মাগে আলো ঘরের দ্বারে।
আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছে দেশে দেশে,
যেন সে ভালোবেসে চাহে আমারে।

নিমেষতরে তাই আপনা ভুলি
ব্যাকুল ছুটে যাই দুয়ার খুলি।
অমনি চারি ধারে নয়ন উঁকি মারে,
শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি।

দেবে না ভালোবাসা, দেবে না আলো।
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দিঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।

ডাক্ লো ডাক্ তোরা, বল্ লো বল্—
'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল্।'
কবে পড়িবে বেলা, ফুরাবে সব খেলা,
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল—
জানিস যদি কেহ আমায় বল্।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫
সংশোধন ও পরিবর্ধন : শান্তিনিকেতন। ৭ কার্তিক

## দুরন্ত আশা

মর্মে যবে মত্ত আশা
সর্পসম ফোঁসে,
অদৃষ্টের বন্ধনেতে
দাপিয়া বৃথা রোষে,
তখনো ভালো-মানুষ সেজে
বাঁধানো হুঁকা যতনে মেজে
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে
খেলিতে হবে কষে!
অন্নপায়ী বঙ্গবাসী
স্তন্যপায়ী জীব
জনদশেকে জটলা করি
তক্তপোশে ব'সে।

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো
পোষমানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নিচে
শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি
মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্টগতি—
গৃহের প্রতি টান।

তৈলঢালা স্নিগ্ধ তনু
নিদ্রারসে ভরা,
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো
বাঙালি সন্তান।

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন!
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশিদিন।
বর্শা হাতে, ভরসা প্রাণে
সদাই নিরুদ্দেশ,
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল-বাধাহীন।

বিপদমাঝে ঝাঁপায়ে প'ড়ে
শোণিত উঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে
জীবন জেগে উঠে—
অন্ধকারে সূর্যালোতে
সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে
মত্ত হাসি টুটে।
বিশ্বমাঝে মহান যাহা
সঙ্গী পরানের,
ঝঞ্ঝামাঝে ধায় সে প্রাণ
সিন্ধুমাঝে লুটে।

নিমেষতরে ইচ্ছা করে
বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে
জীবন-উচ্ছ্বাসে—

শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্ধ্ব নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে
আম্রবনছায়ে
সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে
গুপ্ত গৃহবাসে।

বেহালাখানা বাঁকায়ে ধরি
বাজাও ও কী সুর—
তবলা-বাঁয়া কোলেতে টেনে
বাদ্যে ভরপুর!
কাগজ নেড়ে উচ্চ স্বরে
পোলিটিকাল তর্ক করে
জানলা দিয়ে পশিছে ঘরে
বাতাস ঝুরুঝুর্।
পানের বাটা, ফুলের মালা,
তবলা-বাঁয়া দুটো,
দম্ভভরা কাগজগুলো
করিয়া দাও দূর।

কিসের এত অহংকার!
দম্ভ নাহি সাজে—
বরং থাকো মৌন হয়ে
সসংকোচ লাজে।
অত্যাচারে মত্তপারা
কভু কি হও আত্মহারা?
তপ্ত হয়ে রক্তধারা
ফুটে কি দেহমাঝে?
অহর্নিশি হেলার হাসি
তীব্র অপমান
মর্মতল বিদ্ধ করি
বজ্রসম বাজে?

দাস্যসুখে হাস্যমুখ
বিনীত জোড়কর,

প্রভুর পদে সোহাগমদে
দোদুল কলেবর।
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি
ঘৃণায় মাখা অন্ন খুঁটি
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি
যেতেছ ফিরি ঘর।
ঘরেতে ব'সে গর্ব কর
পূর্বপুরুষের,
আর্যতেজ-দর্পভরে
পৃথ্বী থরহর!

হেলায়ে মাথা, দাঁতের আগে
মিষ্ট হাসি টানি
বলিতে আমি পারিব না তো
ভদ্রতার বাণী।
উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি
বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি,
প্রকাশহীন চিন্তারাশি
করিছে হানাহানি।
কোথাও যদি ছুটিতে পাই
বাঁচিয়া যাই তবে—
ভব্যতার গণ্ডিমাঝে
শান্তি নাহি মানি।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

## সুরদাসের প্রার্থনা

ঢাকো ঢাকো মুখ টানিয়া বসন,
আমি কবি সুরদাস।
দেবী, আসিয়াছি ভিক্ষা মাগিতে,
পুরাতে হইবে আশ।
অতি অসহন বহ্নিদহন
মর্ম-মাঝারে করি যে বহন,
কলঙ্করাহু প্রতি পলে পলে
জীবন করিছে গ্রাস।

পবিত্র তুমি, নির্মল তুমি,
তুমি দেবী, তুমি সতী—
কুৎসিত দীন অধম পামর
পঙ্কিল আমি অতি।
তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই শক্তি,
হৃদয়ে আমার পাঠাও ভক্তি—
পাপের তিমির পুড়ে যায় জ্ব'লে
কোথা সে পুণ্যজ্যোতি!
দেবের করুণা মানবী-আকারে,
আনন্দধারা বিশ্ব-মাঝারে,
পতিতপাবনী গঙ্গা যেমন
এলেন পাপীর কাজে—
তোমার চরিত রবে নির্মল,
তোমার ধর্ম রবে উজ্জ্বল—
আমার এ পাপ করি দাও লীন
তোমার পুণ্যমাঝে।

তোমারে কহিব লজ্জাকাহিনী,
লজ্জা নাহিকো তায়।
তোমার আভায় মলিন লজ্জা
পলকে মিলায়ে যায়।
যেমন রয়েছ তেমনি দাঁড়াও,
আঁখি নত করি আমা-পানে চাও,
খুলে দাও মুখ, আনন্দময়ী—
আবরণে নাহি কাজ।
নিরখি তোমারে ভীষণ মধুর,
আছ কাছে তবু আছ অতিদূর—
উজ্জ্বল যেন দেবরোষানল,
উদ্যত যেন বাজ।

জান কি আমি এ পাপ-আঁখি মেলি
তোমারে দেখেছি চেয়ে?
গিয়েছিল মোর বিভোর বাসনা
ওই মুখপানে ধেয়ে।
তুমি কি তখন পেরেছ জানিতে?
বিমল হৃদয়-আরশিখানিতে

চিহ্ন কিছু কি পড়েছিল এসে
নিশ্বাসরেখাছায়া—
ধরার কুয়াশা ম্লান করে যথা
আকাশ-উষার কায়া?
লজ্জা সহসা আসি অকারণে
বসনের মতো রাঙা আবরণে
চাহিয়াছিল কি ঢাকিতে তোমায়
লুব্ধ নয়ন হতে?
মোহচঞ্চল সে লালসা মম
কৃষ্ণবরন ভ্রমরের সম
ফিরিতেছিল কি গুন গুন কেঁদে
তোমার দৃষ্টিপথে?

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত
প্রভাতরশ্মিসম।
লও, বিঁধে দাও বাসনাসঘন
এ কালো নয়ন মম।
এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই,
ফুটেছে মর্মতলে—
নির্বাণহীন অঙ্গারসম
নিশিদিন শুধু জ্বলে।
সেথা হতে তারে উপাড়িয়া লও
জ্বালাময় দুটো চোখ—
তোমার লাগিয়া তিয়াষ যাহার
সে আঁখি তোমারি হোক।

অপার ভুবন, উদার গগন,
শ্যামল কাননতল,
বসন্ত অতি মুগ্ধমুরতি,
স্বচ্ছ নদীর জল,
বিবিধবরন সন্ধ্যানীরদ,
গ্রহতারাময়ী নিশি,
বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র
প্রসারিত দূর দিশি,
সুনীল গগনে ঘনতর নীল
অতিদূর গিরিমালা,

তারি পরপারে রবির উদয়
কনককিরণ-জ্বালা,
চকিততড়িৎ সঘন বরষা,
পূর্ণ ইন্দ্রধনু,
শরৎ-আকাশে অসীমবিকাশ
জ্যোৎস্না শুভ্রতনু
লও, সব লও, তুমি কেড়ে লও,
মাগিতেছি অকপটে
তিমিরতুলিকা দাও বুলাইয়া
আকাশচিত্রপটে।

ইহারা আমারে ভুলায় সতত,
কোথা নিয়ে যায় টেনে!
মাধুরীমদিরা পান করে শেষে
প্রাণ পথ নাহি চেনে।
সবে মিলে যেন বাজাইতে চায়
আমার বাঁশরি কাড়ি—
পাগলের মতো রচি নব গান,
নব নব তান ছাড়ি।
আপন ললিত রাগিণী শুনিয়া
আপনি অবশ মন—
ডুবাইতে থাকে কুসুমগন্ধ
বসন্তসমীরণ।
আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে,
ফুল মোরে ঘিরে বসে,
কেমনে না জানি জ্যোৎস্নাপ্রবাহ
সর্বশরীরে পশে।
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে
ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবনভরা বাহুপাশে তার
বেষ্টন করে কায়া।
চারি দিকে ঘিরি করে আনাগোনা
কল্পমুরতি কত,
কুসুমকাননে বেড়াই ফিরিয়া
যেন বিভোরের মতো।

শ্লথ হয়ে আসে হৃদয়তন্ত্রী,
বীণা খসে যায় পড়ি—
নাহি বাজে আর হরিনামগান
বরষ বরষ ধরি।
হরিহীন সেই অনাথ বাসনা
পিয়াসে জগতে ফিরে—
বাড়ে তৃষা, কোথা পিপাসার জল
অকূল লবণনীরে!
গিয়েছিল, দেবী, সেই ঘোর তৃষা
তোমার রূপের ধারে—
আঁখির সহিতে আঁখির পিপাসা
লোপ করো একেবারে।

ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার মূর্তি
পশেছে জীবনমূলে,
এই ছুরি দিয়ে সে মুরতিখানি
কেটে কেটে লও তুলে।
তারি সাথে হায় আঁধারে মিশাবে
নিখিলের শোভা যত—
লক্ষ্মী যাবেন, তাঁরি সাথে যাবে
জগৎ ছায়ার মতো।

যাক, তাই যাক, পারি নে ভাসিতে
কেবলি মুরতিস্রোতে।
লহো মোরে তুলে আলোকমগন
মুরতিভুবন হতে!
আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে—
একাকী অসীম ভরা,
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন
মিলাবে সকল ধরা।
আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে
আমার বিজন বাস,
প্রলয়-আসন জুড়িয়া বসিয়া
রব আমি বারো মাস।

থামো একটুকু, বুঝিতে পারি নে,
ভালো করে ভেবে দেখি!
বিশ্ববিলোপ বিমল আঁধার
চিরকাল রবে সে কি?
ক্রমে ধীরে ধীরে নিবিড় তিমিরে
ফুটিয়া উঠিবে না কি
পবিত্র মুখ, মধুর মূর্তি,
স্নিগ্ধ আনত আঁখি?
এখন যেমন রয়েছ দাঁড়ায়ে
দেবীর প্রতিমা সম—
স্থিরগম্ভীর করুণ নয়নে
চাহিছ হৃদয়ে মম,
বাতায়ন হতে সন্ধ্যাকিরণ
পড়েছে ললাটে এসে.
মেঘের আলোক লভিছে বিরাম
নিবিড়তিমির কেশে—
শান্তিরূপিণী এ মুরতি তব
অতি অপূর্ব সাজে
অনলরেখায় ফুটিয়া উঠিবে
অনন্তনিশি-মাঝে।
চৌদিকে তব নূতন জগৎ
আপনি সৃজিত হবে,
এ সন্ধ্যাশোভা তোমারে ঘিরিয়া
চিরকাল জেগে রবে।
এই বাতায়ন, ওই চাঁপা গাছ,
দূর সরযূর রেখা—
নিশিদিনহীন অন্ধ হৃদয়ে
চিরদিন যাবে দেখা।
সে নব-জগতে কাল-স্রোত নাই,
পরিবর্তন নাহি,
আজি এই দিন অনন্ত হয়ে
চিরদিন রবে চাহি।

তবে তাই হোক, হোয়ো না বিমুখ--
দেবী, তাহে কী বা ক্ষতি,

হৃদয়-আকাশে থাক্‌-না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি।
বাসনামলিন আঁখিকলঙ্ক
ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয় নীল-উৎপল
চিরদিন রবে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা,
হেরিব আমার হরি—
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব
অনন্ত বিভাবরী।

২২-২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

## গুরু গোবিন্দ

বন্ধু, তোমরা ফিরে যাও ঘরে,
এখনো সময় নয়।

নিশি-অবসান, যমুনার তীর,
ছোটো গিরিমালা, বন সুগভীর ;
গুরু গোবিন্দ কহিলা ডাকিয়া
অনুচর গুটিছয়—

যাও রামদাস, যাও গো লেহারী,
সাহু, ফিরে যাও তুমি।
দেখায়ো না লোভ, ডাকিয়ো না মোরে
ঝাঁপায়ে পড়িতে কর্মসাগরে ;
এখনো পড়িয়া থাক্ বহু দূরে
জীবনরঙ্গভূমি।

ফিরায়েছি মুখ, রুধিয়াছি কান,
লুকায়েছি বনমাঝে
সুদূরে মানব-সাগর অগাধ,
চিরক্রন্দিত ঊর্মিনিনাদ—
হেথায় বিজনে রয়েছি মগন
আপন গোপন কাজে।

মানবের প্রাণ ডাকে যেন মোরে
সেই লোকালয় হতে।
সুপ্ত নিশীথে জেগে উঠে তাই
চমকিয়া উঠে বলি 'যাই যাই',
প্রাণ মন দেহ ফেলে দিতে চাই
প্রবল মানবস্রোতে।

তোমাদের হেরি চিত চঞ্চল,
উদ্দাম ধায় মন—
রক্ত-অনল শত শিখা মেলি
সর্পসমান করি উঠে কেলি,
গঞ্জনা দেয় তরবারি যেন
কোষমাঝে ঝন্‌ঝন্‌।

হায়, সে কী সুখ, এ গহন ত্যজি
হাতে লয়ে জয়তুরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে,
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি !

তুরঙ্গসম অন্ধ নিয়তি,
বন্ধন করি তায়
রশ্মি পাকড়ি আপনার করে
বিঘ্নবিপদ লঙ্ঘন ক'রে
আপনার পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায়।

সমুখে যে আসে সরে যায় কেহ,
পড়ে যায় কেহ ভূমে।
দ্বিধা হয়ে বাধা হতেছে ভিন্ন,
পিছে পড়ে থাকে চরণচিহ্ন,
আকাশের আঁখি করিছে খিন্ন
প্রলয়বহ্নিধূমে।

শতবার ক'রে মৃত্যু ডিঙায়ে
পড়ি জীবনের পারে।

প্রান্তগগনে তারা অনিমিখ
নিশীথতিমিরে দেখাইছে দিক,
লোকের প্রবাহ ফেনায়ে ফেনায়ে
গরজিছে দুই ধারে।

কভু অমানিশা নীরব নিবিড়,
কভু বা প্রখর দিন।
কভু বা আকাশে চারি দিক -ময়
বজ্র লুকায়ে মেঘ জড়ো হয়—
কভু বা ঝটিকা মাথার উপরে
ভেঙে পড়ে দয়াহীন।

'আয় আয় আয়' ডাকিতেছি সবে,
আসিতেছে সবে ছুটে।
বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙে বাহিরায় সব পরিবার—
সুখসম্পদ-মায়ামমতার
বন্ধন যায় টুটে।

সিন্ধু-মাঝারে মিশিছে যেমন
পঞ্চনদীর জল—
আহ্বান শুনে কে কারে থামায়,
ভক্তহৃদয় মিলিছে আমায়,
পঞ্জাব জুড়ি উঠিছে জাগিয়া
উন্মাদ কোলাহল।

কোথা যাবি ভীরু, গহনে গোপনে
পশিছে কণ্ঠ মোর।
প্রভাতে শুনিয়া 'আয় আয় আয়'
কাজের লোকেরা কাজ ভুলে যায়,
নিশীথে শুনিয়া 'আয় তোরা আয়'
ভেঙে যায় ঘুমঘোর।

যত আগে চলি বেড়ে যায় লোক,
ভরে যায় ঘাট বাট।

ভুলে যায় সবে জাতি-অভিমান,
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে যায় মান অপমান
ব্রাহ্মণ আর জাঠ।

থাক্ ভাই, থাক্, কেন এ স্বপন—
এখনো সময় নয়।
এখনো একাকী দীর্ঘ রজনী
জাগিতে হইবে পল গনি গনি
অনিমেষ চোখে পূর্ব গগনে
দেখিতে অরুণোদয়।

এখনো বিহার কল্পজগতে,
অরণ্য রাজধানী।
এখনো কেবল নীরব ভাবনা,
কর্মবিহীন বিজন সাধনা,
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা
আপন মর্মবাণী।

একা ফিরি তাই যমুনার তীরে,
দুর্গম গিরিমাঝে।
মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে,
মিশাতেছি গান নদীকলরোলে,
গড়িতেছি মন আপনার মনে—
যোগ্য হতেছি কাজে।

এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ,
আরো কতদিন হবে—
চারি দিক হতে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে!

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
'পেয়েছি আমার শেষ!
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,

আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।

'নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগুপিছু।
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ—
নাই তার কাছে জীবন মরণ,
নাই নাই আর কিছু।'

হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে
দৈববাণীর মতো—
'উঠিয়া দাঁড়াও আপন আলোতে,
ওই চেয়ে দেখো কত দূর হতে
তোমার কাছেতে ধরা দিবে বলে
আসে লোক কত শত।

'ওই শোনো শোনো কল্লোলধ্বনি,
ছুটে হৃদয়ের ধারা।
স্থির থাকো তুমি, থাকো তুমি জাগি
প্রদীপের মতো আলস তেয়াগি,
এ নিশীথমাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তারা।'

ওই চেয়ে দেখো দিগন্ত-পানে
ঘনঘোর ঘটা অতি।
আসিতেছে ঝড় মরণেরে লয়ে,
তাই বসে বসে হৃদয়-আলয়ে
জ্বালাতেছি আলো, নিবিবে না ঝড়ে—
দিবে অনন্ত জ্যোতি।

যাও তবে সাহু, যাও রামদাস,
ফিরে যাও সখাগণ।
এসো দেখি সবে যাবার সময়
বলো দেখি সবে 'গুরুজির জয়'—

দুই হাত তুলি বলো 'জয় জয়
অলখ নিরঞ্জন'।

বলিতে বলিতে প্রভাততপন
উঠিল আকাশ-'পরে।
গিরির শিখরে গুরুর মুরতি
কিরণছটায় প্রোজ্জ্বল অতি,
বিদায় মাগিল অনুচরগণ—
নমিল ভক্তিভরে।

২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

## ধ্যান

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি—
তুমি আছ মোর জীবন মরণ
হরণ করি।

তোমার পাই নে কূল,
আপন-মাঝারে আপনার প্রেম
তাহারো পাই নে তুল।
উদয়শিখরে সূর্যের মতো
সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষনিহত
একটি নয়নসম—
অগাধ অপার উদাস দৃষ্টি
নাহিকো তাহার সীমা।
তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দপূর্ণিমা।

তুমি প্রশান্ত চিরনিশিদিন—
আমি অশান্ত, বিরামবিহীন,
চঞ্চল অনিবার—
যত দূর হেরি দিক্‌দিগন্তে
তুমি আমি একাকার।

জোড়াসাঁকো। ২৬ শ্রাবণ ১২৯৬

## অনন্ত প্রেম

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শত রূপে শত বার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার,
কত রূপ ধরে পরেছ গলায়,
নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।

যত শুনি সেই অতীত কাহিনী
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতিপুরাতন বিরহমিলনকথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমিররজনী ভেদিয়া
তোমারি মুরতি এসে,
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়নসলিলে
মিলনমধুর লাজে—
পুরাতন প্রেম নিত্যনূতন সাজে।

আজি সেই চিরদিবসের প্রেম
অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ,
নিখিল প্রাণের প্রীতি
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি—
সকল কালের সকল কবির গীতি।

জোড়াসাঁকো
২ ভাদ্র ১২৯৬

## মেঘদূত

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সংগীতমাঝে পুঞ্জীভূত করে।

সেদিন সে উজ্জয়িনীপ্রাসাদশিখরে
কী না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দাম পবনবেগ, গুরুগুরু রব।
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘসংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদক্রন্দন
এক দিনে। ছিন্ন করি কালের বন্ধন
সেই দিন ঝরে পড়েছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি তোমার উদার শ্লোকরাশি।

সেদিন কি জগতের যতেক প্রবাসী
জোড়হস্তে মেঘপানে শূন্যে তুলি মাথা
গেয়েছিল সমস্বরে বিরহের গাথা
ফিরি প্রিয়গৃহ-পানে? বন্ধনবিহীন

নবমেঘপক্ষ-'পরে করিয়া আসীন
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রেমের বারতা
অশ্রুবাষ্প-ভরা—দূর বাতায়নে যথা
বিরহিণী ছিল শুয়ে ভূতলশয়নে
মুক্ত কেশে, ম্লান বেশে, সজল নয়নে?

তাদের সবার গান তোমার সংগীতে
পাঠায়ে কি দিলে, কবি, দিবসে নিশীথে
দেশে দেশান্তরে খুঁজি' বিরহিণী প্রিয়া?—
শ্রাবণে জাহ্নবী যথা যায় প্রবাহিয়া
টানি লয়ে দিশ-দিশান্তের বারিধারা
মহাসমুদ্রের মাঝে হতে দিশাহারা।
পাষাণশৃঙ্খলে যথা বন্দী হিমাচল
আষাঢ়ে অনন্ত শূন্যে হেরি মেঘদল
স্বাধীন, গগনচারী, কাতরে নিশ্বাসি
সহস্র কন্দর হতে বাষ্প রাশি রাশি
পাঠায় গগনপানে ; ধায় তারা ছুটি
উধাও কামনাসম ; শিখরেতে উঠি
সকলে মিলিয়া শেষে হয় একাকার,
সমস্ত গগনতল করে অধিকার।

সেদিনের পরে গেছে কত শতবার
প্রথম দিবস স্নিগ্ধ নববরষার।
প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের 'পরে করি বরিষন
নববৃষ্টিবারিধারা, করিয়া বিস্তার
নবঘনস্নিগ্ধচ্ছায়া, করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের,
স্ফীত করি স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষাতরঙ্গিণী-সম।

কত কাল ধ'রে
কত সঙ্গীহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে,
বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ততারাশশী
আষাঢ়সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি
ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি উচ্চারণ

নিমগ্ন করেছে নিজ বিজনবেদন!
সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি-সম
তব কাব্য হতে।

ভারতের পূর্বশেষে
আমি বসে আছি ; যে শ্যামল বঙ্গদেশে
জয়দেব কবি আর-এক বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমালবিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।

আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝরঝর্,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার
খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া।

অন্ধকার রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত ; গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশদেশান্তরে। কোথা আছে
সানুমান আম্রকূট ; কোথা রহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপদমূলে
উপলব্যথিতগতি ; বেত্রবতীকূলে
পরিণতফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা ;
পথতরুশাখে কোথা গ্রামবিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড় কলরবে ঘিরে
বনস্পতি ; না জানি সে কোন্ নদীতীরে
যূথীবনবিহারিণী বনাঙ্গনা ফিরে,
তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল
মেঘের ছায়ার লাগি হতেছে বিকল ;
ভ্রূবিলাস শেখে নাই কারা সেই নারী
জনপদবধূজন গগনে নেহারি
ঘনঘটা, ঊর্ধ্বনেত্রে চাহে মেঘপানে,

ঘননীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়ানে ;
কোন্ মেঘশ্যামশৈলে মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনা
স্নিগ্ধ নবঘন হেরি আছিল উন্মনা
শিলাতলে, সহসা আসিতে মহা ঝড়
চকিত চকিত হয়ে ভয়ে জড়সড়
সম্বরি বসন ফিরে গুহাশ্রয় খুঁজি,
বলে, 'মা গো, গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি।'
কোথায় অবন্তিপুরী, নির্বিন্ধ্যা তটিনী ;
কোথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী
স্বমহিমচ্ছায়া, সেথা নিশিদ্বিপ্রহরে
প্রণয়চাঞ্চল্য ভুলি ভবনশিখরে
সুপ্ত পারাবত, শুধু বিরহবিকারে
রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে
সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথমাঝে
ক্বচিৎ বিদ্যুতালোকে ; কোথা সে বিরাজে
ব্রহ্মাবর্তে কুরুক্ষেত্র ; কোথা কন্‌খল
যেথা সেই জহ্নুকন্যা যৌবনচঞ্চল
গৌরীর ভ্রূকুটিভঙ্গি করি অবহেলা
ফেনপরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা
লয়ে ধূর্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল !

এইমতো মেঘরূপে ফিরি দেশে দেশে
হৃদয় ভাসিয়া চলে উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি ; সেথা কে পারিত
লয়ে যেতে তুমি ছাড়া, করি অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী— অমর ভুবনে !
অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে ইন্দ্রনীলশৈলমূলে
সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকূলে
মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা।
মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা
শয্যাপ্রান্তে লীনতনু ক্ষীণ শশীরেখা
পূর্বগগনের মূলে যেন অস্তপ্রায় !

কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা ;
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্তসৌন্দর্য-মাঝে একাকী জাগিয়া।

আবার হারায়ে যায়— হেরি চারি ধার
বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রাম ; ঘনায়ে আঁধার
আসিছে নির্জন নিশা ; প্রান্তরের শেষে
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকূল-উদ্দেশে।
ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান !
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ !
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ !
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদীগিরি সকলের শেষে !

শান্তিনিকেতন
৭/৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ অপরাহ্নে। ঘনবর্ষায়

## অহল্যার প্রতি

কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি,
অহল্যা, পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি,
নির্বাপিত-হোম-অগ্নি তাপসবিহীন
শূন্য তপোবনচ্ছায়ে ? আছিলে বিলীন
বৃহৎ পৃথ্বীর সাথে হয়ে একদেহ—
তখন কি জেনেছিলে তার মহাস্নেহ ?
ছিল কি পাষাণতলে অস্পষ্ট চেতনা ?
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,
মাতৃধৈর্যে মৌন মূক সুখদুঃখ যত
অনুভব করেছিলে স্বপনের মতো
সুপ্ত আত্মামাঝে ? দিবারাত্রি অহরহ
লক্ষ কোটি পরানীর মিলন, কলহ,

আনন্দবিষাদক্ষুব্ধ ক্রন্দন, গর্জন,
অযুত পান্থের পদধ্বনি অনুক্ষণ
পশিত কি অভিশাপনিদ্রা ভেদ ক'রে
কর্ণে তোর— জাগাইয়া রাখিত কি তোরে
নেত্রহীন মূঢ় রূঢ় অর্ধজাগরণে ?
বুঝিতে কি পেরেছিলে আপনার মনে
নিত্যনিদ্রাহীন ব্যথা মহাজননীর ?
যেদিন বহিত নব বসন্তসমীর,
ধরণীর সর্বাঙ্গের পুলকপ্রবাহ
স্পর্শ কি করিত তোরে ? জীবন-উৎসাহ
ছুটিত সহস্র পথে মরুদিগ্বিজয়ে
সহস্র আকারে, উঠিত সে ক্ষুব্ধ হয়ে
তোমার পাষাণ ঘেরি করিতে নিপাত
অনুর্বরা-অভিশাপ তব— সে আঘাত
জাগাত কি জীবনের কম্প তব দেহে ?

যামিনী আসিত যবে মানবের গেহে
ধরণী লইত টানি শ্রান্ত তনুগুলি।
আপনার বক্ষ-'পরে, দুঃখশ্রম ভুলি
ঘুমাত অসংখ্য জীব— জাগিত আকাশ—
তাদের শিথিল অঙ্গ, সুষুপ্ত নিশ্বাস
বিভোর করিয়া দিত ধরণীর বুক !
মাতৃ-অঙ্গে সেই কোটিজীবস্পর্শসুখ—
কিছু তার পেয়েছিলে আপনার মাঝে ?

যে গোপন অন্তঃপুরে জননী বিরাজে—
বিচিত্রিত যবনিকা পত্রপুষ্পজালে
বিবিধ বর্ণের লেখা— তারি অন্তরালে
রহিয়া অসূর্যম্পশ্য নিত্য চুপে চুপে
ভরিছে সন্তানগৃহ ধনধান্যরূপে
জীবনে যৌবনে, সেই গূঢ় মাতৃকক্ষে
সুপ্ত ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে
চিররাত্রিসুশীতল বিস্মৃতি-আলয়ে ;
যেথায় অনন্তকাল ঘুমায় নির্ভয়ে
লক্ষ জীবনের ক্লান্তি ধূলির শয্যায়,
নিমেষে নিমেষে যেথা ঝরে পড়ে যায়—

দিবসের তাপে শুষ্ক ফুল, দগ্ধ তারা,
জীর্ণ কীর্তি, শ্রান্ত সুখ, দুঃখ দাহহারা।

সেথা স্নিগ্ধ হস্ত দিয়ে পাপতাপরেখা
মুছিয়া দিয়াছে মাতা ; দিলে আজি দেখা
ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মতো
সুন্দর সরল শুভ্র। হয়ে বাক্যহত
চেয়ে আছ প্রভাতের জগতের পানে,
যে শিশির পড়েছিল তোমার পাষাণে
রাত্রিবেলা, এখন সে কাঁপিছে উল্লাসে
আজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।
যে শৈবাল রেখেছিল ঢাকিয়া তোমায়
ধরণীর শ্যামশোভা অঞ্চলের প্রায়
বহু বর্ষ হতে, পেয়ে বহু বর্ষাধারা
সতেজ সরল ঘন, এখনো তাহারা
লগ্ন হয়ে আছে তব নগ্ন গৌর দেহে
মাতৃদত্ত বস্ত্রখানি সুকোমল স্নেহে।

হাসে পরিচিত হাসি নিখিল সংসার।
তুমি চেয়ে নির্নিমেষ ; হৃদয় তোমার
কোন্ দূর কালক্ষেত্রে চলে গেছে একা
আপনার ধূলিলিপ্ত পদচিহ্নরেখা
পদে পদে চিনে চিনে ! দেখিতে দেখিতে
চারি দিক হতে সব এল চারি ভিতে
জগতের পূর্ব পরিচয় ; কৌতূহলে
সমস্ত সংসার ওই এল দলে দলে
সম্মুখে তোমার ; থেমে গেল কাছে এসে
চমকিয়া। বিস্ময়ে রহিল অনিমেষে।

অপূর্ব রহস্যময়ী মূর্তি বিবসন,
নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন—
পূর্ণস্ফুট পুষ্প যথা শ্যামপত্রপুটে
শৈশবে যৌবনে মিশে উঠিয়াছে ফুটে
এক বৃন্তে। বিস্মৃতিসাগর-নীলনীরে
প্রথম উষার মতো উঠিয়াছ ধীরে।

তুমি বিশ্বপানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমাপানে চেয়ে কথা নাহি কয় ;
দোঁহে মুখোমুখি। অপাররহস্যতীরে
চিরপরিচয়-মাঝে নব পরিচয়।

শান্তিনিকেতন। ১১/১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭

## বিদায়

অকূল সাগরমাঝে চলেছে ভাসিয়া
জীবনতরণী। ধীরে লাগিছে আসিয়া
তোমার বাতাস, বহি আনি কোন্ দূর
পরিচিত তীর হতে কত সুমধুর
পুষ্পগন্ধ, কত সুখস্মৃতি কত ব্যথা,
আশাহীন কত সাধ, ভাষাহীন কথা।
সম্মুখেতে তোমারি নয়ন জেগে আছে
আসন্ন আঁধারমাঝে অস্তাচল-কাছে
স্থির ধ্রুবতারাসম ; সেই অনিমেষ
আকর্ষণে চলেছি কোথায়, কোন্ দেশ
কোন্ নিরুদ্দেশ-মাঝে ! এমনি করিয়া
চিহ্নহীন পথহীন অকূল ধরিয়া
দূর হতে দূরে ভেসে যাব— অবশেষে
দাঁড়াইব দিবসের সর্বপ্রান্তদেশে
এক মুহূর্তের তরে, সারাদিন ভেসে
মেঘখণ্ড যথা রজনীর তীরে এসে
দাঁড়ায় থমকি ! ওগো,বারেক তখন
জীবনের খেলা রেখে করুণ নয়ন
পাঠায়ো পশ্চিমপানে, দাঁড়ায়ো একাকী
ওই দূর তীরদেশে অনিমেষ-আঁখি।
মুহূর্তে আঁধার নামি দিবে সব ঢাকি
বিদায়ের পথ ; তোমার অজ্ঞাত দেশে
আমি চলে যাব ; তুমি ফিরে যেয়ো হেসে
সংসারের খেলাঘরে, তোমার নবীন
দিবালোকে। অবশেষে যবে একদিন,
বহুদিন পরে, তোমার জগৎ-মাঝে
সন্ধ্যা দেখা দিবে—দীর্ঘ জীবনের কাজে
প্রমোদের কোলাহলে শ্রান্ত হবে প্রাণ,

মিলায়ে আসিবে ধীরে স্বপনসমান
চিররৌদ্রদগ্ধ এই কঠিন সংসার,
সেইদিন এইখানে আসিয়ো আবার।
এই তটপ্রান্তে বসে শ্রান্ত দু নয়ানে
চেয়ে দেখো ওই অস্ত-অচলের পানে
সন্ধ্যার তিমিরে, যেথা সাগরের কোলে
আকাশ মিশায়ে গেছে। দেখিবে তা হলে
আমার সে বিদায়ের শেষ চেয়ে-দেখা
এইখানে রেখে গেছে জ্যোতির্ময় রেখা।
সে অমর অশ্রুবিন্দু সন্ধ্যাতারকার
বিষণ্ণ আকার ধরি উদিবে তোমার
নিদ্রাতুর আঁখি-'পরে ; সারা রাত্রি ধ'রে
তোমার সে জনহীন বিশ্রামশিয়রে
একাকী জাগিয়া রবে। হয়তো স্বপনে
ধীরে ধীরে এনে দেবে তোমার স্মরণে
জীবনের প্রভাতের দু-একটি কথা।
এক ধারে সাগরের চিরচঞ্চলতা
তুলিবে অস্ফুট ধ্বনি— রহস্য অপার—
অন্য ধারে ঘুমাইবে সমস্ত সংসার।

কোল্‌ভিল্‌ টেরেস্‌। লন্ডন
আশ্বিন ১২৯৭। রাত্রি

## সোনার তরী

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা—
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়া-মসী-মাখা

গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা—
এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে—
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা পালে চলে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু ধারে—
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

ওগো, তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে—
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেয়ো যেথা যেতে চাও
যারে খুশি তারে দাও—
শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে।

যত চাও তত লও তরণী-'পরে
আরো আছে?— আর নাই, দিয়েছি ভরে।
এত কাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলই দিলাম তুলে
থরে বিথরে—
এখন আমারে লহো করুণা ক'রে।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই— ছোটো সে তরী
আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি—
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

শিলাইদহ। বোট। ফাল্গুন ১২৯৮

## নিদ্রিতা

একদা রাতে নবীন যৌবনে
স্বপ্ন হতে উঠিনু চমকিয়া ;
বাহিরে এসে দাঁড়ানু একবার,
ধরার পানে দেখিনু নিরখিয়া।
শীর্ণ হয়ে এসেছে শুকতারা,
পূর্বতটে হতেছে নিশি ভোর ;
আকাশকোণে বিকাশে জাগরণ,
ধরণীতলে ভাঙে নি ঘুমঘোর।
সমুখে প'ড়ে দীর্ঘ রাজপথ,
দু ধারে তারি দাঁড়ায়ে তরুসার ;
নয়ন মেলি সুদূরপানে চেয়ে
আপনমনে ভাবিনু একবার—
অরুণ-রাঙা আজি এ নিশিশেষে
ধরার মাঝে নূতন কোন্ দেশে
দুগ্ধফেনশয়ন করি আলা
স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা।

অশ্ব চড়ি তখনি বাহিরিনু,
কত যে দেশ বিদেশ হনু পার ;
একদা এক ধূসর সন্ধ্যায়
ঘুমের দেশে লভিনু পুরদ্বার।
সবাই সেথা অচল অচেতন,
কোথাও জেগে নাইকো জনপ্রাণী ;
নদীর তীরে জলের কলতানে
ঘুমায়ে আছে বিপুল পুরীখানি।
ফেলিতে পদ সাহস নাহি মানি,
নিমেষে পাছে সকল দেশ জাগে।
প্রাসাদমাঝে পশিনু সাবধানে,
শঙ্কা মোর চলিল আগে আগে।
ঘুমায় রাজা, ঘুমায় রানীমাতা,
কুমার-সাথে ঘুমায় রাজভ্রাতা ;
একটি ঘরে রত্নদীপ জ্বালা,
ঘুমায়ে সেথা রয়েছে রাজবালা।

কমলফুলবিমল শেজখানি,
নিলীন তাহে কোমল তনুলতা ;
মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে,
বাজিল বুকে সুখের মতো ব্যথা।
মেঘের মতো গুচ্ছ কেশরাশি
শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে ;
একটি বাহু বক্ষ'পরে পড়ি,
একটি বাহু লুটায় এক ধারে।
আঁচলখানি পড়েছে খসি পাশে,
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি ;
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি।
দেখিনু তারে, উপমা নাহি জানি—
ঘুমের দেশে স্বপন একখানি,
পালঙ্কেতে মগন রাজবালা
আপন ভরা লাবণ্যে নিরালা।

ব্যাকুল বুকে চাপিনু দুই বাহু,
না মানে বাধা হৃদয়কম্পন ;
ভূতলে বসি আনত করি শির
মুদিত আঁখি করিনু চুম্বন।
পাতার ফাঁকে আঁখির তারা দুটি
তাহারি প্যানে চাহিনু এক মনে ;
দ্বারের ফাঁকে দেখিতে চাহি যেন
কী আছে কোথা নিভৃত নিকেতনে।
ভূর্জপাতে কাজলমসী দিয়া
লিখিয়া দিনু আপন নাম ধাম ;
লিখিনু, 'অয়ি নিদ্রানিমগনা,
আমার প্রাণ তোমারে সঁপিলাম।'
যতন করি কনকসুতে গাঁথি
রতনহারে বাঁধিয়া দিনু পাঁতি ;
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা
তাহারি গলে পরায়ে দিনু মালা।

শান্তিনিকেতন
১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

## সুপ্তোত্থিতা

ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম,
উঠিল কলস্বর।
গাছের শাখে জাগিল পাখি,
কুসুমে মধুকর।
অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া,
হস্তীশালে হাতি।
মল্লশালে মল্ল জাগি
ফুলায় পুন ছাতি।

জাগিল পথে প্রহরীদল,
দুয়ারে জাগে দ্বারী।
আকাশে চেয়ে নিরখে বেলা
জাগিয়া নরনারী।
উঠিল জাগি রাজাধিরাজ,
জাগিল রানীমাতা।
কচালি আঁখি কুমার-সাথে
জাগিল রাজভ্রাতা।
নিভৃত ঘরে ধূপের বাস,
রতনদীপ জ্বালা,
জাগিয়া উঠি শয্যাতলে
শুধাল রাজবালা—
'কে পরালে মালা !'

খসিয়া-পড়া আঁচলখানি
বক্ষে তুলি দিল।
আপনপানে নেহারি চেয়ে
শরমে শিহরিল।
ত্রস্ত হয়ে চকিত চোখে
চাহিল চারি দিকে—
বিজন গৃহ, রতনদীপ
জ্বলিছে অনিমিখে।
গলার মালা খুলিয়া লয়ে
ধরিয়া দুটি করে
সোনার-সুতে-যতনে-গাঁথা
লিখনখানি পড়ে।

পড়িল নাম, পড়িল ধাম,
পড়িল লিপি তার,
কোলের 'পরে বিছায়ে দিয়ে
পড়িল শতবার।
শয়নশেষে রহিল বসে,
ভাবিল রাজবালা—
'আপন ঘরে ঘুমায়েছিনু
নিতান্ত নিরালা,
কে পরালে মালা!'

নূতন-জাগা কুঞ্জবনে
কুহরি উঠে পিক,
বসন্তের চুম্বনেতে
বিবশ দশ দিক।
বাতাস ঘরে প্রবেশ করে
ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে,
নবীন ফুলমঞ্জরীর
গন্ধ লয়ে আসে।
জাগিয়া উঠি বৈতালিক
গাহিছে জয়গান,
প্রাসাদদ্বারে ললিত স্বরে
বাঁশিতে উঠে তান।
শীতলছায়া নদীর পথে
কলসে লয়ে বারি,
কাঁকন বাজে, নূপুর বাজে,
চলিছে পুরনারী।
কাননপথে মর্মরিয়া
কাঁপিছে গাছপালা,
আধেক মুদি নয়নদুটি
ভাবিছে রাজবালা—
'কে পরালে মালা!'

বারেক মালা গলায় পরে,
বারেক লহে খুলি,
দুইটি করে চাপিয়া ধরে
বুকের কাছে তুলি।

শয়ন'পরে মেলায়ে দিয়ে
তৃষিত চেয়ে রয়,
এমনি করে পাইবে যেন
অধিক পরিচয়।
জগতে আজ কত-না ধ্বনি
উঠিছে কত ছলে,
একটি আছে গোপন কথা
সে কেহ নাহি বলে।
বাতাস শুধু কানের কাছে
বহিয়া যায় হুহু,
কোকিল শুধু অবিশ্রাম
ডাকিছে কুহু-কুহু।
নিভৃত ঘরে পরান-মন
একান্ত উতালা,
শয়নশেষে নীরবে ব'সে
ভাবিছে রাজবালা—
'কে পরালে মালা!'

কেমন বীর-মুরতি তার
মাধুরী দিয়ে মিশা—
দীপ্তিভরা নয়নমাঝে
তৃপ্তিহীন তৃষা।
স্বপ্নে তারে দেখেছে যেন
এমনি মনে লয়—
ভুলিয়া গেছে, রয়েছে শুধু
অসীম বিস্ময়।
পারশে যেন বসিয়াছিল,
ধরিয়াছিল কর—
এখনো তার পরশে যেন
সরস কলেবর।
চমকি মুখ দু হাতে ঢাকে,
শরমে টুটে মন—
লজ্জাহীন প্রদীপ কেন
নিভে নি সেই ক্ষণ!
কণ্ঠ হতে ফেলিল হার
যেন বিজুলিজ্বালা.

শয়ন'পরে লুটায়ে প'ড়ে
ভাবিল রাজবালা—
'কে পরালে মালা !'

এমনি ধীরে একটি ক'রে
কাটিছে দিন রাতি,
বসন্ত সে বিদায় নিল
লইয়া যূথী জাতি।
সঘন মেঘে বরষা আসে,
বরষে ঝরঝর্—
কাননে ফুটে নবমালতী
কদম্বকেশর।
স্বচ্ছ হাসি শরৎ আসে
পূর্ণিমামালিকা,
সকল বন আকুল করে
শুভ্র শেফালিকা।
আসিল শীত সঙ্গে লয়ে
দীর্ঘ দুখনিশা,
শিশির-ঝরা কুন্দফুলে
হাসিয়া কাঁদে দিশা।
ফাগুন মাস আবার এল
বহিয়া ফুলডালা,
জানালাপাশে একেলা ব'সে
ভাবিছে রাজবালা—
'কে পরালে মালা !'

শান্তিনিকেতন
১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

## হিং টিং ছট্

### স্বপ্নমঙ্গল

স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ,
অর্থ তার ভাবি ভাবি গবুচন্দ্র চুপ।
শিয়রে বসিয়া যেন তিনটে বাঁদরে
উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে।

একটু নড়িতে গেলে গালে মারে চড়,
চোখে মুখে লাগে তার নখের আঁচড়।
সহসা মিলাল তারা, এল এক বেদে,
'পাখি উড়ে গেছে' ব'লে মরে কেঁদে কেঁদে ;
সম্মুখে রাজারে দেখি তুলি নিল ঘাড়ে,
ঝুলায়ে বসায়ে দিল উচ্চ এক দাঁড়ে।
নীচেতে দাঁড়ায়ে এক বুড়ি থুড়্‌থুড়ি
হাসিয়া পায়ের তলে দেয় সুড়্‌সুড়ি।
রাজা বলে, 'কী আপদ!' কেহ নাহি ছাড়ে—
পা দুটা তুলিতে চাহে, তুলিতে না পারে।
পাখির মতন রাজা করে ঝট্‌পট্‌,
বেদে কানে কানে বলে 'হিং টিং ছট্‌'।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

হবুপুর রাজ্যে আজ দিন ছয়-সাত
চোখে কারো নিদ্রা নাই, পেটে নাই ভাত।
শীর্ণ গালে হাত দিয়ে নত করি শির
রাজ্যসুদ্ধ বালবৃদ্ধ ভেবেই অস্থির।
ছেলেরা ভুলেছে খেলা, পণ্ডিতেরা পাঠ,
মেয়েরা করেছে চুপ— এতই বিভ্রাট।
সারি সারি বসে গেছে, কথা নাহি মুখে—
চিন্তা যত ভারী হয় মাথা পড়ে ঝুঁকে।
ভুঁইফোঁড়া তত্ত্ব যেন ভূমিতলে খোঁজে,
সবে যেন বসে গেছে নিরাকার ভোজে।
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উঠে 'হিং টিং ছট্‌'।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

চারি দিক হতে এল পণ্ডিতের দল—
অযোধ্যা কনোজ কাঞ্চী মগধ কোশল।
উজ্জয়িনী হতে এল বুধ-অবতংস
কালিদাস-কবীন্দ্রের ভাগিনেয়-বংশ।
মোটা মোটা পুঁথি লয়ে উলটায় পাতা,
ঘন ঘন নাড়ে বসি টিকিসুদ্ধ মাথা।

বড়ো বড়ো মস্তকের পাকা শস্যখেত
বাতাসে দুলিছে যেন শীর্ষ-সমেত।
কেহ শ্রুতি, কেহ স্মৃতি, কেহ-বা পুরাণ,
কেহ ব্যাকরণ দেখে, কেহ অভিধান।
কোনোখানে নাহি পায় অর্থ কোনোরূপ,
বেড়ে ওঠে অনুস্বর বিসর্গের স্তূপ।
চুপ করে বসে থাকে, বিষম সংকট—
থেকে থেকে হেঁকে ওঠে 'হিং টিং ছট্'।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।'

কহিলেন হতাশ্বাস হবুচন্দ্ররাজ,
'ম্লেচ্ছদেশে আছে নাকি পণ্ডিতসমাজ,
তাহাদের ডেকে আনো যে যেখানে আছে—
অর্থ যদি ধরা পড়ে তাহাদের কাছে।'
কটা-চুল নীলচক্ষু কপিশকপোল
যবন পণ্ডিত আসে, বাজে ঢাক ঢোল।
গায়ে কালো মোটা মোটা ছাঁটাছোঁটা কুর্তি—
গ্রীষ্মতাপে উষ্মা বাড়ে, ভারি উগ্র মূর্তি।
ভূমিকা না করি কিছু ঘড়ি খুলি কয়,
'সতেরো মিনিট মাত্র রয়েছে সময়,
কথা যদি থাকে কিছু বলো চট্‌পট্।'
সভাসুদ্ধ বলি উঠে 'হিং টিং ছট্'।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

স্বপ্ন শুনি ম্লেচ্ছমুখ রাঙা টক্‌টকে,
আগুন ছুটিতে চায় মুখে আর চোখে।
হানিয়া দক্ষিণমুষ্টি বামকরতলে
'ডেকে এনে পরিহাস!' রেগেমেগে বলে।
ফরাসি পণ্ডিত ছিল; হাস্যোজ্জ্বলমুখে
কহিল নোয়ায়ে মাথা হস্ত রাখি বুকে,
'স্বপ্ন যাহা শুনিলাম রাজযোগ্য বটে;
হেন স্বপ্ন সকলের অদৃষ্টে না ঘটে।
কিন্তু তবু স্বপ্ন ওটা করি অনুমান,
যদিও রাজার শিরে পেয়েছিল স্থান।

অর্থ চাই, রাজকোষে আছে ভূরি ভূরি ;
রাজস্বপ্নে অর্থ নাই যত মাথা খুঁড়ি।
নাই অর্থ কিন্তু তবু কহি অকপট,
শুনিতে কী মিষ্ট আহা, হিং টিং ছট্।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

শুনিয়া সভাস্থ সবে করে 'ধিক্ ধিক্'—
'কোথাকার গণ্ডমূর্খ পাষণ্ড নাস্তিক!
স্বপ্ন শুধু স্বপ্নমাত্র মস্তিষ্কবিকার,
এ কথা কেমন করে করিব স্বীকার!
জগৎবিখ্যাত মোরা 'ধর্মপ্রাণ' জাতি!
স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে! দুপুরে ডাকাতি!'
হবুচন্দ্র রাজা কহে পাকালিয়া চোখ,
'গবুচন্দ্র, এদের উচিত শিক্ষা হোক।'
হেঁটোয় কণ্টক দাও, উপরে কণ্টক ;
ডালকুত্তাদের মাঝে করহ বণ্টক।'
সতেরো মিনিট কাল না হইতে শেষ
ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের আর না মিলে উদ্দেশ।
সভাস্থ সবাই ভাসে আনন্দাশ্রুনীরে,
ধর্মরাজ্যে পুনর্বার শান্তি এল ফিরে।
পণ্ডিতেরা মুখ চক্ষু করিয়া বিকট
পুনর্বার উচ্চারিল 'হিং টিং ছট্'।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

অতঃপর গৌড় হতে এল হেন বেলা
যবন পণ্ডিতদের গুরু-মারা চেলা।
নগ্নশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে—
কাছা কোঁচা শতবার খসে খসে পড়ে।
অস্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণখর্বদেহ—
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ।
এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।
না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল—
পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যতমুষল।

সগর্বে জিজ্ঞাসা করে, 'কী লয়ে বিচার ?
শুনিলে বলিতে পারি কথা দুই-চার,
ব্যাখ্যায় করিতে পারি উলট-পালট।'
সমস্বরে কহে সবে 'হিং টিং ছট্‌'।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

স্বপ্নকথা শুনি মুখ গম্ভীর করিয়া
কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া,
'নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার ;
বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।
ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্তন আবর্তন সম্বর্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আণব চৌম্বক বলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্মবিদ্যুৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট—
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হিং টিং ছট্‌।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

'সাধু সাধু সাধু' রবে কাঁপে চারি ধার :
সবে বলে, 'পরিষ্কার— অতি পরিষ্কার!
দুর্বোধ যা-কিছু ছিল হয়ে গেল জল,
শূন্য আকাশের মতো অত্যন্ত নির্মল।'
হাঁপ ছাড়ি উঠিলেন হবুচন্দ্ররাজ ;
আপনার মাথা হতে খুলি লয়ে তাজ
পরাইয়া দিল ক্ষীণ বাঙালির শিরে,
ভারে তার মাথাটুকু পড়ে বুঝি ছিঁড়ে।
বহু দিন পরে আজ চিন্তা গেল ছুটে,
হাবুডুবু হবুরাজ্য নড়িচড়ি উঠে।
ছেলেরা ধরিল খেলা, বৃদ্ধেরা তামুক,
এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মুখ।

দেশজোড়া মাথা-ধরা ছেড়ে গেল চট্,
সবাই বুঝিয়া গেল 'হিং টিং ছট্'।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

---

যে শুনিবে এই স্বপ্নমঙ্গলের কথা
সর্বভ্রম ঘুচে যাবে, নহিবে অন্যথা।
বিশ্বে কভু বিশ্ব ভেবে হবে না ঠকিতে,
সত্যেরে সে মিথ্যা বলি বুঝিবে চকিতে।
যা আছে তা নাই আর নাই যাহা আছে
এ কথা জাজ্বল্যমান হবে তার কাছে।
সবাই সরলভাবে দেখিবে যা-কিছু
সে আপন লেজুড় জুড়িবে তার পিছু।
এসো ভাই, তোলো হাই, শুয়ে পড়ো চিৎ;
অনিশ্চিত এ সংসারে এ কথা নিশ্চিত—
জগতে সকলি মিথ্যা, সব মায়াময়,
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

শান্তিনিকেতন
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

## বৈষ্ণবকবিতা

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?
পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহমিলন,
বৃন্দাবনগাথা— এই প্রণয়স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
শরমে সম্ভ্রমে, এ কি শুধু দেবতার?
এ সংগীতরসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা?

এ গীত-উৎসব-মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জনে বিরাজে ;
দাঁড়ায়ে বাহির-দ্বারে মোরা নরনারী
উৎসুক শ্রবণ পাতি শুনি যদি তারি
দুয়েকটি তান— দূর হতে তাই শুনে
তরুণ বসন্তে যদি নবীন ফাল্গুনে
অন্তর পুলকি উঠে— শুনি সেই সুর
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর
আমাদের ধরা— মধুময় হয়ে উঠে
আমাদের বনচ্ছায়ে যে নদীটি ছুটে
মোদের কুটিরপ্রান্তে যে কদম্ব ফুটে
বরষার দিনে— সেই প্রেমাতুর তানে
যদি ফিরে চেয়ে দেখি মোর পার্শ্বপানে
ধরি মোর বামবাহু রয়েছে দাঁড়ায়ে
ধরার সঙ্গিনী মোর হৃদয় বাড়ায়ে
মোর দিকে, বহি' নিজ মৌন ভালোবাসা,
ওই গানে যদি-বা সে পায় নিজভাষা,
যদি তার মুখে ফুটে পূর্ণ প্রেমজ্যোতি—
তোমার কি তাঁর, বন্ধু, তাহে কার ক্ষতি ?

সত্য করে কহো মোরে হে বৈষ্ণবকবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহতাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে ?
বিজন বসন্তরাতে মিলনশয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি ! এত প্রেমকথা
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে ! আজ তার নাহি অধিকার
সে সংগীতে ! তারি নারীহৃদয়সঞ্চিত
তার ভাষা হতে তারে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন !

আমাদেরই কুটিরকাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতাচরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন-তরে— তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেমগীতিহার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলনমেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে— আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

শাহাজাদপুর। ১৮ আষাঢ় ১২৯৯

## যেতে নাহি দিব

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি; বেলা দ্বিপ্রহর;
হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর,
জনশূন্য পল্লিপথে ধূলি উড়ে যায়
মধ্যাহ্নবাতাসে; স্নিগ্ধ অশথের ছায়
ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিনী জীর্ণ বস্ত্র পাতি
ঘুমায়ে পড়েছে; যেন রৌদ্রময়ী রাতি
ঝাঁ ঝাঁ করে চারি দিকে নিস্তব্ধ নিঃঝুম—
শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ঘুম।

গিয়েছে আশ্বিন; পূজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহুদূর দেশে
সেই কর্মস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হয়ে
বাঁধিছে জিনিসপত্র দড়াদড়ি লয়ে;
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এ ঘরে, ও ঘরে।
ঘরের গৃহিণী, চক্ষু ছলছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,
তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার
একদণ্ডতরে; বিদায়ের আয়োজনে
ব্যস্ত হয়ে ফিরে, যথেষ্ট না হয় মনে
যত বাড়ে বোঝা। আমি বলি, 'এ কী কাণ্ড।
এত ঘট, এত পট, হাঁড়ি সরা ভাণ্ড,

বোতল বিছানা বাক্স, রাজ্যের বোঝাই
কী করিব লয়ে? কিছু এর রেখে যাই,
কিছু লই সাথে।'

সে কথায় কর্ণপাত
নাহি করে কোনোজন। 'কী জানি দৈবাৎ
এটা ওটা আবশ্যক যদি হয় শেষে
তখন কোথায় পাবে বিভুঁই বিদেশে?—
সোনামুগ সরু-চাল সুপারি ও পান,
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান
গুড়ের পাটালি, কিছু ঝুনা নারিকেল,
দুইভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল,
আমসত্ত্ব আমচুর, সের-দুই দুধ—
এইসব শিশি কৌটা ওষুধ-বিষুধ।
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে—
মাথা খাও, ভুলিয়ো না খেয়ো মনে করে।'
বুঝিনু যুক্তির কথা বৃথা বাক্যব্যয়।
বোঝাই হইল উঁচু পর্বতের ন্যায়।
তাকানু ঘড়ির পানে, তার পরে ফিরে
চাহিনু প্রিয়ার মুখে; কহিলাম ধীরে,
'তবে আসি।' অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষু-'পরে বস্ত্রাঞ্চল টানি
অমঙ্গল-অশ্রুজল করিল গোপন।
বাহিরে দ্বারের কাছে বসি অন্যমন
কন্যা মোর চারি বছরের। এতক্ষণ
অন্য দিনে হয়ে যেত স্নানসমাপন;
দুটি অন্ন মুখে না তুলিতে আঁখিপাতা
মুদিয়া আসিত ঘুমে; আজি তার মাতা
দেখে নাই তারে, এত বেলা হয়ে যায়
নাই স্নানাহার। এতক্ষণ ছায়াপ্রায়
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে ঘেঁষে;
চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্নিমেষে
বিদায়ের আয়োজন। শ্রান্তদেহে এবে
বাহিরের দ্বারপ্রান্তে কী জানি কী ভেবে
চুপিচাপি বসে ছিল। কহিনু যখন
'মা গো, আসি' সে কহিল বিষণ্ণনয়ন

ম্লানমুখে, 'যেতে আমি দিব না তোমায়।'
যেখানে আছিল বসে রহিল সেথায় ;
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার ;
শুধু নিজহৃদয়ের স্নেহ-অধিকার
প্রচারিল, 'যেতে আমি দিব না তোমায়।'
তবুও সময় হল শেষ ; তবু হায়
যেতে দিতে হল।

ওরে মোর মূঢ় মেয়ে,
কে রে তুই, কোথা হতে কী শকতি পেয়ে
কহিলি এমন কথা এত স্পর্ধাভরে
'যেতে আমি দিব না তোমায়' ? চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে দুটি ছোটো হাতে
গরবিনী, সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বসি গৃহদ্বারপ্রান্তে শ্রান্তক্ষুদ্রদেহ
শুধু লয়ে ওইটুকু বুক-ভরা স্নেহ !
ব্যথিত হৃদয় হতে বহু ভয়ে লাজে
মর্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে, শুধু বলে রাখা 'যেতে দিতে
ইচ্ছা নাহি'। হেন কথা কে পারে বলিতে
'যেতে নাহি দিব' ! শুনি তোর শিশুমুখে
স্নেহের প্রবল গর্ববাণী, সকৌতুকে
হাসিয়া সংসার টেনে নিয়ে গেল মোরে ;
তুই শুধু পরাভূত চোখে জল ভ'রে
দুয়ারে রহিলি বসে ছবির মতন—
আমি দেখে চলে এনু মুছিয়া নয়ন।

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারা দিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধপরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো

নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগযুগান্তরক্লান্ত দিগন্তবিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিশ্বাস।

কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী! চলিতেছি যত দূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর
'যেতে আমি দিব না তোমায়'। ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে—
'যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।' সবে
কহে 'যেতে নাহি দিব'। তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে 'যেতে নাহি দিব'।
আয়ুক্ষীণদীপমুখে শিখা নিব-নিব,
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে—
কহিতেছে শত বার 'যেতে দিব না রে'।
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা. সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন— 'যেতে নাহি দিব'। হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদি কাল হতে!
প্রলয়সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে
প্রসারিতব্যগ্রবাহু জ্বলন্ত-আঁখিতে
'দিব না দিব না যেতে' ডাকিতে ডাকিতে
হুহু করে তীব্রবেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে।
সম্মুখ-ঊর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ
'দিব না দিব না যেতে'— নাহি শুনে কেউ,
নাহি কোনো সাড়া।

চারি দিক হতে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি
সেই বিশ্বমর্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যা-কণ্ঠস্বরে। শিশুর মতন

বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধ'রে
যাহা পায় তাই সে হারায়, তবু তো রে
শিথিল হল না মুষ্টি ; তবু অবিরত
সেই চারি বৎসরের কন্যাটির মতো
অক্ষুণ্ণ প্রেমের গর্বে কহিছে সে ডাকি
'যেতে নাহি দিব'। ম্লানমুখ, অশ্রু-আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব,
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব ;
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধকণ্ঠে কয়
'যেতে নাহি দিব'। যত বার পরাজয়
তত বার কহে,'আমি ভালোবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে !
আমার আকাঙ্ক্ষা-সম এমন আকুল,
এমন সকল-বাড়া, এমন অকূল,
এমন প্রবল, বিশ্বে কিছু আছে আর !'
এত বলি দর্পভরে করে সে প্রচার
'যেতে নাহি দিব'। তখনি দেখিতে পায়
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলিসম উড়ে চলে যায়
একটি নিশ্বাসে তার আদরের ধন ;
অশ্রুজলে ভেসে যায় দুইটি নয়ন,
ছিন্নমূল তরুসম পড়ে পৃথ্বীতলে
হতগর্ব নতশির। তবু প্রেম বলে,
'সত্যভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকারলিপি ।'— তাই স্ফীতবুকে
সর্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া, সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা,
বলে, 'মৃত্যু, তুমি নাই।'— হেন গর্বকথা !
মৃত্যু হাসে বসি। মরণপীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিষণ্ণ নয়ন-'পরে
অশ্রুবাষ্পসম, ব্যাকুল আশঙ্কা-ভরে
চিরকম্পমান। আশাহীন শ্রান্ত আশা
টানিয়া রেখেছে এক বিষাদকুয়াশা
বিশ্বময়। আজি যেন পড়িছে নয়নে—
দুখানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে

জড়ায়ে পড়িয়া আছে নিখিলেরে ঘিরে
স্তব্ধ সকাতর। চঞ্চল স্রোতের নীরে
পড়ে আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া—
অশ্রুবৃষ্টিভরা কোন্ মেঘের সে মায়া।

তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্মরে
এত ব্যাকুলতা ; অলস ঔদাস্যভরে
মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র লয়ে ; বেলা ধীরে যায় চলে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশথের তলে।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর-মাঝে ; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলো চুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ, মর্মাহত,
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো।

জোড়াসাঁকো। ১৪ কার্তিক ১২৯৯

## ঝুলন

আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে
মরণখেলা
নিশীথবেলা।
সঘন বরষা, গগন আঁধার,
হেরো বারিধারে কাঁদে চারি ধার,
ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে
ভাসাই ভেলা ;
বাহির হয়েছি স্বপ্নশয়ন
করিয়া হেলা
রাত্রিবেলা।

ওগো, পবনে গগনে সাগরে আজিকে
কী কল্লোল,
দে দোল দোল।
পশ্চাৎ হতে হাহা করে হাসি
মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি,
যেন এ লক্ষ যক্ষশিশুর
অট্টরোল।
আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে
হট্টগোল।
দে দোল দোল।

আজি জাগিয়া উঠিয়া পরান আমার
বসিয়া আছে
বুকের কাছে।
থাকিয়া থাকিয়া উঠিছে কাঁপিয়া
ধরিছে আমার বক্ষ চাপিয়া,
নিঠুর নিবিড় বন্ধনসুখে
হৃদয় নাচে ;
ত্রাসে উল্লাসে পরান আমার
ব্যাকুলিয়াছে
বুকের কাছে।

হায়, এত কাল আমি রেখেছিনু তারে
যতনভরে
শয়ন'পরে।
ব্যথা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে,
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে
বাসরশয়ন করেছি রচন
কুসুমথরে ;
দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তারে
গোপন ঘরে
যতনভরে।

কত সোহাগ করেছি চুম্বন করি
নয়নপাতে
স্নেহের সাথে।

শুনায়েছি তারে মাথা রাখি পাশে
কত প্রিয় নাম মৃদুমধু ভাষে,
গুঞ্জরতান করিয়াছি গান
জ্যোৎস্নারাতে ;
যা-কিছু মধুর দিয়েছিনু তার
দুখানি হাতে
স্নেহের সাথে।

শেষে সুখের শয়নে শ্রান্ত পরান
আলসরসে
আবেশবশে।
পরশ করিলে জাগে না সে আর,
কুসুমের হার লাগে গুরুভার,
ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার
নিশিদিবসে ;
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ
মরমে পশে
আবেশবশে।

ঢালি মধুরে মধুর বধূরে আমার
হারাই বুঝি,
পাই নে খুঁজি।
বাসরের দীপ নিবে নিবে আসে—
ব্যাকুল নয়নে হেরি চারি পাশে
শুধু রাশি রাশি শুষ্ক কুসুম
হয়েছে পুঁজি।
অতলস্বপ্নসাগরে ডুবিয়া
মরি যে যুঝি
কাহারে খুঁজি।

তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে
নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।
মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া
মারিবে ঠেলা—

আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে
ঝুলনখেলা
নিশীথবেলা।

দে দোল দোল।
দে দোল দোল।
এ মহাসাগরে তুফান তোল্।
বধূরে আমার পেয়েছি আবার—
ভরেছে কোল।
প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে
প্রলয়রোল।
বক্ষশোণিতে উঠেছে আবার
কী হিল্লোল!
ভিতরে বাহিরে জেগেছে আমার
কী কল্লোল!
উড়ে কুন্তল, উড়ে অঞ্চল,
উড়ে বনমালা বায়ুচঞ্চল,
বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিণী
মত্তবোল।
দে দোল দোল।

আয় রে ঝঞ্ঝা, পরানবধূর
আবরণরাশি করিয়া দে দূর,
করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন
বসন খোল্
দে দোল দোল।
প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয় লাজ,
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে
ভাবে বিভোল।
দে দোল দোল।
স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরেছে আজ
দুটো পাগল
দে দোল দোল।

রামপুর বোয়ালিয়া। ১৫ চৈত্র ১২৯৯

# সমুদ্রের প্রতি

### পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া

হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন ; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দিরপানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি ; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে,
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর-অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে। এ কী সুগম্ভীর স্নেহখেলা
অম্বুনিধি— ছল করি দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা
ধীরি ধীরি পা টিপিয়া পিছু হটি চলি যাও দূরে,
যেন ছেড়ে যেতে চাও ; আবার আনন্দপূর্ণ সুরে
উল্লসি ফিরিয়া আসি কল্লোলে ঝাঁপায়ে পড় বুকে—
রাশি রাশি শুভ্রহাস্যে,অশ্রুজলে, স্নেহগর্বসুখে
আর্দ্র করি দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্মল ললাট
আশীর্বাদে। নিত্যবিগলিত তব অন্তর বিরাট,
আদি অন্ত স্নেহরাশি— আদি অন্ত তাহার কোথা রে!
কোথা তার তল! কোথা কূল! বলো কে বুঝিতে পারে
তাহার অগাধ শান্তি, তাহার অপার ব্যাকুলতা,
তার সুগভীর মৌন, তার সমুচ্ছল কলকথা,
তার হাস্য, তার অশ্রুরাশি!— কখনো-বা আপনারে
রাখিতে পার না যেন, স্নেহপূর্ণস্ফীতস্তনভারে
উন্মাদিনী ছুটে এসে ধরণীরে বক্ষে ধর চাপি
নির্দয় আবেগে ; ধরা প্রচণ্ড পীড়নে উঠে কাঁপি
রুদ্ধশ্বাসে ঊর্ধ্বশ্বাসে চীৎকারি উঠিতে চাহে কাঁদি ;
উন্মত্ত স্নেহক্ষুধায় রাক্ষসীর মতো তারে বাঁধি
পীড়িয়া নাড়িয়া যেন টুটিয়া ফেলিয়া একেবারে
অসীম অতৃপ্তি-মাঝে গ্রাসিতে নাশিতে চাহ তারে
প্রকাণ্ড প্রলয়ে। পরক্ষণে মহা-অপরাধী-প্রায়
পড়ে থাক তটতলে স্তব্ধ হয়ে বিষণ্ণ ব্যথায়

নিষণ্ণ নিশ্চল— ধীরে ধীরে প্রভাত উঠিয়া এসে
শান্তদৃষ্টি চাহে তোমাপানে ; সন্ধ্যাসখী ভালোবেসে
স্নেহকরস্পর্শ দিয়ে সান্ত্বনা করিয়ে চুপে চুপে
চলে যায় তিমিরমন্দিরে ; রাত্রি শোনে বন্ধুরূপে
গুমরি ক্রন্দন তব রুদ্ধ অনুতাপে ফুলে ফুলে।

আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে ;
শুনিতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম তার, বোবার ইঙ্গিতভাষা-হেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয় অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে সেও যেন ওই ভাষা জানে—
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ-মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে ; সেই জন্মপূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী-'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের, অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।
দিক হতে দিগন্তরে যুগ হতে যুগান্তর গনি
তখন আছিলে তুমি একাকিনী অখণ্ড অকূল
আত্মহারা, প্রথম গর্ভের মহারহস্য বিপুল
না বুঝিয়া। দিবারাত্রি গূঢ় এক স্নেহব্যাকুলতা,
গর্ভিণীর পূর্বরাগ, অলক্ষিতে অপূর্ব মমতা,
অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষারাশি, নিঃসন্তান শূন্য বক্ষোদেশে
নিরন্তর উঠিত ব্যাকুলি। প্রতি প্রাতে উষা এসে
অনুমান করি যেত মহাসন্তানের জন্মদিন,
নক্ষত্র রহিত চাহি নিশি নিশি নিমেষবিহীন
শিশুহীন শয়নশিয়রে। সেই আদিজননীর
জনশূন্য জীবশূন্য স্নেহচঞ্চলতা সুগভীর,
আসন্নপ্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা,
অগাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা
অনাগত মহাভবিষ্যৎ-লাগি, হৃদয়ে আমার
যুগান্তরস্মৃতিসম উদিত হতেছে বারংবার।

আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথাভরে,
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য সুদূর-তরে
উঠিছে মর্মরস্বর। মানবহৃদয়সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে,
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্ধ-অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে ; মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি
আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা—
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।
তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম তারে সত্য বলি জানে,
সহস্র ব্যাঘাতমাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে—
জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে,
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ উঠে পুরে।
প্রাণভরা ভাষাহরা দিশাহারা সেই আশা নিয়ে
চেয়ে আছি তোমাপানে ; তুমি সিন্ধু, প্রকাণ্ড হাসিয়ে
টানিয়া নিতেছ যেন মহাবেগে কী নাড়ীর টানে
আমার এ মর্মখানি তোমার তরঙ্গ-মাঝখানে
কোলের শিশুর মতো।

হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি
আমার মানবভাষা ? জান কি তোমার ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এ পাশ - ও পাশ,
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণ শ্বাস।
নাহি জানে কী যে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃষা,
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকাজালে। অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহো সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মতো ; স্নিগ্ধ মাতৃপাণি
চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারংবার হানি
সর্বাঙ্গে সহস্রবার দিয়া তারে স্নেহময় চুমা
বলো তারে, 'শান্তি ! শান্তি !' বলো তারে, 'ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা !'

রামপুর বোয়ালিয়া
১৭ চৈত্র ১২৯৯

## হৃদয়যমুনা

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো, এসো মোর
হৃদয়নীরে।
তলতল ছলছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে।
আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড়কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।
ওই-যে শবদ চিনি, নূপুর রিনিকিঝিনি,
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে?
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো, এসো মোর
হৃদয়নীরে।

যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে—
হেথা শ্যাম দূর্বাদল, নবনীল নভস্তল,
বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে।
দুটি কালো আঁখি দিয়া মন যাবে বাহিরিয়া,
অঞ্চল খসিয়া গিয়া পড়িবে খুলে।
চাহিয়া বঞ্জুলবনে কী জানি পড়িবে মনে
বসি কুঞ্জে তৃণাসনে শ্যামল কূলে!
যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে।

যদি গাহন করিতে চাহ এসো নেমে এসো হেথা
গহনতলে।
নীলাম্বরে কী বা কাজ, তীরে ফেলে এসো আজ,
ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে
সোহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি,
উচ্ছ্বাসি পড়িবে আসি উরসে গলে—
ঘুরে ফিরে চারি পাশে কভু কাঁদে কভু হাসে,
কুলুকুলু কলভাষে কত কী ছলে!
যদি গাহন করিতে চাহ এসো নেমে এসো হেথা
গহনতলে।

যদি মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিলমাঝে
স্নিগ্ধ শান্ত সুগভীর, নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।
নাহি রাত্রি দিনমান— আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভুলে, নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে।
যদি মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিলমাঝে।

১২ আষাঢ় ১৩০০

## বিদায়-অভিশাপ

কচ। দেহো আজ্ঞা, দেবযানী, দেবলোকে দাস
করিবে প্রয়াণ। আজি গুরুগৃহবাস
সমাপ্ত আমার। আশীর্বাদ করো মোরে
যে বিদ্যা শিখিনু তাহা চিরদিন ধরে
অন্তরে জাজ্বল্য থাকে উজ্জ্বল রতন,
সুমেরুশিখরশিরে সূর্যের মতন
অক্ষয়কিরণ।

দেবযানী। মনোরথ পুরিয়াছে,
পেয়েছ দুর্লভ বিদ্যা আচার্যের কাছে,
সহস্রবর্ষের তব দুঃসাধ্য সাধনা
সিদ্ধ আজি— আর কিছু নাহি কি কামনা,
ভেবে দেখো মনে মনে।

কচ। আর কিছু নাহি।

দেবযানী। কিছু নাই? তবু আরবার দেখো চাহি,
অবগাহি হৃদয়ের সীমান্ত অবধি
করহ সন্ধান; অন্তরের প্রান্তে যদি
কোনো বাঞ্ছা থাকে, কুশের অঙ্কুরসম
ক্ষুদ্র, দৃষ্টি-অগোচর, তবু তীক্ষ্ণতম।

কচ। আজি পূর্ণ কৃতার্থ জীবন। কোনো ঠাই

মোর মাঝে কোনো দৈন্য কোনো শূন্য নাই,
সুলক্ষণে!

দেবযানী। তুমি সুখী ত্রিজগৎ-মাঝে।
যাও তবে ইন্দ্রলোকে আপনার কাজে
উচ্চশিরে গৌরব বহিয়া। স্বর্গপুরে
উঠিবে আনন্দধ্বনি, মনোহর সুরে
বাজিবে মঙ্গলশঙ্খ, সুরাঙ্গনাগণ
করিবে তোমার শিরে পুষ্পবরিষন
সদ্যছিন্ন নন্দনের মন্দারমঞ্জরী।
স্বর্গপথে কলকণ্ঠে অপ্সরী কিন্নরী
দিবে হুলুধ্বনি। আহা বিপ্র, বহুক্লেশে
কেটেছে তোমার দিন বিজনে বিদেশে
সুকঠোর অধ্যয়নে। নাহি ছিল কেহ
স্মরণ করায়ে দিতে সুখময় গেহ,
নিবারিতে প্রবাসবেদনা। অতিথিরে
যথাসাধ্য পূজিয়াছি দরিদ্রকুটিরে
যাহা ছিল দিয়ে। তাই ব'লে স্বর্গসুখ
কোথা পাব, কোথা হেথা অনিন্দিত মুখ
সুরললনার? বড়ো আশা করি মনে
আতিথ্যের অপরাধ রবে না স্মরণে
ফিরে গিয়ে সুখলোকে।

কচ। সুকল্যাণ হাসে
প্রসন্ন বিদায় আজি দিতে হবে দাসে।

দেবযানী। হাসি? হায় সখা, এ তো স্বর্গপুরী নয়।
পুষ্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়
মর্মমাঝে, বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে,
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারংবার ফিরে
মুদ্রিত পদ্মের কাছে। হেথা সুখ গেলে
স্মৃতি একাকিনী বসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে
শূন্যগৃহে; হেথায় সুলভ নহে হাসি।
যাও বন্ধু, কী হইবে মিথ্যা কাল নাশি—
উৎকণ্ঠিত দেবগণ—
যেতেছ চলিয়া?
সকলই সমাপ্ত হল দু-কথা বলিয়া?
দশশত বর্ষ পরে এই কি বিদায়!

কচ। দেবযানী, কী আমার অপরাধ !

দেবযানী। হায়,
সুন্দরী অরণ্যভূমি সহস্র বৎসর
দিয়েছে বল্লভছায়া, পল্লবমর্মর,
শুনায়েছে বিহঙ্গকূজন ; তারে আজি
এতই সহজে ছেড়ে যাবে ? তরুরাজি
ম্লান হয়ে আছে যেন, হেরো আজিকার
বনচ্ছায়া গাঢ়তর শোকে অন্ধকার,
কেঁদে ওঠে বায়ু, শুষ্ক পত্র ঝরে পড়ে—
তুমি শুধু চলে যাবে সহাস্য-অধরে
নিশান্তের সুখস্বপ্নসম ?

কচ। দেবযানী,
এ বনভূমিরে আমি মাতৃভূমি মানি ;
হেথা মোর নবজন্মলাভ। এর 'পরে
নাহি মোর অনাদর— চিরপ্রীতিভরে
চিরদিন করিব স্মরণ।

দেবযানী। এই সেই
বটতল, যেথা তুমি প্রতি দিবসেই
গোধন চরাতে এসে পড়িতে ঘুমায়ে
মধ্যাহ্নের খরতাপে ; ক্লান্ত তব কায়ে
অতিথিবৎসল তরু দীর্ঘ ছায়াখানি
দিত বিছাইয়া, সুখসুপ্তি দিত আনি
ঝর্ঝরপল্লবদলে করিয়া বীজন
মৃদুস্বরে ; যেয়ো সখা, তবু কিছুক্ষণ
পরিচিত তরুতলে বোসো শেষবার,
নিয়ে যাও সম্ভাষণ এ স্নেহছায়ার ;
দুই দণ্ড থেকে যাও, সে বিলম্বে তব
স্বর্গের হবে না কোনো ক্ষতি।

কচ। অভিনব
ব'লে যেন মনে হয় বিদায়ের ক্ষণে
এইসব চিরিপরিচিত বন্ধুগণে ;
পলাতক প্রিয়জনে বাঁধিবার তরে
করিছে বিস্তার সবে ব্যগ্র স্নেহভরে
নূতন বন্ধনজাল, অন্তিম মিনতি,

অপূর্ব সৌন্দর্যরাশি। ওগো বনস্পতি,
আশ্রিতজনের বন্ধু, করি নমস্কার।
কত পান্থ বসিবেক ছায়ায় তোমার ;
কত ছাত্র কত দিন আমার মতন
প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায়তলে নীরব নির্জন
তৃণাসনে, পতঙ্গের মৃদুগুঞ্জস্বরে,
করিবেক অধ্যয়ন ; প্রাতঃস্নান-পরে
ঋষিবালকেরা আসি সজল বল্কল
শুকাবে তোমার শাখে ; রাখালের দল
মধ্যাহ্নে করিবে খেলা ; ওগো, তারি মাঝে
এ পুরানো বন্ধু যেন স্মরণে বিরাজে।

দেবযানী। মনে রেখো আমাদের হোমধেনুটিরে ;
স্বর্গসুধা পান ক'রে সে পুণ্য গাভীরে
ভুলো না গরবে।

কচ। সুধা হতে সুধাময়
দুগ্ধ তার ; দেখে তারে পাপক্ষয় হয়—
মাতৃরূপা, শান্তিস্বরূপিণী, শুভ্রকান্তি
পয়স্বিনী। না মানিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি
তারে করিয়াছি সেবা, গহন কাননে
শ্যামশষ্প স্রোতস্বিনীতীরে তারি সনে
ফিরিয়াছি দীর্ঘ দিন ; পরিতৃপ্তিভরে
স্বেচ্ছামতে ভোগ করি নিম্নতট-'পরে
অপর্যাপ্ত তৃণরাশি সুস্নিগ্ধ কোমল—
আলস্যমন্থরতনু লভি তরুতল
রোমন্থ করেছে ধীরে শুয়ে তৃণাসনে
সারাবেলা ; মাঝে মাঝে বিশাল নয়নে
সকৃতজ্ঞ শান্ত দৃষ্টি মেলি, গাঢ়স্নেহ
চক্ষু দিয়া লেহন করেছে মোর দেহ।
মনে রবে সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ অচঞ্চল,
পরিপুষ্ট শুভ্রতনু চিক্কণ পিচ্ছল।

দেবযানী। আর, মনে রেখো আমাদের কলস্বনা
স্রোতস্বিনী বেণুমতী।

কচ। তারে ভুলিব না।
বেণুমতী, কত কুসুমিত কুঞ্জ দিয়ে

মধুকণ্ঠে আনন্দিত কলগান নিয়ে
আসিছে শুশ্রূষা বহি গ্রাম্যবধূসম
সদা ক্ষিপ্রগতি, প্রবাসসঙ্গিনী মম
নিত্য শুভব্রতা।

দেবযানী। হায় বন্ধু, এ প্রবাসে
আরো কোনো সহচরী ছিল তব পাশে,
পরগৃহবাসদুঃখ ভুলাবার তরে
যত্ন তার ছিল মনে রাত্রিদিন ধ'রে—
হায় রে দুরাশা!

কচ। চিরজীবনের সনে
তার নাম গাঁথা হয়ে গেছে।

দেবযানী। আছে মনে—
যেদিন প্রথম তুমি আসিলে হেথায়
কিশোর ব্রাহ্মণ, তরুণ অরুণপ্রায়
গৌরবর্ণ তনুখানি স্নিগ্ধদীপ্তি-ঢালা,
চন্দনে চর্চিত ভাল, কণ্ঠে পুষ্পমালা,
পরিহিত পট্টবাস, অধরে নয়নে
প্রসন্ন সরল হাসি, হোথা পুষ্পবনে
দাঁড়ালে আসিয়া—

কচ। তুমি সদ্য স্নান করি
দীর্ঘ আর্দ্র কেশজালে, নবশুক্লাম্বরী,
জ্যোতিঃস্নাত মূর্তিমতী উষা, হাতে সাজি,
একাকী তুলিতেছিলে নব পুষ্পরাজি
পূজার লাগিয়া। কহিনু করি বিনতি,
'তোমারে সাজে না শ্রম, দেহো অনুমতি,
ফুল তুলে দিব দেবী!'

দেবযানী। আমি সবিস্ময়
সেই ক্ষণে শুধানু তোমার পরিচয়।
বিনয়ে কহিলে, 'আসিয়াছি তব দ্বারে,
তোমার পিতার কাছে শিষ্য হইবারে
আমি বৃহস্পতিসুত।'

কচ। শঙ্কা ছিল মনে,
পাছে দানবের গুরু স্বর্গের ব্রাহ্মণে
দেন ফিরাইয়া।

দেবযানী। আমি গেনু তাঁর কাছে।
হাসিয়া কহিনু, 'পিতা, ভিক্ষা এক আছে
চরণে তোমার।' স্নেহে বসাইয়া পাশে
শিরে মোর দিয়ে হাত শান্ত মৃদু ভাষে
কহিলেন, 'কিছু নাহি অদেয় তোমারে।'
কহিলাম, 'বৃহস্পতিপুত্র তব দ্বারে
এসেছেন, শিষ্য করি লহো তুমি তাঁরে
এ মিনতি।'— সে আজিকে হল কত কাল,
তবু মনে হয় যেন সেদিন সকাল।

কচ। ঈর্ষাভরে তিনবার দৈত্যগণ মোরে
করিয়াছে বধ ; তুমি, দেবী, দয়া ক'রে
ফিরায়ে দিয়েছ মোর প্রাণ ; সেই কথা
হৃদয়ে জাগায়ে রবে চিরকৃতজ্ঞতা।

দেবযানী। কৃতজ্ঞতা ! ভুলে যেয়ো, কোনো দুঃখ নাই।
উপকার যা করেছি হয়ে যাক ছাই—
নাহি চাই দান-প্রতিদান। সুখস্মৃতি
নাহি কিছু মনে ? যদি আনন্দের গীতি
কোনো দিন বেজে থাকে অন্তরে বাহিরে,
যদি কোনো সন্ধ্যাবেলা বেণুমতীতীরে
অধ্যয়ন-অবসরে বসি পুষ্পবনে
অপূর্ব পুলকরাশি জেগে থাকে মনে,
ফুলের সৌরভসম হৃদয়-উচ্ছ্বাস
ব্যাপ্ত করে দিয়ে থাকে সায়াহ্ন-আকাশ,
ফুটন্ত নিকুঞ্জতল, সেই সুখকথা
মনে রেখো— দূর হয়ে যাক কৃতজ্ঞতা।
যদি, সখা, হেথা কেহ গেয়ে থাকে গান
চিত্তে যাহা দিয়েছিল সুখ, পরিধান
করে থাকে কোনোদিন হেন বস্ত্রখানি
যাহা দেখে মনে তব প্রশংসার বাণী
জেগেছিল, ভেবেছিলে প্রসন্ন-অন্তর
তৃপ্ত-চোখে 'আজি এরে দেখায় সুন্দর',
সেই কথা মনে কোরো অবসরক্ষণে
সুখস্বর্গধামে। কত দিন এই বনে
দিক্-দিগন্তরে আষাঢ়ের নীল জটা
শ্যামস্নিগ্ধ বরষার নবঘনঘটা

নেবেছিল, অবিরল বৃষ্টিজলধারে
কর্মহীন দিনে সঘনকল্পনাভারে
পীড়িত হৃদয় ; এসেছিল কতদিন
অকস্মাৎ বসন্তের বাধাবন্ধহীন
উল্লাসহিল্লোলাকুল যৌবন-উৎসাহ,
সংগীতমুখর সেই আবেগপ্রবাহ
লতায় পাতায় পুষ্পে বনে বনান্তরে
ব্যাপ্ত করি দিয়াছিল লহরে লহরে
আনন্দপ্লাবন ; ভেবে দেখো একবার,

কত উষা, কত জ্যোৎস্না, কত অন্ধকার
পুষ্পগন্ধঘন অমানিশা এই বনে
গেছে মিশে সুখে দুঃখে তোমার জীবনে—
তারি মাঝে হেন প্রাতঃ, হেন সন্ধ্যাবেলা,
হেন মুগ্ধরাত্রি, হেন হৃদয়ের খেলা,
হেন সুখ, হেন মুখ দেয় নাই দেখা
যাহা মনে আঁকা রবে চিরচিত্ররেখা
চিররাত্রি চিরদিন ? শুধু উপকার !
শোভা নহে, প্রীতি নহে, কিছু নহে আর !

কচ। আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
সখী ! বহে যাহা মর্মমাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব ?

দেবযানী। জানি সখে,
তোমার হৃদয় মোর হৃদয়-আলোকে
চকিতে দেখেছি কতবার, শুধু যেন
চক্ষের পলকপাতে। তাই আজি হেন
স্পর্ধা রমণীর। থাকো তবে, থাকো তবে,
যেয়ো নাকো। সুখ নাই যশের গৌরবে।
হেথা বেণুমতীতীরে মোরা দুই জন
অভিনব স্বর্গলোক করিব সৃজন
এ নির্জন বনচ্ছায়াসাথে মিশাইয়া
নিভৃত বিশ্রব্ধ মুগ্ধ দুইখানি হিয়া
নিখিলবিস্মৃত। ওগো বন্ধু, আমি জানি
রহস্য তোমার।

কচ। নহে, নহে, দেবযানী !

দেবযানী। নহে? মিথ্যা প্রবঞ্চনা! দেখি নাই আমি
মন তব? জান না কি প্রেম অন্তর্যামী?
বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন,
গন্ধ তার লুকাবে কোথায়? কতদিন
যেমনি তুলেছ মুখ, চেয়েছ যেমনি,
যেমনি শুনেছ তুমি মোর কণ্ঠধ্বনি
অমনি সর্বাঙ্গে তব কম্পিয়াছে হিয়া—
নড়িলে হীরক যথা পড়ে ঠিকরিয়া
আলোক তাহার। সে কি আমি দেখি নাই?
ধরা পড়িয়াছ বন্ধু, বন্দী তুমি তাই
মোর কাছে। এ বন্ধন নারিবে কাটিতে।
ইন্দ্র আর তব ইন্দ্র নহে।

কচ। শুচিস্মিতে,
সহস্র বৎসর ধরি এ দৈত্যপুরীতে
এরই লাগি করেছি সাধনা?

দেবযানী। কেন নহে?
বিদ্যারই লাগিয়া শুধু লোকে দুঃখ সহে
এজগতে? করে নি কি রমণীর লাগি
কোনো নর মহাতপ? পত্নীবর মাগি
করেন নি সংবরণ তপতীর আশে
প্রখর সূর্যের পানে তাকায়ে আকাশে
অনাহারে কঠোর সাধনা কত? হায়,
বিদ্যাই দুর্লভ শুধু, প্রেম কি হেথায়
এতই সুলভ? সহস্র বৎসর ধ'রে
সাধনা করেছ তুমি কী ধনের তরে
আপনি জান না তাহা। বিদ্যা এক ধারে
আমি এক ধারে— কভু মোরে কভু তারে
চেয়েছ সোৎসুকে; তব অনিশ্চিত মন
দোঁহারেই করিয়াছে যত্নে আরাধন
সংগোপনে। আজ মোরা দোঁহে এক দিনে
আসিয়াছি ধরা দিতে। লহো, সখা, চিনে
যারে চাও। বল যদি সরল সাহসে
'বিদ্যায় নাহিকো সুখ, নাহি সুখ যশে,
দেবযানী, তুমি শুধু সিদ্ধি মূর্তিমতী,
তোমারেই করিনু বরণ'— নাহি ক্ষতি,

নাহি কোনো লজ্জা তাহে। রমণীর মন
সহস্র বর্ষেরই, সখা, সাধনার ধন।

কচ। দেবসন্নিধানে, শুভে, করেছিনু পণ—
মহাসঞ্জীবনী বিদ্যা করি উপার্জন
দেবলোকে ফিরে যাব ; এসেছিনু তাই,
সেই পণ মনে মোর জেগেছে সদাই,
পূর্ণ সেই প্রতিজ্ঞা আমার, চরিতার্থ
এতকাল পরে এ জীবন। কোনো স্বার্থ
করি না কামনা আজি।

দেবযানী। ধিক্, মিথ্যাভাষী!
শুধু বিদ্যা চেয়েছিলে ? গুরুগৃহে আসি
শুধু ছাত্ররূপে তুমি আছিলে নির্জনে
শাস্ত্রগ্রন্থে রাখি আঁখি রত-অধ্যয়নে
অহরহ ? উদাসীন আর-সবা-'পরে ?
ছাড়ি অধ্যয়নশালা বনে বনান্তরে
ফিরিতে পুষ্পের তরে, গাঁথি মাল্যখানি
সহাস্য প্রফুল্লমুখে কেন দিতে আনি
এ বিদ্যাহীনারে ? এই কি কঠোর ব্রত ?
এই তব ব্যবহার বিদ্যার্থীর মতো ?
প্রভাতে রহিতে অধ্যয়নে, আমি আসি
শূন্য সাজি হাতে লয়ে দাঁড়াতেম হাসি,
তুমি কেন গ্রন্থ রাখি উঠিয়া আসিতে—
প্রফুল্ল শিশিরসিক্ত কুসুমরাশিতে
করিতে আমার পূজা ? অপরাহ্ণকালে
জলসেক করিতাম তরু-আলবালে—
আমারে হেরিয়া শ্রান্ত কেন দয়া করি
দিতে জল তুলে ? কেন পাঠ পরিহরি
পালন করিতে মোর মৃগশিশুটিকে ?
স্বর্গ হতে যে সংগীত এসেছিলে শিখে
কেন তাহা শুনাইতে, সন্ধ্যাবেলা যবে
নদীতীরে অন্ধকার নামিত নীরবে
প্রেমনত নয়নের স্নিগ্ধচ্ছায়াময়
দীর্ঘ পল্লবের মতো ? আমার হৃদয়
বিদ্যা নিতে এসে কেন করিলে হরণ
স্বর্গের চাতুরীজালে ? বুঝেছি এখন,

আমারে করিয়া বশ পিতার হৃদয়ে
চেয়েছিলে পশিবারে— কৃতকার্য হয়ে
আজ যাবে মোরে কিছু দিয়ে কৃতজ্ঞতা,
লব্ধমনোরথ অর্থী রাজদ্বারে যথা
দ্বারীহস্তে দিয়ে যায় মুদ্রা দুই-চারি
মনের সন্তোষে!

কচ। হা অভিমানিনী নারী,
সত্য শুনে কী হইবে সুখ? ধর্ম জানে,
প্রতারণা করি নাই; অকপট-প্রাণে
আনন্দ-অন্তরে তব সাধিয়া সন্তোষ,
সেবিয়া তোমারে যদি করে থাকি দোষ,
তার শাস্তি দিতেছেন বিধি। ছিল মনে
কব না সে কথা। বলো, কী হইবে জেনে
ত্রিভুবনে কারো যাহে নাই উপকার,
একমাত্র শুধু যাহা নিতান্ত আমার
আপনার কথা। ভালোবাসি কি না আজ
সে তর্কে কী ফল? আমার যা আছে কাজ
সে আমি সাধিব। স্বর্গ আর স্বর্গ ব'লে
যদি মনে নাহি লাগে, দূরবনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধমৃগসম,
চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম
সর্বকার্যমাঝে— তবু চলে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে। দেব-সবে
এই সঞ্জীবনী বিদ্যা করিয়া প্রদান
নূতন দেবত্ব দিয়া তবে মোর প্রাণ
সার্থক হইবে; তার পূর্বে নাহি মানি
আপনার সুখ। ক্ষমো মোরে দেবযানী,
ক্ষমো অপরাধ।

দেবযানী। ক্ষমা কোথা মনে মোর!
করেছ এ নারীচিত্ত কুলিশকঠোর
হে ব্রাহ্মণ! তুমি চলে যাবে স্বর্গলোকে
সগৌরবে, আপনার কর্তব্যপুলকে
সর্ব দুঃখশোক করি দূরপরাহত—
আমার কী আছে কাজ, কী আমার ব্রত!
আমার এ প্রতিহত নিষ্ফল জীবনে

কী রহিল, কিসের গৌরব ! এই বনে
বসে রব নতশিরে নিঃসঙ্গ একাকী
লক্ষ্যহীনা। যে দিকেই ফিরাইব আঁখি
সহস্র স্মৃতির কাঁটা বিঁধিবে নিষ্ঠুর ;
লুকায়ে বক্ষের তলে লজ্জা অতি ক্রূর
বারংবার করিবে দংশন। ধিক্ ধিক্,
কোথা হতে এলে তুমি নির্মম পথিক,
বসি মোর জীবনের বনচ্ছায়াতলে
দণ্ড দুই অবসর কাটাবার ছলে
জীবনের সুখগুলি ফুলের মতন
ছিন্ন করে নিয়ে মালা করেছ গ্রন্থন
একখানি সূত্র দিয়ে ; যাবার বেলায়
সে মালা নিলে না গলে, পরম হেলায়
সেই সূক্ষ্ম সূত্রখানি দুই ভাগ ক'রে
ছিঁড়ে দিয়ে গেলে। লুটাইল ধূলি-'পরে
এ প্রাণের সমস্ত মহিমা। তোমা-'পরে
এই মোর অভিশাপ— যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ, তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ,
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

কচ। আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে—
ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।

কালীগ্রাম। ২৬ শ্রাবণ [১৩০০]

## বসুন্ধরা

আমারে ফিরায়ে লহো, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই ;
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো ; বিদারিয়া
এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণবন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ

অন্ধ কারাগার, হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে, উত্তরে দক্ষিণে,
পুরবে পশ্চিমে— শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবনরসে ; যাই পরশিয়া
স্বর্ণশীর্ষে-আনমিত শস্যক্ষেত্রতল
অঙ্গুলির আন্দোলনে ; নবপুষ্পদল
করি পূর্ণ সংগোপনে সুবর্ণলেখায়
সুধাগন্ধে মধুবিন্দুভারে ; নীলিমায়
পরিব্যাপ্ত করি দিয়া মহাসিন্ধুনীর
তীরে তীরে করি নৃত্য স্তব্ধ ধরণীর
অনন্ত কল্লোলগীতে ; উল্লসিত রঙ্গে
ভাষা প্রসারিয়া দিই তরঙ্গে তরঙ্গে
দিক্-দিগন্তরে ; শুভ্র উত্তরীয়-প্রায়
শৈলশৃঙ্গে বিছাইয়া দিই আপনায়
নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জনে
নিঃশব্দ নিভৃতে।

যে ইচ্ছা গোপনে মনে
উৎসসম উঠিতেছে অজ্ঞাতে আমার
বহুকাল ধ'রে, হৃদয়ের চারি ধার
ক্রমে পরিপূর্ণ করি বাহিরিতে চাহে
উদ্‌বেল উদ্দাম মুক্ত উদার প্রবাহে
সিঞ্চিতে তোমায়— ব্যথিত সে বাসনারে
বন্ধমুক্ত করি দিয়া শতলক্ষ ধারে
দেশে দেশে দিকে দিকে পাঠাব কেমনে
অন্তর ভেদিয়া ! বসি শুধু গৃহকোণে
লুব্ধচিত্তে করিতেছি সদা অধ্যয়ন,
দেশে দেশান্তরে কারা করেছে ভ্রমণ
কৌতূহলবশে ; আমি তাহাদের সনে
করিতেছি তোমারে বেষ্টন মনে মনে
কল্পনার জালে।

সুদুর্গম দূরদেশ—
পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ,
মহাপিপাসার রঙ্গভূমি ; রৌদ্রালোকে
জ্বলন্ত বালুকারাশি সূচি বিঁধে চোখে ;
দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশয্যা-'পরে
জ্বরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে প'ড়ে
তপ্তদেহ, উষ্ণশ্বাস বহ্নিজ্বালাময়,
শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ, নির্দয়।
কত দিন গৃহপ্রান্তে বসি বাতায়নে
দূর দূরান্তের দৃশ্য আঁকিয়াছি মনে
চাহিয়া সম্মুখে ; চারি দিকে শৈলমালা,
মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা
স্ফটিকনির্মল স্বচ্ছ ; খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি ; হিমরেখা
নীল গিরিশ্রেণী-'পরে দূরে যায় দেখা
দৃষ্টি রোধ করি ; যেন নিশ্চল নিষেধ
উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি ভেদ
যোগমগ্ন ধূর্জটির তপোবনদ্বারে।
মনে মনে ভ্রমিয়াছি দূর সিন্ধুপারে
মহামেরুদেশে— যেখানে লয়েছে ধরা
অনন্তকুমারীব্রত, হিমবস্ত্র পরা,
নিঃসঙ্গ, নিঃস্পৃহ, সর্ব-আভরণহীন ;
যেথা দীর্ঘরাত্রিশেষে ফিরে আসে দিন
শব্দশূন্য সংগীতবিহীন ; রাত্রি আসে,
ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে
অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো।
নূতন দেশের নাম যত পাঠ করি,
বিচিত্র বর্ণনা শুনি, চিত্ত অগ্রসরি
সমস্ত স্পর্শিতে চাহে— সমুদ্রের তটে
ছোটো ছোটো নীলবর্ণ পর্বতসংকটে
একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে জাল,
জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল,
জেলে ধরিতেছে মাছ, গিরিমধ্যপথে
সংকীর্ণ নদীটি চলি আসে কোনোমতে

আঁকিয়া-বাঁকিয়া ; ইচ্ছা করে সে নিভৃত
গিরিক্রোড়ে-সুখাসীন ঊর্মিমুখরিত
লোকনীড়খানি হৃদয়ে বেষ্টিয়া ধরি
বাহুপাশে। ইচ্ছা করে আপনার করি
যেখানে যা-কিছু আছে ; নদীস্রোতোনীরে
আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তীরে
নব নব লোকালয়ে করে যাই দান
পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান
দিবসে নিশীথে ; পৃথিবীর মাঝখানে
উদয়সমুদ্র হতে অস্তসিন্ধুপানে
প্রসারিয়া আপনারে, তুঙ্গ গিরিরাজি
আপনার সুদুর্গম রহস্যে বিরাজি,
কঠিন পাষাণক্রোড়ে তীব্র হিমবায়ে
মানুষ করিয়া তুলি লুকায়ে লুকায়ে
নব নব জাতি। ইচ্ছা করে মনে মনে—
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোকসনে
দেশে দেশান্তরে ; উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই আরবসন্তান
দুর্দম স্বাধীন ; তিব্বতের গিরিতটে,
নির্লিপ্তপ্রস্তরপুরীমাঝে, বৌদ্ধমঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক
গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান
কর্ম-অনুরত— সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে।
অরুগ্‌ণ বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা—
নাহি কোনো ধর্মাধর্ম, নাহি কোনো প্রথা,
নাহি কোনো বাধাবন্ধ, নাহি চিন্তাজ্বর,
নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাহি ঘর-পর,
উন্মুক্ত জীবনস্রোত বহে দিনরাত
সম্মুখে আঘাত করি সহিয়া আঘাত
অকাতরে ; পরিতাপজর্জর পরানে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে,
ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়—
বর্তমানতরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়

নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি—
উচ্ছৃঙ্খল সে জীবন সেও ভালোবাসি ;
কতবার ইচ্ছা করে সেই প্রাণঝড়ে
ছুটিয়া চলিয়া যাই পূর্ণপালভরে
লঘুতরীসম।

হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে ; দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন, রুদ্র মেঘমন্দ্র স্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের 'পরে
বিদ্যুতের বেগে ; অনায়াস সে মহিমা,
হিংসাতীব্র সে আনন্দ, সে দৃপ্ত গরিমা—
ইচ্ছা করে একবার লভি তার স্বাদ।
ইচ্ছা করে বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে।

হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমাপানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে ; ইচ্ছা করিয়াছে—
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্রমেখলা-পরা তব কটিদেশ ;
প্রভাতরৌদ্রের মতো অনন্ত অশেষ
ব্যাপ্ত হয়ে দিকে দিকে, অরণ্যে ভূধরে
কম্পমান পল্লবের হিল্লোলের 'পরে
করি নৃত্য সারাবেলা, করিয়া চুম্বন
প্রত্যেক কুসুমকলি, করি আলিঙ্গন
সঘন কোমল শ্যাম তৃণক্ষেত্রগুলি,
প্রত্যেক তরঙ্গ-'পরে সারা দিন দুলি
আনন্দদোলায় ; রজনীতে চুপে চুপে
নিঃশব্দচরণে বিশ্বব্যাপী নিদ্রারূপে
তোমার সমস্ত পশুপক্ষীর নয়নে
অঙ্গুলি বুলায়ে দিই, শয়নে শয়নে
নীড়ে নীড়ে গৃহে গৃহে গুহায় গুহায়

করিয়া প্রবেশ, বৃহৎ অঞ্চল-প্রায়
আপনারে বিস্তারিয়া ঢাকি বিশ্বভূমি
সুস্নিগ্ধ আঁধারে।

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা-সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্তচরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু। তাই আজি
কোনো দিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি—
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে
কী জীবনরসধারা অহর্নিশি ধ'রে
করিতেছে সঞ্চরণ, কুসুমমুকুল
কী অন্ধ-আনন্দ-ভরে ফুটিয়া আকুল
সুন্দর বৃন্তের মুখে, নব রৌদ্রালোকে
তরুলতাতৃণগুল্ম কী গূঢ় পুলকে
কী মূঢ় প্রমোদরসে উঠে হরষিয়া—
মাতৃস্তনপানশ্রান্ত পরিতৃপ্তহিয়া
সুখস্বপ্নহাস্যমুখ শিশুর মতন।
তাই আজি কোনোদিন শরৎকিরণ
পড়ে যবে পক্কশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র-'পরে,
নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা—
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার ক'রে
সমস্ত ভুবন; সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হতে মিশ্রিতমর্মরবৎ

শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দখেলার
পরিচিত রব। সেথায় ফিরায়ে লহো
মোরে আরবার ; দূর করো সে বিরহ
যে বিরহ থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে
হেরি যবে সম্মুখেতে সন্ধ্যার কিরণে
বিশাল প্রান্তর, যবে ফিরে গাভীগুলি
দূর গোষ্ঠে মাঠপথে উড়াইয়া ধূলি,
তরু-ঘেরা গ্রাম হতে উঠে ধূমলেখা
সন্ধ্যাকাশে ; যবে চন্দ্র দূরে দেয় দেখা
শ্রান্ত পথিকের মতো অতি ধীরে ধীরে
নদীপ্রান্তে জনশূন্য বালুকার তীরে,
মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী
নির্বাসিত, বাহু বাড়াইয়া ধেয়ে আসি
সমস্ত বাহিরখানি লইতে অন্তরে—
এ আকাশ, এ ধরণী, এই নদী-'পরে
শুভ্র শান্ত সুপ্ত জ্যোৎস্নারাশি। কিছু নাহি
পারি পরশিতে, শুধু শূন্যে থাকি চাহি
বিষাদব্যাকুল। আমারে ফিরায়ে লহো
সেই সর্বমাঝে যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্র রূপে, গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষ সুরে, উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গিতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু ;
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু,
তোমারে সহস্র দিকে করিছে দোহন
তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন
তৃষিতপরানি যত ; আনন্দের রস
কত রূপে হতেছে বর্ষণ, দিক দশ
ধ্বনিছে কল্লোলগীতে। নিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্তেই
একত্রে করিব আস্বাদন, এক হয়ে
সকলের সনে। আমার আনন্দ লয়ে
হবে না কি শ্যামতর অরণ্য তোমার ?
প্রভাত-আলোকমাঝে হবে না সঞ্চার

নবীন কিরণকম্প ? মোর মুগ্ধ ভাবে
আকাশধরণীতল আঁকা হয়ে যাবে
হৃদয়ের রঙে— যা দেখে কবির মনে
জাগিবে কবিতা, প্রেমিকের দু নয়নে
লাগিবে ভাবের ঘোর, বিহঙ্গের মুখে
সহসা আসিবে গান। সহস্রের সুখে
রঞ্জিত হইয়া আছে সর্বাঙ্গ তোমার
হে বসুধে— জীবস্রোত কত বারংবার
তোমারে মণ্ডিত করি আপন জীবনে
গিয়েছে ফিরেছে, তোমার মৃত্তিকা-সনে
মিশায়েছে অন্তরের প্রেম, গেছে লিখে
কত লেখা, বিছায়েছে কত দিকে দিকে
ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন ; তারি সনে
আমার সমস্ত প্রেম মিশায়ে যতনে
তোমার অঞ্চলখানি দিব রাঙাইয়া
সজীব বরনে, আমার সকল দিয়া
সাজাব তোমারে। নদীজলে মোর গান
পাবে না কি শুনিবারে কোনো মুগ্ধ কান
নদীকূল হতে ? উষালোকে মোর হাসি
পাবে না কি দেখিবারে কোনো মর্ত্যবাসী
নিদ্রা হতে উঠি ? আজ শতবর্ষ পরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরান ? ঘরে ঘরে
কত শত নরনারী চিরকাল ধ'রে
পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি রব না আমি ? আসিব না নেমে
তাদের মুখের 'পরে হাসির মতন,
তাদের সর্বাঙ্গমাঝে সরস যৌবন,
তাদের বসন্তদিনে অকস্মাৎ সুখ,
তাদের মনের কোণে নবীন উন্মুখ
প্রেমের অঙ্কুর-রূপে ? ছেড়ে দিবে তুমি
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি—
যুগযুগান্তের মহা মৃত্তিকাবন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে ? করিব গমন
ছাড়ি লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড়খানি ?
চতুর্দিক হতে মোরে লবে না কি টানি

এইসব তরুলতা গিরি নদী বন,
এই চিরদিবসের সুনীল গগন,
এ জীবনপরিপূর্ণ উদার সমীর,
জাগরণপূর্ণ আলো, সমস্ত প্রাণীর
অন্তরে অন্তরে গাঁথা জীবনসমাজ ?
ফিরিব তোমারে ঘিরি করিব বিরাজ
তোমার আত্মীয়মাঝে ; কীট পশু পাখি
তরু গুল্ম লতারূপে বারংবার ডাকি
আমারে লইবে তব প্রাণতপ্ত বুকে ;
যুগে যুগে জন্মে জন্মে স্তন দিয়ে মুখে
মিটাইবে জীবনের শতলক্ষ ক্ষুধা
শতলক্ষ আনন্দের স্তন্যরসসুধা
নিঃশেষে নিবিড় স্নেহে করাইয়া পান।
তার পরে ধরিত্রীর যুবক সন্তান
বাহিরিব জগতের মহাদেশ-মাঝে
অতি দূর দূরান্তরে জ্যোতিষ্কসমাজে
সুদুর্গম পথে। এখনো মিটে নি আশা,
এখনো তোমার স্তন-অমৃত-পিপাসা
মুখেতে রয়েছে লাগি, তোমার আনন
এখনো জাগায় চোখে সুন্দর স্বপন,
এখনো কিছুই তব করি নাই শেষ,
সকলই রহস্যপূর্ণ, নেত্র অনিমেষ
বিস্ময়ের শেষতল খুঁজে নাহি পায়,
এখনো তোমার বুকে আছি শিশুপ্রায়
মুখপানে চেয়ে। জননী, লহো গো মোরে
সঘনবন্ধন তব বাহুযুগে ধ'রে—
আমারে করিয়া লহো তোমার বুকের—
তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের
উৎস উঠিতেছে যেথা সে গোপন পুরে
আমারে লইয়া যাও— রাখিয়ো না দূরে।

২৫ কার্তিক ১৩০০

## নিরুদ্দেশ যাত্রা

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী?
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী।
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু মধুরহাসিনী—
বুঝিতে না পারি কী জানি কী আছে
তোমার মনে।
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি,
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগনকোণে।
কী আছে হোথায়— চলেছি কিসের
অন্বেষণে?

বলো দেখি মোরে, শুধাই তোমায়
অপরিচিতা—
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছলছল-আঁখি
অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
ঊর্মিমুখর সাগরের পার
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
চরণতলে?
তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে
কথা না ব'লে।

হূহু ক'রে বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘ শ্বাস।
অন্ধ আবেগে করে গর্জন
জলোচ্ছ্বাস।

সংশয়ময় ঘননীলনীর,
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
দুলিছে যেন।
তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তারি 'পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ,
তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি
হাসিছ কেন ?
আমি তো বুঝি না কী লাগি তোমার
বিলাস হেন।

যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি
'কে যাবে সাথে',
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে
নবীন প্রাতে।
দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিমপানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
সোনার ফলে ?
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
কথা না ব'লে।

তার পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ,
কখনো রবি—
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর কখনো
শান্ত ছবি।
বেলা বহে যায়, পালে লাগে বায়,
সোনার তরণী কোথা চলে যায়—
পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন
অস্তাচলে।
এখন বারেক শুধাই তোমায়
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়—

আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি
তিমিরতলে ?
হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন
কথা না ব'লে।

আঁধার রজনী আসিবে এখনি
মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক
পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ,
শুধু কানে আসে জলকলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব
কেশের রাশি।
বিকলহৃদয় বিবশশরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর,
'কোথা আছ, ওগো, করহ পরশ
নিকটে আসি।'
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না
নীরব হাসি।

২৭ অগ্রহায়ণ ১৩০০

## জ্যোৎস্নারাত্রে

শান্ত করো, শান্ত করো এ ক্ষুব্ধ হৃদয়
হে নিস্তব্ধ পূর্ণিমাযামিনী ! অতিশয়
উদ্‌ভ্রান্ত বাসনা বক্ষে করিছে আঘাত
বারংবার, তুমি এসো স্নিগ্ধ অশ্রুপাত
দগ্ধ বেদনার 'পরে। শুভ্র সুকোমল
মোহভরা নিদ্রাভরা করপদ্মদল
আমার সর্বাঙ্গে মনে দাও বুলাইয়া,
বিভাবরী, সর্ব ব্যথা দাও ভুলাইয়া।

বহুদিন পরে আজি দক্ষিণবাতাস
প্রথম বহিছে। মুগ্ধ হৃদয় দুরাশ
তোমার চরণপ্রান্তে রাখি তপ্ত শির
নিঃশব্দে ফেলিতে চাহে রুদ্ধ অশ্রুনীর

হে মৌনরজনী! পাণ্ডুর অম্বর হতে
ধীরে ধীরে এসো নামি লঘুজ্যোৎস্নাস্রোতে,
মৃদুহাস্যে নতনেত্রে দাঁড়াও আসিয়া
নির্জন শিয়রতলে। বেড়াক ভাসিয়া
রজনীগন্ধার গন্ধ মদিরলহরী
সমীরহিল্লোলে; স্বপ্নে বাজুক বাঁশরি
চন্দ্রলোকপ্রান্ত হতে; তোমার অঞ্চল
বায়ুভরে উড়ে এসে পুলকচঞ্চল
করুক আমার তনু; অধীর মর্মরে
শিহরি উঠুক বন; মাথার উপরে
চকোর ডাকিয়া যাক দূরশ্রুত তান;
সম্মুখে পড়িয়া থাক্ তটান্তশয়ান
সুপ্ত নটিনীর মতো নিস্তব্ধ তটিনী
স্বপ্নালসা।

হেরো আজি নিদ্রিতা মেদিনী,
ঘরে ঘরে রুদ্ধ বাতায়ন। আমি একা
আছি জেগে, তুমি একাকিনী দেহো দেখা
এই বিশ্বসুপ্তি-মাঝে, অসীম সুন্দর,
ত্রিলোকনন্দনমূর্তি। আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষায়, আমি নিত্য নিদ্রাহীন,
সদা উৎকণ্ঠিত, আমি চিররাত্রিদিন
আনিতেছি অর্ঘ্যভার অন্তরমন্দিরে
অজ্ঞাত দেবতা লাগি— বাসনার তীরে
একা বসে গড়িতেছি কত যে প্রতিমা
আপন হৃদয় ভেঙে নাহি তার সীমা।
আজি মোরে করো দয়া, এসো তুমি অয়ি,
অপার রহস্য তব, হে রহস্যময়ী,
খুলে ফেলো— আজি ছিন্ন করে ফেলো ওই
চিরস্থির আচ্ছাদন অনন্ত অম্বর।
মৌনশান্ত অসীমতা নিশ্চল সাগর,
তারি মাঝখান হতে উঠে এসো ধীরে
তরুণী লক্ষ্মীর মতো হৃদয়ের তীরে
আঁখির সম্মুখে। সমস্ত প্রহরগুলি
ছিন্নপুষ্পদলসম পড়ে যাক খুলি
তব চারি দিকে— বিদীর্ণ নিশীথখানি

খসে যাক নীচে। বক্ষ হতে লহো টানি
অঞ্চল তোমার, দাও অবারিত করি
শুভ্র ভাল, আঁখি হতে লহো অপসরি
উন্মুক্ত অলক। কোনো মর্ত্য দেখে নাই
যে দিব্যমুরতি আমারে দেখাও তাই
এ বিশ্রব্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে।
উৎসুক উন্মুখ চিত্ত চরণের তলে
চকিতে পরশ করো ; একটি চুম্বন
ললাটে রাখিয়া যাও, একান্ত নির্জন
সন্ধ্যার তারার মতো ; আলিঙ্গনস্মৃতি
অঙ্গে তরঙ্গিয়া দাও, অনন্তের গীতি
বাজায়ে শিরার তন্ত্রে। ফাটুক হৃদয়
ভূমানন্দে, ব্যাপ্ত হয়ে যাক শূন্যময়
গানের তানের মতো। একরাত্রি -তরে,
হে অমরী, অমর করিয়া দাও মোরে।

তোমাদের বাসরকুঞ্জের বহির্দ্বারে
বসে আছি— কানে আসিতেছে বারে বারে
মৃদুমন্দ কথা, বাজিতেছে সুমধুর
রিনিঝিনি রুনুঝুনু সোনার নূপুর ;
কার কেশপাশ হতে খসি পুষ্পদল
পড়িছে আমার বক্ষে, করিছে চঞ্চল
চেতনাপ্রবাহ ! কোথায় গাহিছ গান !
তোমরা কাহারা মিলি করিতেছ পান
কিরণকনকপাত্রে সুগন্ধি অমৃত
মাথায় জড়ায়ে মালা পূর্ণবিকশিত
পারিজাত— গন্ধ তারি আসিছে ভাসিয়া
মন্দ সমীরণে, উন্মাদ করিছে হিয়া
অপূর্ব বিরহে ! খোলো দ্বার, খোলো দ্বার !
তোমাদের মাঝে মোরে লহো একবার
সৌন্দর্যসভায়। নন্দনবনের মাঝে
নির্জন মন্দিরখানি, সেথায় বিরাজে
একটি কুসুমশয্যা— রত্নদীপালোকে
একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে.
বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী বালা ;
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা।

৫/৬ মাঘ ১৩০০। রাত্রি

## এবার ফিরাও মোরে

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ন তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। ওরে, তুই ওঠ্ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা! কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে! কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল? কোন্ অন্ধ কারামাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়? স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া! বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার; সংকুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে! ওই-যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা; এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—
'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে;
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথকুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার;
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।'

কবি, তবে উঠে এসো— যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা— সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখো না বসায়ে আর। দিন যায়, সন্ধ্যা হয়ে আসে।
অন্ধকারে ঢাকে দিশি, নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে
নিশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন। বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে
জনতার মাঝখানে। কোথা যাও, পান্থ, কোথা যাও—
আমি নহি পরিচিত, মোর পানে ফিরিয়া তাকাও।
বলো মোরে নাম তব, আমারে কোরো না অবিশ্বাস।
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রিদিন ; তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নূতনতর, তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ
বক্ষে জ্বলে ক্ষুধানল— যেদিন জগতে চলে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি!
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা। সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীতে
কর্মহীন জীবনের এক প্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্তের তরে— দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি— তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ।

কী গাহিবে, কী শুনাবে! বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।
মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি— তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে-
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তরপ্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সংকট-আবর্ত-মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে;
সর্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোমহুতাশন—
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম-অর্ঘ্য-উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ। শুনিয়াছি তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়— গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে, অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্যপ্রতিমা। তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ;
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে। শুধু জানি, তাহারি মহান
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে,
তাহারি অঞ্চলপ্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে,

বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে!
মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
আনন্দে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা!
মৃত্যুরে করিনে ভয়! দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি! — কে সে? (জানি না কে) ভাল করে চিনি নাই তারে —
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
মানবেরা চলিয়াছে যুগ হতে যুগান্তর পানে
জ্বালায়ে অন্তর দীপ! শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীতি দিয়েছে সে বিশ্ব-বিসর্জন —
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত!

লেখা শেষ হল, কোথা কিন্তু আর, কবি বুঝে পারিনা

প্রীতি
২৩ ফাল্গুন
১৩০০
রামানুজ গোস্বামীর

চিত্রশালার মালীর হাতে পাঠানো গেল

তারি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্তিখানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জনমুখে। শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি—
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্কতিলক। তাহারে অন্তরে রাখি
জীবনকণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী
সুখে দুঃখে ধৈর্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,
প্রতিদিবসের কর্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি,
সুখী করি সর্বজনে। তার পরে দীর্ঘপথশেষে
জীবযাত্রা-অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে। প্রসন্নবদনে মন্দ হেসে
পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্তকণ্ঠে বরমাল্যখানি,
করপদ্মপরশনে শান্ত হবে সর্বদুঃখগ্লানি
সর্ব অমঙ্গল। লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে
ধৌত করি দিব পদ আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে।
সুচিরসঞ্চিত আশা সম্মুখে করিয়া উদ্‌ঘাটন
জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,
মাগিব অনন্ত ক্ষমা। হয়তো ঘুচিবে দুঃখনিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা।

রামপুর-বোয়ালিয়া। ২৩ ফাল্গুন ১৩০০

## ব্রাহ্মণ

ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৪ প্রপাঠক। ৪ অধ্যায়

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি আহরণ
বনান্তর হতে; ফিরায়ে এনেছে ডাকি
তপোবনগোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি
শ্রান্ত হোমধেনুগণে; করি সমাপন
সন্ধ্যাস্নান সবে মিলি লয়েছে আসন

গুরু গৌতমেরে ঘিরি কুটিরপ্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি-আলোকে। শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি ; নক্ষত্রমণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মতো। নিভৃত আশ্রম
উঠিল চকিত হয়ে ; মহর্ষি গৌতম
কহিলেন, 'বৎসগণ, ব্রহ্মবিদ্যা কহি,
করো অবধান।'

হেনকাল্যে অর্ঘ্য বহি
করপুট ভরি, পশিলা প্রাঙ্গণতলে
তরুণ বালক ; বন্দি ফলফুলদলে
ঋষির চরণপদ্ম, নমি ভক্তিভরে
কহিলা কোকিলকণ্ঠে সুধাস্নিগ্ধস্বরে,
'ভগবন্, ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষা-অভিলাষী
আসিয়াছি দীক্ষাতরে কুশক্ষেত্রবাসী,
সত্যকাম নাম মোর।' শুনি স্মিতহাসে
ব্রহ্মর্ষি কহিলা তারে স্নেহশান্ত ভাষে,
'কুশল হউক সৌম্য ! গোত্র কী তোমার ?
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।' বালক কহিলা ধীরে,
'ভগবন্, গোত্র নাহি জানি। জননীরে
শুধায়ে আসিব কল্য, করো অনুমতি।'
এত কহি ঋষিপদে করিয়া প্রণতি
গেলা চলি সত্যকাম ঘন-অন্ধকার
বনবীথি দিয়া, পদব্রজে হয়ে পার
ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী ; বালুতীরে
সুপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননীকুটিরে
করিলা প্রবেশ।

ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা ;
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি জননী জবালা
পুত্রপথ চাহি ; হেরি তারে বক্ষে টানি
আঘ্রাণ করিয়া শির কহিলেন বাণী
কল্যাণকুশল। শুধাইলা সত্যকাম,
'কহো গো জননী, মোর পিতার কী নাম—

কী বংশে জনম। গিয়াছিনু দীক্ষাতরে
গৌতমের কাছে, গুরু কহিলেন মোরে—
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে। মাতঃ, কী গোত্র আমার?'
শুনি কথা মৃদুকণ্ঠে অবনতমুখে
কহিলা জননী, 'যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি তাত!'

পরদিন
তপোবনতরুশিরে প্রসন্ন নবীন
জাগিল প্রভাত। যত তাপসবালক,
শিশিরসুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নবপুণ্যচ্ছটা,
প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্রসিক্তজটা,
শুচিশোভা সৌম্যমূর্তি সমুজ্জ্বলকায়ে
বসেছে বেষ্টন করি বৃদ্ধ বটচ্ছায়ে
গুরু গৌতমেরে। বিহঙ্গকাকলিগান,
মধুপগুঞ্জনগীতি, জলকলতান,
তারি সাথে উঠিতেছে গম্ভীর মধুর
বিচিত্র তরুণকণ্ঠে সম্মিলিত সুর
শান্তসামগীতি।

হেনকালে সত্যকাম
কাছে আসি ঋষিপদে করিলা প্রণাম;
মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে।
আচার্য আশিস করি শুধাইলা তবে,
'কী গোত্র তোমার সৌম্য, প্রিয়দরশন?'
তুলি শির কহিলা বালক, 'ভগবন্,
নাহি জানি কী গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে; কহিলেন তিনি, সত্যকাম,
বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি।'

শুনি সে বারতা
ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা,
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মতো। সবে বিস্ময়বিকল—
কেহ বা হাসিল কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্যের হেরি অহংকার।

উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি ; বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন, 'অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত—
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত!'

[শিলাইদহ] ৭ ফাল্গুন ১৩০১

## আবেদন

ভৃত্য। জয় হোক মহারানী, রাজরাজেশ্বরী,
দীন ভৃত্যে করো দয়া।

রানী। সভা ভঙ্গ করি
সকলেই গেল চলি যথাযোগ্য কাজে
আমার সেবকবৃন্দ বিশ্বরাজ্য-মাঝে,
মোর আজ্ঞা মোর মান লয়ে শীর্ষদেশে
জয়শঙ্খ সগর্বে বাজায়ে। সভাশেষে
তুমি এলে নিশান্তের শশাঙ্ক-সমান
ভক্ত ভৃত্য মোর। কী প্রার্থনা?

ভৃত্য। মোর স্থান
সর্বশেষে, আমি তব সর্বাধম দাস
মহোত্তমে। একে একে পরিতৃপ্ত-আশ
সবাই আনন্দে যবে ঘরে ফিরে যায়
সেইক্ষণে আমি আসি নির্জন সভায়,
একাকী আসীনা তব চরণতলের
প্রান্তে বসে ভিক্ষা মাগি শুধু সকলের
সর্ব-অবশেষটুকু।

রানী। অবোধ ভিক্ষুক,
অসময়ে কী তোরে মিলিবে?

ভৃত্য। হাসিমুখ
দেখে চলে যাব। আছে দেবী, আরো আছে—
নানা কর্ম নানা পদ নিল তোর কাছে
নানা জনে, এক কর্ম কেহ চাহে নাই,
ভৃত্য-'পরে দয়া করে দেহো মোরে তাই—
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

রানী। মালাকর?

ভৃত্য। ক্ষুদ্র মালাকর। অবসর
লব সব কাজে। যুদ্ধ-অস্ত্র ধনুঃশর
ফেলিনু ভূতলে, এ উষ্ণীষ রাজসাজ
রাখিনু চরণে তব— যত উচ্চকাজ
সব ফিরে লও দেবী! তব দূত করি
মোরে আর পাঠায়ো না, তব স্বর্ণতরী
দেশে দেশান্তরে লয়ে; জয়ধ্বজা তব
দিগ্‌দিগন্তে করিয়া প্রচার, নব নব
দিগ্বিজয়ে পাঠায়ো না মোরে। পরপারে
তব রাজ্য কর্মযশধনজনভারে
অসীমবিস্তৃত; কত নগর নগরী,
কত লোকালয়, বন্দরেতে কত তরী,
বিপণিতে কত পণ্য! ওই দেখো দূরে
মন্দিরশিখরে আর কত হর্ম্যচূড়ে
দিগন্তেরে করিছে দংশন, কলোচ্ছ্বাস
শ্বসিয়া উঠেছে শূন্যে করিবারে গ্রাস
নক্ষত্রের নিত্যনীরবতা। বহু ভৃত্য
আছে হোথা, বহু সৈন্য তব; জাগে নিত্য
কতই প্রহরী! এ পারে নির্জন তীরে
একাকী উঠেছে ঊর্ধ্বে উচ্চ গিরিশিরে
রঞ্জিত মেঘের মাঝে তুষারধবল
তোমার প্রাসাদসৌধ, অনিন্দ্য-নির্মল
চন্দ্রকান্তমণিময়। বিজনে বিরলে
হেথা তব দক্ষিণের বাতায়নতলে
মঞ্জরিত ইন্দুমল্লী-বল্লরী-বিতানে,
ঘনচ্ছায়ে, নিভৃত কপোতকলগানে
একান্তে কাটিবে বেলা; স্ফটিকপ্রাঙ্গণে
জলযন্ত্রে উৎসধারা কল্লোলক্রন্দনে
উচ্ছ্বসিবে দীর্ঘদিন ছল ছল ছল—

মধ্যাহ্নেরে করি দিবে বেদনাবিহ্বল
করুণাকাতর। অদূরে অলিন্দ-'পরে
পুঞ্জ পুচ্ছ বিস্ফারিয়া স্ফীত গর্বভরে
নাচিবে ভবনশিখী ; রাজহংসদল
চরিবে শৈবালবনে করি কোলাহল
বাঁকায়ে ধবল গ্রীবা ; পাটলা হরিণী
ফিরিবে শ্যামল ছায়ে। অয়ি একাকিনী,
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

রানী। ওরে তুই কর্মভীরু অলস কিংকর,
কী কাজে লাগিবি ?

ভৃত্য। অকাজের কাজ যত,
আলস্যের সহস্র সঞ্চয়। শত শত
আনন্দের আয়োজন। যে অরণ্যপথে
কর তুমি সঞ্চরণ বসন্তে শরতে
প্রত্যুষে অরুণোদয়ে, শ্লথ অঙ্গ হতে
তপ্ত নিদ্রালসখানি স্নিগ্ধ বায়ুস্রোতে
করি দিয়া বিসর্জন, সে বনবীথিকা
রাখিব নবীন করি। পুষ্পাক্ষরে লিখা
তব চরণের স্তুতি প্রত্যহ উষায়
বিকশি উঠিবে তব পরশতৃষায়
পুলকিত তৃণপুঞ্জতলে। সন্ধ্যাকালে
যে মঞ্জু মালিকাখানি জড়াইবে ভালে
কবরী বেষ্টন করি— আমি নিজ করে
রচি সে বিচিত্র মালা সান্ধ্যযূথীস্তরে,
সাজায়ে সুবর্ণ-পাত্রে, তোমার সম্মুখে
নিঃশব্দে ধরিব আসি অবনতমুখে—
যেথায় নিভৃত কক্ষে ঘন কেশপাশ
তিমিরনির্ঝরসম উন্মুক্ত-উচ্ছ্বাস
তরঙ্গকুটিল,এলাইয়া পৃষ্ঠ-'পরে,
কনকমুকুর অঙ্কে, শুভ্র পদ্মকরে
বিনাইবে বেণী। কুমুদসরসীকূলে
বসিবে যখন সপ্তপর্ণতরুমূলে
মালতীদোলায়, পত্রচ্ছেদ-অবকাশে
পড়িবে ললাটে চক্ষে বক্ষে বেশবাসে
কৌতূহলী চন্দ্রমার সহস্র চুম্বন,
আনন্দিত তনুখানি করিয়া বেষ্টন

উঠিবে বনের গন্ধ বাসনাবিভোল
নিশ্বাসের প্রায়— মৃদুছন্দে দিব দোল
মৃদুমন্দ সমীরের মতো। অনিমেষে
যে প্রদীপ জ্বলে তব শয্যাশিরোদেশে
সারা সুপ্তনিশি সুরনরস্বপ্নাতীত
নিদ্রিত শ্রীঅঙ্গ -পানে স্থির অকম্পিত
নিদ্রাহীন আঁখি মেলে, সে প্রদীপখানি
আমি জ্বালাইয়া দিব গন্ধতৈল আনি।
শেফালির বৃন্ত দিয়া রাঙাইব রানী,
বসন বাসন্তী রঙে ; পাদপীঠখানি
নব ভাবে নব রূপে শুভ আলিম্পনে
প্রত্যহ রাখিব অঙ্কি কুঙ্কুমে চন্দনে
কল্পনার লেখা। নিকুঞ্জের অনুচর,
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

রানী। কী লইবে পুরস্কার ?

ভৃত্য। প্রত্যহ প্রভাতে
ফুলের কঙ্কণ গড়ি কমলের পাতে
আনিব যখন, পদ্মের কলিকাসম
ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি করে ধরি মম
আপনি পরায়ে দিব, এই পুরস্কার।
অশোকের কিশলয়ে গাঁথি দিব হার
প্রতি সন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্তে
চিত্রি পদতল চরণ-অঙ্গুলি-প্রান্তে
লেশমাত্র রেণু চুম্বিয়া মুছিয়া লব,
এই পুরস্কার।

রানী। ভৃত্য, আবেদন তব
করিনু গ্রহণ। আছে মোর বহু মন্ত্রী,
বহু সৈন্য, বহু সেনাপতি, বহু যন্ত্রী
কর্মযন্ত্রে রত— তুই থাক্ চিরদিন
স্বেচ্ছাবন্দী দাস, খ্যাতিহীন, কর্মহীন।
রাজসভা-বহিঃপ্রান্তে রবে তোর ঘর,
তুই মোর মালঞ্চের হবি মালাকর।

[বোট। শিলাইদহ অভিমুখে]
২২ অগ্রহায়ণ ১৩০২

## উর্বশী

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী!
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি,
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।
উষার উদয় -সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা।

বৃন্তহীন পুষ্প -সম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী!
আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে ;
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা,
তুমি অনিন্দিতা।

কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকাবয়সী,
হে অনন্তযৌবনা উর্বশী!
আঁধার পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মানিক মুকুতা লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা!
মণিদীপদীপ্ত কক্ষে সমুদ্রের কল্লোলসংগীতে
অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবালপালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে!
যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে-গঠিতা,
পূর্ণপ্রস্ফুটিতা।

যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী,
হে অপূর্বশোভনা উর্বশী!
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,

তোমার মদির গন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারি ভিতে,
মধুমত্তভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধচিতে
উদ্দাম সংগীতে।
নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা।

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি,
হে বিলোলহিল্লোল উর্বশী,
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা—
নাচে রক্তধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে।

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্বশী!
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণশোণিমা ;
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার—
অখিল মানসস্বর্গে অনন্তরঙ্গিণী,
হে স্বপ্নসঙ্গিনী।

ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী,
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্বশী!
আদিযুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর—
অতল অকূল হতে সিক্তকেশে উঠিবে আবার ?
প্রথম সে তনুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে,
সর্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের নয়ন-আঘাতে
বারিবিন্দুপাতে!
অকস্মাৎ মহাম্বুধি অপূর্ব সংগীতে
রবে তরঙ্গিতে।

ফিরিবে না, ফিরিবে না— অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী!
তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে,
পূর্ণিমানিশীথে যবে দশ দিকে পরিপূর্ণ হাসি
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি—
ঝরে অশ্রুরাশি।
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে
অয়ি অবন্ধনে।

[বোট। শিলাইদহ অভিমুখে]
২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২

## স্বর্গ হইতে বিদায়

ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দারমালিকা,
হে মহেন্দ্র, নির্বাপিত জ্যোতির্ময় টিকা
মলিন ললাটে। পুণ্যবল হল ক্ষীণ,
আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন,
হে দেব, হে দেবীগণ! বর্ষ লক্ষশত
যাপন করেছি হর্ষে দেবতার মতো
দেবলোকে। আজি শেষ বিচ্ছেদের ক্ষণে
লেশমাত্র অশ্রুরেখা স্বর্গের নয়নে
দেখে যাব এই আশা ছিল। শোকহীন
হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি, উদাসীন
চেয়ে আছে। লক্ষ লক্ষ বর্ষ তার
চক্ষের পলক নহে; অশ্বত্থশাখার
প্রান্ত হতে খসি গেলে জীর্ণতম পাতা
যতটুকু বাজে তার, ততটুকু ব্যথা
স্বর্গে নাহি লাগে, যবে মোরা শত শত
গৃহচ্যুত হতজ্যোতি নক্ষত্রের মতো
মুহূর্তে খসিয়া পড়ি দেবলোক হতে
ধরিত্রীর অন্তহীন জন্মমৃত্যুস্রোতে।
সে বেদনা বাজিত যদ্যপি, বিরহের
ছায়ারেখা দিত দেখা, তবে স্বরগের

চিরজ্যোতি ম্লান হত মর্ত্যের মতন
কোমল শিশিরবাষ্পে ; নন্দনকানন
মর্মরিয়া উঠিত নিশ্বসি ; মন্দাকিনী
কূলে কূলে গেয়ে যেত করুণ কাহিনী
কলকণ্ঠে ; সন্ধ্যা আসি দিবা-অবসানে
নির্জনপ্রান্তরপারে দিগন্তের পানে
চলে যেত উদাসিনী ; নিস্তব্ধ নিশীথ
ঝিল্লিমন্ত্রে শুনাইত বৈরাগ্যসংগীত
নক্ষত্রসভায়। মাঝে মাঝে সুরপুরে
নৃত্যপরা মেনকার কনকনূপুরে
তালভঙ্গ হত। হেলি উর্বশীর স্তনে
স্বর্ণবীণা থেকে থেকে যেন অন্যমনে
অকস্মাৎ ঝংকারিত কঠিন পীড়নে
নিদারুণ করুণ মূর্ছনা। দিত দেখা
দেবতার অশ্রুহীন চোখে জলরেখা
নিষ্কারণে। পতিপাশে বসি একাসনে
সহসা চাহিত শচী ইন্দ্রের নয়নে
যেন খুঁজি পিপাসার বারি। ধরা হতে
মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসি আসিত বায়ুস্রোতে
ধরণীর সুদীর্ঘ নিশ্বাস— খসি ঝরি
পড়িত নন্দনবনে কুসুমমঞ্জরী।

থাকো স্বর্গ হাস্যমুখে ; করো সুধাপান
দেবগণ। স্বর্গ তোমাদেরই সুখস্থান—
মোরা পরবাসী। মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি— তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দু দিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দু দণ্ডের তরে।
যত ক্ষুদ্র, যত ক্ষীণ, যত অভাজন,
যত পাপীতাপী, মেলি ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমল বক্ষে বাঁধিবারে চায়—
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্যে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্তমিশ্রিত
প্রেমধারা— অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।

হে অপ্সরী,
তোমার নয়নজ্যোতি প্রেমবেদনায়
কভু না হউক ম্লান— লইনু বিদায়।
তুমি কারে কর না প্রার্থনা ; কারো তরে
নাহি শোক। ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোনো-এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটিরে
অশ্বত্থছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হলে
জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্যগণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নতনয়নে,
চন্দনচর্চিতভালে, রক্তপট্টাম্বরে,
উৎসবের বাঁশরিসংগীতে। তার পরে
সুদিনে দুর্দিনে, কল্যাণকঙ্কণ করে,
সীমন্তসীমায় মঙ্গলসিন্দূরবিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্রশিয়রে। দেবগণ,
মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূরস্বপ্নসম— যবে কোনো অর্ধরাতে
সহসা হেরিব জাগি নির্মল শয্যাতে
পড়েছে চন্দ্রের আলো, নিদ্রিতা প্রেয়সী,
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি
গ্রন্থি শরমের ; মৃদু সোহাগচুম্বনে
সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর ; দক্ষিণ অনিল
আনিবে ফুলের গন্ধ, জাগ্রত কোকিল
গাহিবে সুদূর শাখে।

অয়ি দীনহীনা,
অশ্রু-আঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা,

অয়ি মর্ত্যভূমি, আজি বহুদিন পরে
কাঁদিয়া উঠেছে মোর চিত্ত তোর তরে।
যেমনি বিদায়দুঃখে শুষ্ক দুই চোখ
অশ্রুতে পুরিল, অমনি এ স্বর্গলোক
অলসকল্পনাপ্রায় কোথায় মিলাল
ছায়াচ্ছবি। তব নীলাকাশ, তব আলো,
তব জনপূর্ণ লোকালয়, সিন্ধুতীরে
সুদীর্ঘ বালুকাতট, নীল গিরিশিরে
শুভ্র হিমরেখা, তরুশ্রেণীর মাঝারে
নিঃশব্দ অরুণোদয়, শূন্য নদীপারে
অবনতমুখী সন্ধ্যা— বিন্দু-অশ্রুজলে
যত প্রতিবিম্ব যেন দর্পণের তলে
পড়েছে আসিয়া।

হে জননী পুত্রহারা,
শেষ বিচ্ছেদের দিনে যে শোকাশ্রুধারা
চক্ষু হতে ঝরি পড়ি তব মাতৃস্তন
করেছিল অভিষিক্ত, আজি এতক্ষণ
সে অশ্রু শুকায়ে গেছে। তবু জানি মনে,
যখনি ফিরিব পুন তব নিকেতনে
তখনি দুখানি বাহু ধরিবে আমায়,
বাজিবে মঙ্গলশঙ্খ; স্নেহের ছায়ায়
দুঃখে-সুখে-ভয়ে-ভরা প্রেমের সংসারে
তব গেহে, তব পুত্রকন্যার মাঝারে
আমারে লইবে চির-পরিচিত-সম—
তার পরদিন হতে শিয়রেতে মম
সারাক্ষণ জাগি রবে কম্পমান প্রাণে,
শঙ্কিত অন্তরে, ঊর্ধ্বে দেবতার পানে
মেলিয়া করুণ দৃষ্টি, চিন্তিত সদাই
'যাহারে পেয়েছি তারে কখন হারাই'।

[শিলাইদহ]
২৪ অগ্রহায়ণ ১৩০২

## দিনশেষে

দিনশেষ হয়ে এল, আঁধারিল ধরণী,
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
'হাঁগো এ কাদের দেশে
বিদেশী নামিনু এসে'
তাহারে শুধানু হেসে যেমনি—
অমনি কথা না বলি
ভরা ঘট ছলছলি
নতমুখে গেল চলি তরুণী।
এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী।

নামিছে নীরব ছায়া ঘনবনশয়নে,
এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে।
স্থির জলে নাহি সাড়া,
পাতাগুলি গতিহারা,
পাখি যত ঘুমে সারা কাননে—
শুধু এ সোনার সাঁঝে
বিজনে পথের মাঝে
কলস কাঁদিয়া বাজে কাঁকনে।
এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে

ঝলিছে মেঘের আলো কনকের ত্রিশূলে,
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।
শ্বেত পাথরেতে গড়া
পথখানি ছায়া-করা
ছেয়ে গেছে ঝরে-পড়া বকুলে।
সারি সারি নিকেতন,
বেড়া-দেওয়া উপবন,
দেখে পথিকের মন আকুলে।
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।

রাজার প্রাসাদ হতে অতিদূর বাতাসে
ভাসিছে পূরবীগীতি আকাশে।
ধরণী সমুখপানে
চলে গেছে কোন্‌খানে,
পরান কেন কে জানে উদাসে।

ভালো নাহি লাগে আর
আসা-যাওয়া বার বার
বহুদূর দুরাশার প্রবাসে।
পূরবী রাগিণী বাজে আকাশে।

কাননে প্রাসাদচূড়ে নেমে আসে রজনী,
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
যদি কোথা খুঁজে পাই
মাথা রাখিবার ঠাঁই
বেচাকেনা ফেলে যাই এখনি—
যেখানে পথের বাঁকে
গেল চলি নত আঁখে
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে তরুণী।
এই ঘাটে বাঁধো মোর তরণী।

[শিলাইদহ]
২৮ অগ্রহায়ণ ১৩০২

## বিজয়িনী

অচ্ছোদসরসীনীরে রমণী যেদিন
নামিলা স্নানের তরে, বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মতো কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি শিহরি। সমীরণ
প্রলাপ বকিতেছিল প্রচ্ছায়সঘন
পল্লবশয়নতলে ; মধ্যাহ্নের জ্যোতি
মূর্ছিত বনের কোলে ; কপোতদম্পতি
বসি শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘন চঞ্চুচুম্বনের অবসরকালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন।

তীরে শ্বেতশিলাতলে সুনীল বসন
লুটাইছে এক প্রান্তে স্খলিতগৌরব
অনাদৃত ; শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ

এখনো জড়িত তাহে, আয়ুপরিশেষ
মূর্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ—
লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে ; নূপুর রয়েছে পড়ি ;
বক্ষের নিচোলবাস যায় গড়াগড়ি
ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।
কনকদর্পণখানি চাহে শূন্যপানে
কার মুখ স্মরি। স্বর্ণপাত্রে সুসজ্জিত
চন্দনকুঙ্কুমপঙ্ক, লুণ্ঠিত লজ্জিত
দুটি রক্ত শতদল, অম্লানসুন্দর
শ্বেতকরবীর মালা ; ধৌত শুক্লাম্বর
লঘুস্বচ্ছ, পূর্ণিমার আকাশের মতো।
পরিপূর্ণ নীল নীর স্থির অনাহত—
কূলে কূলে প্রসারিত বিহ্বল গভীর
বুকভরা আলিঙ্গনরাশি। সরসীর
প্রান্তদেশে বকুলের ঘনচ্ছায়াতলে
শ্বেত শিলাপটে, আবক্ষ ডুবায়ে জলে
বসিয়া সুন্দরী, কম্পমান ছায়াখানি
প্রসারিয়া স্বচ্ছ নীরে, বক্ষে লয়ে টানি
সযত্নপালিত শুভ্র রাজহংসীটিরে
করিছে সোহাগ ; নগ্ন বাহুপাশে ঘিরে
সুকোমল ডানা দুটি, লম্ব গ্রীবা তার
রাখি স্কন্ধ-'পরে, কহিতেছে বারংবার
স্নেহের প্রলাপবাণী ; কোমল কপোল
বুলাইছে হংসপৃষ্ঠে পরশবিভোল।

চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিণী
জলে স্থলে নভস্তলে ; সুন্দর কাহিনী
কে যেন রচিতেছিল ছায়ারৌদ্রকরে,
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্মরে,
বসন্তদিনের কত স্পন্দনে কম্পনে
নিশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাসে আভাসে গুঞ্জনে
চমকে ঝলকে। যেন আকাশবীণার
রবিরশ্মিতন্ত্রীগুলি সুরবালিকার
চম্পক-অঙ্গুলি-ঘাতে সংগীতঝংকারে
কাঁদিয়া উঠিতেছিল, মৌন স্তব্ধতারে

বেদনায় পীড়িয়া মূর্ছিয়া। তরুতলে
স্খলিয়া পড়িতেছিল নিঃশব্দে বিরলে
বিবশ বকুলগুলি ; কোকিল কেবলি
অশ্রান্ত গাহিতেছিল ; বিফল কাকলি
কাঁদিয়া ফিরিতেছিল বনান্তর ঘুরে
উদাসিনী প্রতিধ্বনি ; ছায়ায় অদূরে
সরোবরপ্রান্তদেশে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী
কলনৃত্যে বাজাইয়া মাণিক্যকিঙ্কিণী
কল্লোলে মিশিতেছিল ; তৃণাঞ্চিত তীরে
জলকলকলস্বরে মধ্যাহ্নসমীরে
সারস ঘুমায়ে ছিল দীর্ঘ গ্রীবাখানি
ভঙ্গিভরে বাঁকাইয়া পৃষ্ঠে লয়ে টানি
ধূসর ডানার মাঝে ; রাজহংসদল
আকাশে বলাকা বাঁধি সত্বরচঞ্চল
ত্যজি কোন্ দূরনদীসৈকতবিহার
উড়িয়া চলিতেছিল গলিতনীহার
কৈলাসের পানে। বহু বনগন্ধ ব'হে
অকস্মাৎ শ্রান্ত বায়ু উত্তপ্ত আগ্রহে
লুটায়ে পড়িতেছিল সুদীর্ঘ নিশ্বাসে
মুগ্ধ সরসীর বক্ষে স্নিগ্ধ বাহুপাশে।

মদন, বসন্তসখা, ব্যগ্র কৌতূহলে
লুকায়ে বসিয়া ছিল বকুলের তলে
পুষ্পাসনে, হেলায় হেলিয়া তরু-'পরে,
প্রসারিয়া পদযুগ নব তৃণস্তরে।
পীত উত্তরীয়প্রান্ত লুণ্ঠিত ভূতলে,
গ্রন্থিত মালতীমালা কুঞ্চিত কুন্তলে
গৌর কণ্ঠতটে— সহাস্য কটাক্ষ করি
কৌতুকে হেরিতেছিল মোহিনী সুন্দরী
তরুণীর স্নানলীলা। অধীর চঞ্চল
উৎসুক অঙ্গুলি তার নির্মল কোমল
বক্ষস্থল লক্ষ্য করি লয়ে পুষ্পশর
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর।
গুঞ্জরি ফিরিতেছিল লক্ষ মধুকর
ফুলে ফুলে ; ছায়াতলে সুপ্ত হরিণীরে
ক্ষণে ক্ষণে লেহন করিতেছিল ধীরে

বিমুগ্ধনয়ন মৃগ ; বসন্তপরশে
পূর্ণ ছিল বনচ্ছায়া আলসে লালসে।
জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে ; তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র— ললাটে, অধরে,
উরু-'পরে, কটিতটে, স্তনাগ্রচূড়ায়,
বাহুযুগে, সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে। ঘিরি তার চারি পাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্বাঙ্গ চুম্বিল তার ; সেবকের মতো
সিক্ত তনু মুছি নিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে ; ছায়াখানি রক্ত পদতলে
চ্যুত বসনের মতো রহিল পড়িয়া—
অরণ্য রহিল স্তব্ধ বিস্ময়ে মরিয়া।

ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি
উঠিল অনঙ্গদেব।
সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকালতরে। পরক্ষণে ভূমি-'পরে
জানু পাতি বসি নির্বাক্ বিস্ময়ভরে
নতশিরে পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদন-পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

১ মাঘ ১৩০২

## দুরাকাঙ্ক্ষা

কেন নিবে গেল বাতি ?
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে
জাগিয়া বাসররাতি,
তাই নিবে গেল বাতি।

কেন ঝরে গেল ফুল ?
আমি বক্ষে চাপিয়া ধরেছিনু তারে
চিন্তিত ভয়াকুল,
তাই ঝরে গেল ফুল।

কেন মরে গেল নদী ?
আমি বাঁধ বাঁধি তারে চাহি ধরিবারে
পাইবারে নিরবধি,
তাই মরে গেল নদী।

কেন ছিঁড়ে গেল তার ?
আমি অধিক আবেগে প্রাণপণ বলে
দিয়েছিনু ঝংকার,
তাই ছিঁড়ে গেল তার।

৪ ফাল্গুন ১৩০২

## সিন্ধুপারে

পউষ প্রখর শীতে জর্জর, ঝিল্লিমুখর রাতি ;
নিদ্রিত পুরী, নির্জন ঘর, নির্বাণদীপ বাতি।
অকাতর দেহে আছিনু মগন সুখনিদ্রার ঘোরে ;
তপ্ত শয্যা প্রিয়ার মতন সোহাগে ঘিরেছে মোরে।
হেনকালে হায় বাহির হইতে কে ডাকিল মোর নাম ;
নিদ্রা টুটিয়া সহসা চকিতে চমকিয়া বসিলাম।
তীক্ষ্ণ শাণিত তীরের মতন মর্মে বাজিল স্বর ;
ঘর্ম বহিল ললাট বাহিয়া, রোমাঞ্চকলেবর !

ফেলি আবরণ, ত্যজিয়া শয়ন, বিরলবসন বেশে
দুরুদুরু বুকে খুলিয়া দুয়ার বাহিরে দাঁড়ানু এসে।
দূর নদীপারে শূন্য শ্মশানে শৃগাল উঠিল ডাকি ;
মাথার উপরে কেঁদে উড়ে গেল কোন্ নিশাচর পাখি।
দেখিনু দুয়ারে রমণীমুরতি অবগুণ্ঠনে-ঢাকা—
কৃষ্ণ অশ্বে বসিয়া রয়েছে, চিত্রে যেন সে আঁকা।
আরেক অশ্ব দাঁড়ায়ে রয়েছে— পুচ্ছ ভূতল চুমে,
ধূম্রবরন, যেন দেহ তার গঠিত শ্মশানধূমে।
নড়িল না কিছু, আমারে কেবল হেরিল আঁখির পাশে—
শিহরি শিহরি সর্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল ত্রাসে।
পাণ্ডু আকাশে খণ্ডচন্দ্র হিমানীর গ্লানি মাখা,
পল্লবহীন বৃদ্ধ অশথ শিহরে নগ্নশাখা।
নীরবে রমণী অঙ্গুলি তুলি দিল ইঙ্গিত করি—
মন্ত্রমুগ্ধ অচেতন-সম চড়িনু অশ্ব-'পরি।

বিদ্যুৎবেগে ছুটে যায় ঘোড়া ; বারেক চাহিনু পিছে—
ঘর দ্বার মোর বাষ্পসমান, মনে হল সব মিছে।
কাতর রোদন জাগিয়া উঠিল সকল হৃদয় ব্যেপে,
কণ্ঠের কাছে সুকঠিন বলে কে তারে ধরিল চেপে।
পথের দু ধারে রুদ্ধদুয়ারে দাঁড়ায়ে সৌধসারি,
ঘরে ঘরে হায় সুখশয্যায় ঘুমাইছে নরনারী।
নির্জন পথ চিত্রিতবৎ, সাড়া নাই সারা দেশে—
রাজার দুয়ারে দুইটি প্রহরী ঢুলিছে নিদ্রাবেশে।
শুধু থেকে থেকে ডাকিছে কুকুর সুদূর পথের মাঝে,
গম্ভীর স্বরে প্রাসাদশিখরে প্রহরঘণ্টা বাজে।

অফুরান পথ, অফুরান রাতি, অজানা নূতন ঠাঁই—
অপরূপ এক স্বপ্নসমান, অর্থ কিছুই নাই !
কী যে দেখেছিনু মনে নাহি পড়ে, ছিল নাকো আগাগোড়া—
লক্ষ্যবিহীন তীরের মতন ছুটিয়া চলেছে ঘোড়া।
চরণে তাদের শব্দ বাজে না, উড়ে নাকো ধূলিরেখা—
কঠিন ভূতল নাই যেন কোথা, সকলি বাষ্পে লেখা।
মাঝে মাঝে যেন চেনা-চেনা-মতো মনে হয় থেকে থেকে—
নিমেষ ফেলিতে দেখিতে না পাই ; কোথা পথ যায় বেঁকে !
মনে হল মেঘ, মনে হল পাখি, মনে হল কিশলয়—
ভালো করে যেই দেখিবারে যাই মনে হল কিছু নয়।

দুই ধারে এ কি প্রাসাদের সারি ? অথবা তরুর মূল ?
অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারই মনের ভুল ?
মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি রমণীর অবগুণ্ঠিত মুখে—
নীরব নিদয় বসিয়া রয়েছে, প্রাণ কেঁপে ওঠে বুকে।
ভয়ে ভুলে যাই দেবতার নাম, মুখে কথা নাহি ফুটে—
হুহু রবে বায়ু বাজে দুই কানে, ঘোড়া চলে যায় ছুটে।

চন্দ্র যখন অস্তে নামিল তখনো রয়েছে রাতি,
পূর্ব দিকের অলস নয়নে মেলিছে রক্ত ভাতি।
জনহীন এক সিন্ধুপুলিনে অশ্ব থামিল আসি,
সমুখে দাঁড়ায়ে কৃষ্ণশৈল গুহামুখ পরকাশি।
সাগরে না শুনি জলকলরব, না গাহে উষার পাখি—
বহিল না মৃদু প্রভাতপবন বনের গন্ধ মাখি।
অশ্ব হইতে নামিল রমণী, আমিও নামিনু নীচে—
আঁধারব্যাদান গুহার মাঝারে চলিনু তাহার পিছে।
ভিতরে ক্ষোদিত উদারপ্রাসাদ শিলাস্তম্ভ-'পরে,
কনকশিকলে সোনার প্রদীপ দুলিতেছে থরে থরে।
ভিত্তির গায়ে পাষাণমূর্তি চিত্রিত আছে কত—
অপরূপ পাখি, অপরূপ নারী, লতাপাতা নানা-মতো।
মাঝখানে আছে চাঁদোয়া খাটানো, মুক্তা ঝালরে গাঁথা—
তারি তলে মণিপালঙ্ক-'পরে অমল শয়ন পাতা,
তারি দুই ধারে ধূপাধার হতে উঠিছে গন্ধধূপ,
সিংহবাহিনী নারীর প্রতিমা দুই পাশে অপরূপ।
নাহি কোনো লোক, নাহিকো প্রহরী, নাহি হেরি দাসদাসী।
গুহাগৃহতলে তিলেক শব্দ হয়ে উঠে রাশি রাশি।
নীরবে রমণী আবৃত বদনে বসিলা শয্যা-'পরে—
অঙ্গুলি তুলি ইঙ্গিত করি পাশে বসাইল মোরে।
হিম হয়ে এল সর্বশরীর, শিহরি উঠিল প্রাণ—
শোণিতপ্রবাহে ধ্বনিতে লাগিল ভয়ের ভীষণ তান।

সহসা বাজিয়া বাজিয়া উঠিল দশ দিকে বীণাবেণু,
মাথার উপরে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িল পুষ্পরেণু।
দ্বিগুণ আভায় জ্বলিয়া উঠিল দীপের আলোকরাশি,
ঘোমটা-ভিতরে হাসিল রমণী মধুর উচ্চহাসি।
সে হাসি ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া উঠিল বিজন বিপুল ঘরে,
শুনিয়া চমকি ব্যাকুল হৃদয়ে কহিলাম জোড়করে—

'আমি যে বিদেশী অতিথি আমায় ব্যথিয়ো না পরিহাসে।
কে তুমি নিদয় নীরব ললনা, কোথায় আনিলে দাসে!'

অমনি রমণী কনকদণ্ড আঘাত করিল ভূমে,
আঁধার হইয়া গেল সে ভবন রাশি রাশি ধূপধূমে।
বাজিয়া উঠিল শতেক শঙ্খ হুলুকলরব-সাথে—
প্রবেশ করিল বৃদ্ধ বিপ্র ধান্যদূর্বা হাতে।
পশ্চাতে তার বাঁধি দুই সার কিরাতনারীর দল
কেহ বহে মালা, কেহ-বা চামর, কেহ-বা তীর্থজল।
নীরবে সকলে দাঁড়ায়ে রহিল, বৃদ্ধ আসনে বসি
নীরবে গণনা করিতে লাগিল গৃহতলে খড়ি কষি।

আঁকিতে লাগিল কত-না চক্র, কত-না রেখার জাল—
গণনার শেষে কহিল, 'এখন হয়েছে লগ্নকাল।'
শয়ন ছাড়িয়া উঠিলা রমণী বদন করিয়া নত,
আমিও উঠিয়া দাঁড়াইনু পাশে মন্ত্রচালিত-মতো।
নারীগণ সবে ঘেরিয়া দাঁড়াল, একটি কথা না বলি
দোঁহাকার মাথে ফুলদল-সাথে বরষি লাজাঞ্জলি।
পুরোহিত শুধু মন্ত্র পড়িল আশিস করিয়া দোঁহে—
কী ভাষা, কী কথা, কিছু না বুঝিনু; দাঁড়ায়ে রহিনু মোহে।
অজানিত বধূ নীরবে সঁপিল শিহরিয়া কলেবর
হিমের মতন মোর করে তার তপ্ত কোমল কর।
চলি গেল ধীরে বৃদ্ধ বিপ্র, পশ্চাতে বাঁধি সার
গেল নারীদল মাথায় কক্ষে মঙ্গল-উপচার।
শুধু এক সখী দেখাইল পথ হাতে লয়ে দীপখানি,
মোরা দোঁহে পিছে চলিনু তাহার— কারো মুখে নাহি বাণী।
কত-না দীর্ঘ আঁধার কক্ষ সভয়ে হইয়া পার
সহসা দেখিনু সমুখে কোথায় খুলে গেল এক দ্বার।
কী দেখিনু ঘরে কেমনে কহিব, হয়ে যায় মনোভুল—
নানা বরনের আলোক সেথায় নানা বরনের ফুল,
কনকে রজতে রতনে জড়িত বসন বিছানো কত—
মণিবেদিকায় কুসুমশয়ন স্বপ্নরচিত-মতো।
পাদপীঠ-'পরে চরণ প্রসারি শয়নে বসিলা বধূ—
আমি কহিলাম, 'সব দেখিলাম, তোমারে দেখি নি শুধু।'

চারি দিক হতে বাজিয়া উঠিল শত কৌতুকহাসি,
শত ফোয়ারায় উছসিল যেন পরিহাস রাশি রাশি।

সুধীরে রমণী দু-বাহু তুলিয়া অবগুণ্ঠনখানি
উঠায়ে ধরিয়া মধুর হাসিল মুখে না কহিয়া বাণী।
চকিত নয়ানে হেরি মুখপানে পড়িনু চরণতলে—
'এখানেও তুমি জীবনদেবতা!' কহিনু নয়নজলে।
সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি, সেই সুধাভরা আঁখি—
চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি।
খেলা করিয়াছে নিশিদিন মোর সব সুখে সব দুখে,
এ অজানাপুরে দেখা দিল পুন সেই পরিচিত মুখে!
অমল কোমল চরণকমলে চুমিনু বেদনাভরে—
বাধা না মানিয়া ব্যাকুল অশ্রু পড়িতে লাগিল ঝরে।
অপরূপ তানে ব্যথা দিয়ে প্রাণে বাজিতে লাগিল বাঁশি,
বিজন বিপুল ভবনে রমণী হাসিতে লাগিল হাসি।

জোড়াসাঁকো
২০ ফাল্গুন ১৩০২

## তত্ত্বজ্ঞানহীন

যার খুশি রুদ্ধচক্ষে করো বসি ধ্যান,
বিশ্ব সত্য কিংবা ফাঁকি লভো সেই জ্ঞান।
আমি ততক্ষণ বসি তৃপ্তিহীন চোখে
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে।

২৭ চৈত্র ১৩০২

## মানসী

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী,
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে। বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার 'পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
কত বর্ণ, কত গন্ধ, ভূষণ কত-না—
সিন্ধু হতে মুক্তা আসে, খনি হতে সোনা,

বসন্তের বন হতে আসে পুষ্পভার,
চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তার।
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন।
পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা—
অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।

২৮ চৈত্র ১৩০২

## অজ্ঞাত বিশ্ব

জন্মেছি তোমার মাঝে ক্ষণিকের তরে
অসীম প্রকৃতি! সরল বিশ্বাসভরে
তবু তোরে গৃহ ব'লে, মাতা ব'লে মানি।
আজ সন্ধ্যাবেলা তোর নখদন্ত হানি
প্রচণ্ড পিশাচীরূপে ছুটিয়া গর্জিয়া,
আপনার মাতৃবেশ শূন্যে বিসর্জিয়া
কুটি কুটি ছিন্ন করি বৈশাখের ঝড়ে
ধেয়ে এলি ভয়ংকরী ধূলিপক্ষ-'পরে,
তৃণসম করিবারে প্রাণ উৎপাটন।
সভয়ে শুধাই আজি, হে মহাভীষণ,
অনন্ত আকাশপথ রুধি চারি ধারে
কে তুমি সহস্রবাহু ঘিরেছ আমারে?
আমার ক্ষণিক প্রাণ কে এনেছে যাচি?
কোথা মোরে যেতে হবে, কেন আমি আছি?

২ বৈশাখ ১৩০৩

## বিলয়

যেন তার আঁখি দুটি নবনীল ভাসে
ফুটিয়া উঠিছে আজি অসীম আকাশে।
বৃষ্টিধৌত প্রভাতের আলোকহিল্লোলে
অশ্রুমাখা হাসি তার বিকাশিয়া তোলে।
তার সেই স্নেহলীলা সহস্র আকারে
সমস্ত জগৎ হতে ঘিরিছে আমারে।

বরষার নদী-'পরে ছলছল আলো,
দূর তীরে কাননের ছায়া কালো কালো,
দিগন্তের শ্যামপ্রান্তে শান্ত মেঘরাজি—
তারি মুখখানি যেন শতরূপ সাজি।
আঁখি তার কহে যেন মোর মুখে চাহি,
'আজি প্রাতে সব পাখি উঠিয়াছে গাহি—
শুধু মোর কণ্ঠস্বর এ প্রভাতবায়ে
অনন্ত জগৎমাঝে গিয়েছে হারায়ে।'

৭ শ্রাবণ ১৩০৩

## প্রথম চুম্বন

স্তব্ধ হল দশ দিক নত করি আঁখি—
বন্ধ করি দিল গান যত ছিল পাখি।
শান্ত হয়ে গেল বায়ু— জলকলস্বর
মুহূর্তে থামিয়া গেল, বনের মর্মর
বনের মর্মের মাঝে মিলাইল ধীরে।
নিস্তরঙ্গ তটিনীর জনশূন্য তীরে
নিঃশব্দে নামিল আসি সায়াহ্নচ্ছায়ায়
নিস্তব্ধ গগনপ্রান্ত নির্বাক্ ধরায়।
সেইক্ষণে বাতায়নে নীরব নির্জন
আমাদের দুজনের প্রথম চুম্বন।
দিক্‌দিগন্তরে বাজি উঠিল তখনি
দেবালয়ে আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি;
অনন্ত নক্ষত্রলোক উঠিল শিহরি;
আমাদের চক্ষে এল অশ্রুজল ভরি।

১০ শ্রাবণ ১৩০৩

## বিদায়

হে তটিনী, সে নগরে নাই কলস্বন
তোমার কণ্ঠের মতো; উদার গগন,
অলিখিত মহাশাস্ত্র, নীল পত্রগুলি
দিক হতে দিগন্তরে নাহি রাখে খুলি।

শান্ত স্নিগ্ধ বসুন্ধরা শ্যামল অঞ্জনে
সত্যের স্বরূপখানি নির্মল নয়নে
রাখে না নবীন করি ; সেথায় কেবল
একমাত্র আপনার অন্তর-সম্বল
অকূলের মাঝে। তাই ভীতশিশুপ্রায়
হৃদয় চাহে না আজি লইতে বিদায়
তোমা-সবাকার কাছে। তাই প্রাণপণে
আঁকড়িয়া ধরিতেছে আর্ত আলিঙ্গনে
নির্জনলক্ষ্মীরে। শুভশান্তিপত্র তব
অন্তরে বাঁধিয়া দাও, কণ্ঠে পরি লব।

১৪ শ্রাবণ ১৩০৩

## দুঃসময়

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

এ নহে মুখর বনমর্মরগুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে ;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত,
ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে ;
কোথা রে সে তীর ফুলপল্লবপুঞ্জিত
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়শাখা-
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্বরী,
ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে ;
বিশ্বজগৎ নিশ্বাসবায়ু সম্বরি
স্তব্ধ আসনে প্রহর গনিছে বিরলে ;

সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি
দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা---
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমা-পানে আছে চাহিয়া ;
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি
শত তরঙ্গে তোমা-পানে উঠে ধাইয়া ;
বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
'এসো এসো' সুরে করুণ-মিনতি-মাখা—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহমোহবন্ধন ;
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা ব'সে ক্রন্দন ;
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

জোড়াসাঁকো
১৫ বৈশাখ ১৩০৪

## বর্ষামঙ্গল

ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর-সরসা।
গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে।
নিখিলচিত্তহরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা!
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা।

আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা—
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী!
কুঞ্জকুটিরে অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জপাতায় নব গীত করো রচনা
মেঘমল্লার-রাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী!

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে।
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গনিয়া গনিয়া
স্মিত-বিকশিত বয়নে—
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে।

স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে;
শশীতারাহীনা অন্ধতামসী যামিনী—
কোথা তোরা পুরকামিনী!
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে,
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী।
শূন্য শয়নে কোথা জাগে পুরকামিনী!

যূথীপরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরী তমালকুঞ্জতিমিরে—
জাগো সহচরী, আজিকার নিশি ভুলো না,
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।
কুসুমপরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে,
কোথা পুলকের তুলনা!
নীপশাখে, সখী, ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা!

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা—
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।
শতশতগীতমুখরিত বনবীথিকা।

জোড়াসাঁকো
১৭ বৈশাখ ১৩০৪

## স্বপ্ন

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে।

মহাকালমন্দিরের মাঝে
তখন গম্ভীর মন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে।

জনশূন্য পণ্যবীথি— ঊর্ধ্বে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্য-'পরে সন্ধ্যারশ্মিরেখা।

প্রিয়ার ভবন
বঙ্কিম সংকীর্ণ পথে দুর্গম, নির্জন।
দ্বারে আঁকা শঙ্খচক্র, তারি দুই ধারে
দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।
তোরণের শ্বেতস্তম্ভ-'পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্তি বসি দম্ভভরে।

প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এল ঘরে,
ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণদণ্ড-'পরে।
হেনকালে হাতে দীপশিখা
ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা।
দেখা দিল দ্বারপ্রান্তে সোপানের 'পরে
সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মতো, সন্ধ্যাতারা করে।
অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশধূপবাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।
প্রকাশিল অর্ধচ্যুত বসন-অন্তরে
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে।
দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায়
নগরগুঞ্জনক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়।

মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে, মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীরবে শুধাল শুধু, সকরুণ আঁখি,
'হে বন্ধু, আছ তো ভালো ?' মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু— কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি— নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত— মনে নাহি আর।
দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহা-পানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।

দুজনে ভাবিনু কত দ্বারতরুতলে।
নাহি জানি কখন কী ছলে

সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণকরে, কুলায়প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখির মতো ; মুখখানি তার
নতবৃন্ত পদ্মসম এ বক্ষে আমার
নমিয়া পড়িল ধীরে ; ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আসি নিশ্বাসে নিশ্বাস।

রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।
দীপ দ্বারপাশে
কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।
শিপ্রানদীতীরে
আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে।

বোলপুর
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

## মদনভস্মের পর

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী—
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতিবিলাপসংগীতে,
সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।
ফাগুন-মাসে নিমেষ-মাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি মুরছি পড়ে অবনী।

আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণা
হৃদয়বীণাযন্ত্রে মহাপুলকে,
তরুণী বসি ভাবিয়া মরে কী দেয় তারে মন্ত্রণা
মিলিয়া সবে দ্যুলোকে আর ভূলোকে।
কী কথা উঠে মর্মরিয়া বকুলতরুপল্লবে,
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা।
ঊর্ধ্বমুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে,
নির্ঝরিণী বহিছে কোন্ পিপাসা।

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত,
নয়ন কার নীরব নীল গগনে!
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত,
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে!
পরশ কার পুষ্পবাসে পরান মন উল্লাসি
হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে!
পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী—
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

## বিদায়

এবার চলিনু তবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।
উচ্ছল জল করে ছলছল,
জাগিয়া উঠিছে কলকোলাহল,
তরণীপতাকা চলচঞ্চল
কাঁপিছে অধীর রবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর,
নির্মম আমি আজি।
আর নাই দেরি ভৈরবভেরী
বাহিরে উঠেছে বাজি।
তুমি ঘুমাইছ নিমীলনয়নে,
কাঁপিয়া উঠিছ বিরহস্বপনে,
প্রভাতে জাগিয়া শূন্য শয়নে
কাঁদিয়া চাহিয়া রবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

অরুণ তোমার তরুণ অধর,
করুণ তোমার আঁখি—

অমিয়রচন সোহাগবচন
অনেক রয়েছে বাকি।
পাখি উড়ে যাবে সাগরের পার,
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার,
মহাকাশ হতে ওই বারে-বার
আমারে ডাকিছে সবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর!
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর!
কিসেরই বা সুখ, ক'দিনের প্রাণ!
ওই উঠিয়াছে সংগ্রামগান,
অমর মরণ রক্তচরণ
নাচিছে সগৌরবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

ইছামতী। ৭ আশ্বিন ১৩০৪

## পতিতা

ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী,
চরণপদ্মে নমস্কার।
লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা,
লও ফিরে তব পুরস্কার।
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিরে ভুলাতে
পাঠাইলে বনে যে কয়জনা
সাজায়ে যতনে ভূষণে রতনে,
আমি তারি এক বারাঙ্গনা।
দেবতা ঘুমালে আমাদের দিন,
দেবতা জাগিলে মোদের রাতি—
ধরার নরকসিংহদুয়ারে
জ্বালাই আমরা সন্ধ্যাবাতি।

তুমি অমাত্য রাজসভাসদ্,
তোমার ব্যাবসা ঘৃণ্যতর,
সিংহাসনের আড়ালে বসিয়া
মানুষের ফাঁদে মানুষ ধর!
আমি কি তোমার গুপ্ত অস্ত্র?
হৃদয় বলিয়া কিছু কি নেই?
ছেড়েছি ধরম, তা বলে ধরম
ছেড়েছে কি মোরে একেবারেই?
নাহিকো করম, লজ্জা শরম,
জানি নে জনমে সতীর প্রথা—
তা বলে নারীর নারীত্বটুকু
ভুলে যাওয়া, সে কি কথার কথা!

সে যে তপোবন, স্বচ্ছ পবন,
অদূরে সুনীল শৈলমালা,
কলগান করে পুণ্য তটিনী—
সে কি নগরীর নাট্যশালা!
মনে হল সেথা অন্তরগ্লানি
বুকের বাহিরে বাহিরি আসে।
ওগো বনভূমি, মোরে ঢাকো তুমি
নবনির্মল শ্যামল বাসে।
অয়ি উজ্জ্বল উদার আকাশ,
লজ্জিত জনে করুণা ক'রে
তোমার সহজ অমলতাখানি
শত পাকে ঘেরি পরাও মোরে।

স্থান আমাদের রুদ্ধ নিলয়ে
প্রদীপের-পীত-আলোক-জ্বালা,
যেথায় ব্যাকুল বদ্ধ বাতাস
ফেলে নিশ্বাস হুতাশ-ঢালা।
রতননিকরে কিরণ ঠিকরে,
মুকুতা ঝলকে অলকপাশে,
মদির শীকর-সিক্ত আকাশ
ঘন হয়ে যেন ঘেরিয়া আসে।
মোরা গাঁথা মালা প্রমোদরাতের—
গেলে প্রভাতের পুষ্পবনে

লাজে ম্লান হয়ে মরে ঝরে যাই,
মিশাবারে চাই মাটির সনে।
তবু, তবু ওগো কুসুমভগিনী,
এবার বুঝিতে পেরেছি মনে,
ছিল ঢাকা সেই বনের গন্ধ
অগোচরে কোন্ প্রাণের কোণে।

সেদিন নদীর নিকষে অরুণ
আঁকিল প্রথম সোনার লেখা,
স্নানের লাগিয়া তরুণ তাপস
নদীতীরে ধীরে দিলেন দেখা।
পিঙ্গল জটা ঝলিছে ললাটে
পূর্ব-অচলে উষার মতো—
তনু দেহখানি জ্যোতির লতিকা,
জড়িত স্নিগ্ধ তড়িৎ শত।
মনে হল, মোর নবজনমের
উদয়শৈল উজল করি
শিশিরধৌত পরম প্রভাত
উদিল নবীন জীবন ভরি।

তরুণীরা মিলি তরণী বাহিয়া
পঞ্চম সুরে ধরিল গান—
ঋষির কুমার মোহিত চকিত
মৃগশিশুসম পাতিল কান।
সহসা সকলে ঝাঁপ দিয়া জলে
মুনিবালকেরে ফেলিয়া ফাঁদে
ভুজে ভুজে বাঁধি ঘিরিয়া ঘিরিয়া
নৃত্য করিল বিবিধ ছাঁদে।
নূপুরে নূপুরে দ্রুত তালে তালে
নদীজলতলে বাজিল শিলা—
ভগবান ভানু রক্তনয়নে
হেরিলা নিলাজ নিঠুর লীলা।

প্রথমে চকিত দেবশিশুসম
চাহিলা কুমার কৌতূহলে—

কোথা হতে যেন অজানা আলোক
পড়িল তাঁহার পথের তলে।
দেখিতে দেখিতে ভক্তিকিরণ
দীপ্তি সঁপিল শুভ্র ভালে—
দেবতার কোন্ নূতন প্রকাশ
হেরিলেন আজি প্রভাতকালে।
বিমল বিশাল বিস্মিত চোখে
দুটি শুকতারা উঠিল ফুটি—
বন্দনাগান রচিলা কুমার
জোড় করি করকমল দুটি।
করুণ কিশোর কোকিলকণ্ঠে
সুধার উৎস পড়িল টুটে,
স্থির তপোবন শান্তিমগন
পাতায় পাতায় শিহরি উঠে।
যে গাথা গাহিলা সে কখনো আর
হয় নি রচিত নারীর তরে,
সে শুধু শুনেছে নির্মলা উষা
নির্জনগিরিশিখর-'পরে।
সে শুধু শুনেছে নীরব সন্ধ্যা
নীলনির্বাক্ সিন্ধুতলে।
শুনে গলে যায় আর্দ্র হৃদয়
শিশিরশীতল অশ্রুজলে।

হাসিয়া উঠিল পিশাচীর দল
অঞ্চলতল অধরে চাপি।
ঈষৎ ত্রাসের তড়িৎ-চমক
ঋষির নয়নে উঠিল কাঁপি।
ব্যথিত চিত্তে ত্বরিত চরণে
করজোড়ে পাশে দাঁড়ানু আসি-
কহিনু, 'হে মোর প্রভু তপোধন,
চরণে আগত অধম দাসী।'
তীরে লয়ে তাঁরে, সিক্ত অঙ্গ
মুছানু আপন পট্টবাসে—
জানু পাতি বসি যুগলচরণ
মুছিয়া লইনু এ কেশপাশে।

তার পরে মুখ তুলিয়া চাহিনু
উর্ধ্বমুখীন ফুলের মতো—
তাপসকুমার চাহিলা আমার
মুখপানে করি বদন নত।
প্রথম-রমণী-দরশ-মুগ্ধ
সে দুটি সরল নয়ন হেরি
হৃদয়ে আমার নারীর মহিমা
বাজায়ে উঠিল বিজয়ভেরী।
ধন্য রে আমি, ধন্য বিধাতা
সৃজেছ আমারে রমণী করি।
তাঁর দেহময় উঠে মোর জয়,
উঠে জয় তাঁর নয়ন ভরি।
জননীর স্নেহ, রমণীর দয়া,
কুমারীর নব নীরব প্রীতি—
আমার হৃদয়বীণার তন্ত্রে
বাজায়ে তুলিল মিলিত গীতি।

কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে,
'কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা!
তোমার পরশ অমৃত সরস,
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।'
হেসো না মন্ত্রী, হেসো না, হেসো না,
ব্যথায় বিঁধো না ছুরির ধার—
ধূলিলুণ্ঠিতা অবমানিতারে
অবমান তুমি কোরো না আর।
মধুরাতে কত মুগ্ধহৃদয়
স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি—
তখন শুনেছি বহু চাটুকথা,
শুনি নি এমন সত্যবাণী।
সত্য কথা এ, কহিনু আবার,
স্পর্ধা আমার কভু এ নহে—
ঋষির নয়ন মিথ্যা হেরে না,
ঋষির রসনা মিছে না কহে।
বৃদ্ধ, বিষয়বিষজর্জর,
হেরিছ বিশ্ব দ্বিধার ভাবে,

নগরীর ধূলি লেগেছে নয়নে—
আমারে কি তুমি দেখিতে পাবে!
আমিও দেবতা, ঋষির আঁখিতে
এনেছি বহিয়া নূতন দিবা—
অমৃতসরস আমার পরশ,
আমার নয়নে দিব্য বিভা।
আমি শুধু নহি সেবার রমণী
মিটাতে তোমার লালসাক্ষুধা,
তুমি যদি দিতে পূজার অর্ঘ্য
আমি সঁপিতাম স্বর্গসুধা।

দেবতারে মোর কেহ তো চাহে নি,
নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা—
দূরদুর্গম মনোবনবাসে
পাঠাইল তাঁরে করিয়া হেলা।
সেইখানে এল আমার তাপস,
সেই পথহীন বিজন গেহ—
স্তব্ধ নীরব গহন গভীর
যেথা কোনোদিন আসে নি কেহ।
সাধকবিহীন একক দেবতা
ঘুমাতেছিলেন সাগরকূলে—
ঋষির বালক পুলকে তাঁহারে
পূজিলা প্রথম পূজার ফুলে।
আনন্দে মোর দেবতা জাগিল,
জাগে আনন্দ ভকতপ্রাণে—
এ বারতা মোর দেবতা তাপস
দোঁহে ছাড়া আর কেহ না জানে।

কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে,
'আনন্দময়ী মুরতি তুমি,
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার,
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।'
শুনি সে বচন, হেরি সে নয়ন,
দুই চোখে মোর ঝরিল বারি।
নিমেষে ধৌত নির্মল রূপে
বাহিরিয়া এল কুমারী নারী।

বহুদিন মোর প্রমোদনিশীথে
যত শত দীপ জ্বলিয়াছিল,
দূর হতে দূরে, এক নিশ্বাসে
কে যেন সকলি নিবায়ে দিল।
প্রভাত-অরুণ ভায়ের মতন
সঁপি দিল কর আমার কেশে,
আপনার করি নিল পলকেই
মোরে তপোবন-পবন এসে।

মিথ্যা তোমার জটিল বুদ্ধি—
বৃদ্ধ, তোমার হাসিরে ধিক্।
চিত্ত তাহার আপনার কথা
আপন মর্মে ফিরায়ে নিক।
তোমার পামরী পাপিনীর দল
তারাও অমনি হাসিল হাসি—
আবেশে বিলাসে, ছলনার পাশে
চারি দিক হতে ঘেরিল আসি।
বসনাঞ্চল লুটায় ভূতলে,
বেণী খসি পড়ে কবরী টুটি—
ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারিল কুমারে
লীলায়িত করি হস্ত দুটি।
হে মোর অমল কিশোর তাপস,
কোথায় তোমারে আড়ালে রাখি!
আমার কাতর অন্তর দিয়ে
ঢাকিবারে চাই তোমার আঁখি।
হে মোর প্রভাত, তোমারে ঘেরিয়া
পারিতাম যদি দিতাম টানি
উষার রক্তমেঘের মতন
আমার দীপ্ত শরমখানি।
ও আহুতি তুমি নিয়ো না, নিয়ো না,
হে মোর অনল, তপের নিধি—
আমি হয়ে ছাই তোমারে লুকাই
এমন ক্ষমতা দিল না বিধি!
ধিক্ রমণীরে, ধিক্ শতবার,
হতলাজ বিধি তোমারে ধিক!

রমণীজাতির ধিক্কারগানে
ধ্বনিয়া উঠিল সকল দিক।
ব্যাকুল শরমে অসহ ব্যথায়
লুটায়ে ছিন্নলতিকাসমা
কহিনু তাপসে, 'পুণ্যচরিত,
পাতকিনীদের করিয়ো ক্ষমা।
আমারে ক্ষমিয়ো, আমারে ক্ষমিয়ো,
আমারে ক্ষমিয়ো করুণানিধি!'
হরিণীর মতো ছুটে চলে এনু
শরমের শর মর্মে বিঁধি।
কাঁদিয়া কহিনু কাতরকণ্ঠে,
'আমারে ক্ষমিয়ো পুণ্যরাশি!'
চপলভঙ্গে লুটায়ে রঙ্গে
পিশাচীরা পিছে উঠিল হাসি।
ফেলি দিল ফুল মাথায় আমার
তপোবনতরু করুণা মানি,
দূর হতে কানে বাজিতে লাগিল
বাঁশির মতন মধুর বাণী—
'আনন্দময়ী মুরতি তোমার,
কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা!
অমৃতসরস তোমার পরশ,
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।'
দেবতারে তুমি দেখেছ, তোমার
সরল নয়ন করে নি ভুল।
দাও মোর মাথে, নিয়ে যাই সাথে
তোমার হাতের পূজার ফুল।
তোমার পূজার গন্ধ আমার
মনোমন্দির ভরিয়া রবে—
সেথায় দুয়ার রুধিনু এবার
যতদিন বেঁচে রহিব ভবে।

মন্ত্রী, আবার সেই বাঁকা হাসি?
নাহয় দেবতা আমাতে নাই—
মাটি দিয়ে তবু গড়ে তো প্রতিমা,
সাধকেরা পূজা করে তো তাই।

একদিন তার পূজা হয়ে গেলে
চিরদিন তার বিসর্জন,
খেলার পুতলি করিয়া তাহারে
আর কি পূজিবে পৌরজন!
পূজা যদি মোর হয়ে থাকে শেষ
হয়ে গেছে শেষ আমার খেলা—
দেবতার লীলা করি সমাপন
জলে ঝাঁপ দিবে মাটির ঢেলা।
হাসো হাসো তুমি হে রাজমন্ত্রী,
লয়ে আপনার অহংকার—
ফিরে লও তব স্বর্ণমুদ্রা,
ফিরে লও তব পুরস্কার।
বহু কথা বৃথা বলেছি তোমায়,
তা লাগি হৃদয় ব্যথিছে মোরে,
অধম নারীর একটি বচন
রেখো হে প্রাজ্ঞ স্মরণ ক'রে—
বুদ্ধির বলে সকলি বুঝেছ,
দু-একটি বাকি রয়েছে তবু,
দৈবে যাহারে সহসা বুঝায়
সে ছাড়া সে কেহ বোঝে না কভু।

৯ কার্তিক ১৩০৪

## দেবতার গ্রাস

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে
মৈত্রমহাশয় যাবে সাগরসঙ্গমে
তীর্থস্নান লাগি। সঙ্গীদল গেল জুটি
কত বালবৃদ্ধ নরনারী; নৌকা দুটি
প্রস্তুত হইল ঘাটে।

পুণ্যলোভাতুর
মোক্ষদা কহিল আসি, 'হে দাদাঠাকুর,
আমি তব হব সাথি।' বিধবা যুবতী—
দুখানি করুণ আঁখি মানে না যুকতি,
কেবল মিনতি করে— অনুরোধ তার
এড়ানো কঠিন বড়ো। 'স্থান কোথা আর'

মৈত্র কহিলেন তারে। 'পায়ে ধরি তব'
বিধবা কহিল কাঁদি, 'স্থান করি লব
কোনোমতে একধারে।' ভিজে গেল মন,
তবু দ্বিধাভরে তারে শুধাল ব্রাহ্মণ,
'নাবালক ছেলেটির কী করিবে তবে।'
উত্তর করিল নারী, 'রাখাল ? সে রবে
আপন মাসির কাছে। তার জন্ম-পরে
বহু দিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে,
বাঁচিব ছিল না আশা ; অন্নদা তখন
আপন শিশুর সাথে দিয়ে তারে স্তন
মানুষ করেছে যত্নে— সেই হতে ছেলে
মাসির আদরে আছে মার কোল ফেলে।
দুরন্ত মানে না কারে, করিলে শাসন
মাসি আসি অশ্রুজলে ভরিয়া নয়ন
কোলে তারে টেনে লয়। সে থাকিবে সুখে
মার চেয়ে আপনার মাসিমার বুকে।'

সম্মত হইল বিপ্র। মোক্ষদা সত্বর
প্রস্তুত হইল বাঁধি জিনিস-পত্তর,
প্রণমিয়া গুরুজনে, সখীদলবলে
ভাসাইয়া বিদায়ের শোক-অশ্রুজলে।
ঘাটে আসি দেখে সেথা আগে-ভাগে ছুটি
রাখাল বসিয়া আছে তরী-'পরে উঠি
নিশ্চিন্ত নীরবে। 'তুই হেথা কেন ওরে'
মা শুধাল। সে কহিল, 'যাইব সাগরে।'
'যাইবি সাগরে! আরে, ওরে দস্যু ছেলে,
নেমে আয়।' পুনরায় দৃঢ় চক্ষু মেলে
সে কহিল দুটি কথা, 'যাইব সাগরে।'
যত তার বাহু ধরি টানাটানি করে
রহিল সে তরণী আঁকড়ি। অবশেষে
ব্রাহ্মণ করুণ স্নেহে কহিলেন হেসে,
'থাক্ থাক্, সঙ্গে যাক।' মা রাগিয়া বলে,
'চল্, তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে।'
যেমনি সে কথা গেল আপনার কানে
অমনি মায়ের বক্ষ অনুতাপবাণে

বিঁধিয়া কাঁদিয়া উঠে। মুদিয়া নয়ন
'নারায়ণ নারায়ণ' করিল স্মরণ—
পুত্রে নিল কোলে তুলি, তার সর্বদেহে
করুণ কল্যাণহস্ত বুলাইল স্নেহে।
মৈত্র তারে ডাকি ধীরে চুপি চুপি কয়,
'ছি ছি ছি, এমন কথা বলিবার নয়।'

রাখাল যাইবে সাথে স্থির হল কথা—
অন্নদা লোকের মুখে শুনি সে বারতা
ছুটে আসি বলে, 'বাছা, কোথা যাবি ওরে!'
রাখাল কহিল হাসি, 'চলিনু সাগরে।
আবার ফিরিব মাসি!' পাগলের প্রায়
অন্নদা কহিল ডাকি, 'ঠাকুরমশায়,
বড়ো যে দুরন্ত ছেলে রাখাল আমার,
কে তাহারে সামালিবে! জন্ম হতে তার
মাসি ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকে নি কোথাও;
কোথা এরে নিয়ে যাবে, ফিরে দিয়ে যাও।'
রাখাল কহিল, 'মাসি, যাইব সাগরে,
আবার ফিরিব আমি।' বিপ্র স্নেহভরে
কহিলেন, 'যতক্ষণ আমি আছি ভাই,
তোমার রাখাল লাগি কোনো ভয় নাই।
এখন শীতের দিন শান্ত নদীনদ,
অনেক যাত্রীর মেলা, পথের বিপদ
কিছু নাই; যাতায়াতে মাস-দুই কাল—
তোমারে ফিরায়ে দিব তোমার রাখাল।'

শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি নৌকা দিল ছাড়ি,
দাঁড়ায়ে রহিল ঘাটে যত কুলনারী
অশ্রুচোখে। হেমন্তের প্রভাতশিশিরে
ছলছল করে গ্রাম চূর্ণীনদীতীরে।

যাত্রীদল ফিরে আসে, সাঙ্গ হল মেলা।
তরণী তীরেতে বাঁধা অপরাহ্নবেলা
জোয়ারের আশে। কৌতূহল-অবসান
কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ

মাসির কোলের লাগি। জল শুধু জল,
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।

মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছল-ভরা ; তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের, লালায়িত মুখ।
হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক,
অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন,
সর্ব-উপদ্রবসহা আনন্দভবন
শ্যামলকোমলা, যেথা যে-কেহই থাকে
অদৃশ্য দু বাহু মেলি টানিছে তাহাকে
অহরহ, অয়ি মুগ্ধে, কী বিপুল টানে
দিগন্তবিস্তৃত তব শান্ত বক্ষপানে ।

চঞ্চল বালক আসি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
অধীর উৎসুক কণ্ঠে শুধায় ব্রাহ্মণে,
‘ঠাকুর, কখন আজি আসিবে জোয়ার।’

সহসা স্তিমিত জলে আবেগসঞ্চার
দুই কূল চেতাইল আশার সংবাদে।
ফিরিল তরীর মুখ, মৃদু আর্তনাদে
কাছিতে পড়িল টান, কলশব্দগীতে
সিন্ধুর বিজয়রথ পশিল নদীতে—
আসিল জোয়ার। মাঝি দেবতারে স্মরি
ত্বরিত উত্তরমুখে খুলে দিল তরী।
রাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের কাছে,
‘দেশে পঁহুছিতে আর কত দিন আছে।’

সূর্য অস্ত না যাইতে, ক্রোশ দুই ছেড়ে
উত্তর-বায়ুর বেগ ক্রমে ওঠে বেড়ে!
রূপনারানের মুখে পড়ি বালুচর
সংকীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তরসমীরে
উত্তাল উদ্দাম। ‘তরণী ভিড়াও তীরে’
উচ্চকণ্ঠে বারংবার কহে যাত্রীদল।
কোথা তীর! চারি দিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল

আপনার রুদ্র নৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে, আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে। এক দিকে যায় দেখা
অতিদূর তীরপ্রান্তে নীল বনরেখা,
অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্যাস্তপানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধত বিদ্রোহভরে। নাহি মানে হাল,
ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল
মূঢ়সম! তীব্রশীতপবনের সনে
মিশিয়া ত্রাসের হিম নরনারীগণে
কাঁপাইছে থরহরি। কেহ হতবাক্,
কেহ বা ক্রন্দন করে ছাড়ি ঊর্ধ্বডাক
ডাকি আত্মজনে। মৈত্র শুষ্ক পাংশুমুখে
চক্ষু মুদি করে জপ। জননীর বুকে
রাখাল লুকায়ে মুখ কাঁপিছে নীরবে।
তখন বিপন্ন মাঝি ডাকি কহে সবে,
'বাবারে দিয়েছে ফাঁকি তোমাদের কেউ,
যা মেনেছে দেয় নাই, তাই এত ঢেউ—
অসময়ে এ তুফান। শুন এই বেলা--
করহ মানত রক্ষা, করিয়ো না খেলা
ক্রুদ্ধ দেবতার সনে।' যার যত ছিল
অর্থ বস্ত্র যাহা-কিছু জলে ফেলি দিল
না করি বিচার। তবু, তখনি পলকে
তরীতে উঠিল জল দারুণ ঝলকে।
মাঝি কহে পুনর্বার, 'দেবতার ধন
কে যায় ফিরায়ে লয়ে এই বেলা শোন্।'
ব্রাহ্মণ সহসা উঠি কহিলা তখনি
মোক্ষদারে লক্ষ্য করি, 'এই সে রমণী
দেবতারে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে
চুরি করে নিয়ে যায়।' 'দাও তারে ফেলে'
এক বাক্যে গর্জি উঠে তরাসে নিষ্ঠুর
যাত্রী সবে! কহে নারী, 'হে দাদাঠাকুর,
রক্ষা করো, রক্ষা করো।' দুই দৃঢ় করে
রাখালেরে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরে।
ভর্ৎসিয়া গর্জিয়া উঠি কহিলা ব্রাহ্মণ,
'আমি তোর রক্ষাকর্তা! রোষে নিশ্চেতন

মা হয়ে আপন পুত্র দিলি দেবতারে—
শেষকালে আমি রক্ষা করিব তাহারে!
শোধ্ দেবতার ঋণ; সত্য ভঙ্গ ক'রে
এতগুলি প্রাণী তুই ডুবাবি সাগরে!'
মোক্ষদা কহিল, 'অতি মূর্খ নারী আমি,
কী বলেছি রোষবশে— ওগো অন্তর্যামী,
সেই সত্য হল! সে যে মিথ্যা কত দূর
তখনি শুনে কি তুমি বোঝ নি ঠাকুর!
শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা,
'শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা!'

বলিতে বলিতে যত মিলি মাঝি-দাঁড়ি
বল করি রাখালেরে নিল ছিঁড়ি কাড়ি
মার বক্ষ হতে। মৈত্র মুদি দুই আঁখি
ফিরায়ে রহিল মুখ কানে হাত ঢাকি
দন্তে দন্ত চাপি বলে। কে তাঁরে সহসা
মর্মে মর্মে আঘাতিল বিদ্যুতের কশা—
দংশিল বৃশ্চিকদংশ। 'মাসি! মাসি! মাসি!'
বিন্ধিল বহ্নির শলা রুদ্ধ কর্ণে আসি
নিরুপায় অনাথের অন্তিমের ডাক।
চীৎকারি উঠিল বিপ্র, 'রাখ্ রাখ্ রাখ্!'
চকিতে হেরিল চাহি মূর্ছি আছে পড়ে
মোক্ষদা চরণে তাঁর। মুহূর্তের তরে
ফুটন্ত তরঙ্গমাঝে মেলি আর্ত চোখ
'মাসি' বলি ফুকারিয়া মিলাল বালক
অনন্ততিমিরতলে; শুধু ক্ষীণ মুঠি
বারেক ব্যাকুল বলে ঊর্ধ্বপানে উঠি
আকাশে আশ্রয় খুঁজি ডুবিল হতাশে।
'ফিরায়ে আনিব তোরে' কহি ঊর্ধ্বশ্বাসে
ব্রাহ্মণ মুহূর্তমাঝে ঝাঁপ দিল জলে—
আর উঠিল না। সূর্য গেল অস্তাচলে।

১৩ কার্তিক ১৩০৪

## গান্ধারীর আবেদন

দুর্যোধন। প্রণমি চরণে তাত!

ধৃতরাষ্ট্র। ওরে দুরাশয়,
অভীষ্ট হয়েছে সিদ্ধ?

দুর্যোধন। লভিয়াছি জয়।

ধৃতরাষ্ট্র। এখন হয়েছ সুখী?

দুর্যোধন। হয়েছি বিজয়ী।

ধৃতরাষ্ট্র। অখণ্ডরাজত্ব জিনি সুখ তোর কই,
রে দুর্মতি!

দুর্যোধন। সুখ চাহি নাই মহারাজ!
জয়! জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।
ক্ষুদ্র সুখে ভরে নাকো ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা
কুরুপতি— দীপ্তজ্বালা অগ্নিঢালা সুধা
জয়রস, ঈর্ষাসিন্ধুমন্থনসঞ্জাত,
সদ্য করিয়াছি পান; সুখী নহি, তাত,
অদ্য আমি জয়ী। পিতঃ সুখে ছিনু, যবে
একত্রে আছিনু বদ্ধ পাণ্ডবে কৌরবে,
কলঙ্ক যেমন থাকে শশাঙ্কের বুকে
কর্মহীন গর্বহীন দীপ্তিহীন সুখে।
সুখে ছিনু, পাণ্ডবের গাণ্ডীবটংকারে
শঙ্কাকুল শত্রুদল আসিত না দ্বারে।
সুখে ছিনু, পাণ্ডবেরা জয়দৃপ্ত করে
ধরিত্রী দোহন করি ভ্রাতৃপ্রীতিভরে
দিত অংশ তার— নিত্যনব ভোগসুখে
আছিনু নিশ্চিন্তচিত্তে অনন্ত কৌতুকে।
সুখে ছিনু, পাণ্ডবের জয়ধ্বনি যবে
হানিত কৌরবকর্ণ প্রতিধ্বনিরবে।
পাণ্ডবের যশোবিম্বপ্রতিবিম্ব আসি
উজ্জ্বল অঙ্গুলি দিয়া দিত পরকাশি
মলিন কৌরবকক্ষ। সুখে ছিনু, পিতঃ
আপনার সর্বতেজ করি নির্বাপিত
পাণ্ডবগৌরবতলে স্নিগ্ধশান্তরূপে,
হেমন্তের ভেক যথা জড়ত্বের কূপে।

আজি পাণ্ডুপুত্রগণে পরাভব বহি
বনে যায় চলি— আজ আমি সুখী নহি,
আজ আমি জয়ী।

ধৃতরাষ্ট্র। ধিক্ তোর ভ্রাতৃদ্রোহ!
পাণ্ডবের কৌরবের এক পিতামহ,
সে কি ভুলে গেলি?

দুর্যোধন। ভুলিতে পারি নে সে যে,
এক পিতামহ তবু ধনে মানে তেজে
এক নহি। যদি হত দূরবর্তী পর
নাহি ছিল ক্ষোভ; শর্বরীর শশধর
মধ্যাহ্নের তপনেরে দ্বেষ নাহি করে,
কিন্তু প্রাতে এক পূর্ব-উদয়শিখরে
দুই ভ্রাতৃসূর্যালোক কিছুতে না ধরে।
আজ দ্বন্দ্ব ঘুচিয়াছে— আজি আমি জয়ী,
আজি আমি একা।

ধৃতরাষ্ট্র। ক্ষুদ্র ঈর্ষা! বিষময়ী
ভুজঙ্গিনী!

দুর্যোধন। ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী।
ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান— লক্ষ লক্ষ তৃণ
একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন।
নক্ষত্র অসংখ্য থাকে সৌভ্রাত্রবন্ধনে—
এক সূর্য, এক শশী। মলিন কিরণে
দূর বন-অন্তরালে পাণ্ডুচন্দ্রলেখা
আজি অস্ত গেল— আজি কুরুসূর্য একা,
আজি আমি জয়ী।

ধৃতরাষ্ট্র। আজি ধর্ম পরাজিত।

দুর্যোধন। লোকধর্ম রাজধর্ম এক নহে পিতঃ!
লোকসমাজের মাঝে সমকক্ষ জন
সহায়সুহৃদ্‌রূপে নির্ভরবন্ধন—
কিন্তু রাজা একেশ্বর; সমকক্ষ তার
মহাশত্রু, চিরবিঘ্ন, স্থান দুশ্চিন্তার,
সম্মুখের অন্তরাল, পশ্চাতের ভয়,
অহর্নিশি যশঃশক্তিগৌরবের ক্ষয়,

ঐশ্বর্যের অংশ-অপহারী। ক্ষুদ্র জনে
বলভাগ ক'রে লয়ে বান্ধবের সনে
রহে বলী ; রাজদণ্ড যত খণ্ড হয়
তত তার দুর্বলতা, তত তার ক্ষয়।
একা সকলের ঊর্ধ্বে মস্তক আপন
যদি না রাখিবে রাজা, যদি বহুজন
বহুদূর হতে তাঁর সমুদ্ধত শির
নিত্য না দেখিতে পায় অব্যাহত স্থির,
তবে বহুজন-'পরে বহুদূরে তাঁর
কেমনে শাসনদৃষ্টি রহিবে প্রচার ?
রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই—
শুধু জয়ধর্ম আছে, মহারাজ, তাই
আজি আমি চরিতার্থ, আজি জয়ী আমি—
সম্মুখের ব্যবধান গেছে আজি নামি
পাণ্ডবগৌরবগিরি পঞ্চচূড়াময়।

ধৃতরাষ্ট্র। জিনিয়া কপট দ্যূতে তারে কোস্ জয় ?
লজ্জাহীন অহংকারী !

দুর্যোধন। যার যাহা বল
তাই তার অস্ত্র পিতঃ, যুদ্ধের সম্বল।
ব্যাঘ্রসনে নখে দন্তে নহিকো সমান,
তাই ব'লে ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ
কোন্ নর লজ্জা পায় ? মূঢ়ের মতন
ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুমাঝে আত্মসমর্পণ
যুদ্ধ নহে, জয়লাভ এক লক্ষ্য তার—
আজি আমি জয়ী পিতঃ, তাই অহংকার।

ধৃতরাষ্ট্র। আজি তুমি জয়ী, তাই তব নিন্দাধ্বনি
পরিপূর্ণ করিয়াছে অম্বর অবনী
সমুচ্চ ধিক্কারে।

দুর্যোধন। নিন্দা ! আর নাহি ডরি,
নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি।
নিস্তব্ধ করিয়া দিব মুখরা নগরী
স্পর্ধিত রসনা তার দৃঢ়বলে চাপি
মোর পাদপীঠতলে। 'দুর্যোধন পাপী'
'দুর্যোধন ক্রূরমনা' 'দুর্যোধন হীন'
নিরুত্তরে শুনিয়া এসেছি এতদিন—
রাজদণ্ড স্পর্শ করি কহি মহারাজ,
আপামর জনে আমি কহাইব আজ,

'দুর্যোধন রাজা। দুর্যোধন নাহি সহে
রাজনিন্দা-আলোচনা, দুর্যোধন বহে
নিজহস্তে নিজনাম।'

ধৃতরাষ্ট্র। ওরে বৎস, শোন্,
নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন
নিম্নমুখে অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে
গভীর জটিল মূল সুদূরে প্রসারে,
নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিত্ততল।
রসনায় নৃত্য করি চপল চঞ্চল
নিন্দা শ্রান্ত হয়ে পড়ে, দিয়ো না তাহারে
নিঃশব্দে আপন শক্তি বৃদ্ধি করিবারে
গোপন হৃদয়দুর্গে। প্রীতিমন্ত্রবলে
শান্ত করো, বন্দী করো নিন্দাসর্পদলে
বংশীরবে হাস্যমুখে।

দুর্যোধন। অব্যক্ত নিন্দায়
কোনো ক্ষতি নাহি করে রাজমর্যাদায়;
ভ্রূক্ষেপ না করি তাহে। প্রীতি নাহি পাই
তাহে খেদ নাহি— কিন্তু স্পর্ধা নাহি চাই
মহারাজ! প্রীতিদান স্বেচ্ছার অধীন,
প্রীতিভিক্ষা দিয়ে থাকে দীনতম দীন—
সে প্রীতি বিলাক তারা পালিত মার্জারে,
দ্বারের কুক্কুরে আর পাণ্ডবভ্রাতারে;
তাহে মোর নাহি কাজ। আমি চাহি ভয়,
সেই মোর রাজপ্রাপ্য; আমি চাহি জয়
দর্পিতের দর্প নাশি। শুন নিবেদন
পিতৃদেব!— এতকাল তব সিংহাসন
আমার নিন্দুকদল নিত্য ছিল ঘিরে
কণ্টকতরুর মতো নিষ্ঠুর প্রাচীরে
তোমার আমার মধ্যে রচি ব্যবধান;
শুনায়েছে পাণ্ডবের নিত্যগুণগান,
আমাদের নিত্যনিন্দা— এইমতে, পিতঃ,
পিতৃস্নেহ হতে মোরা চিরনির্বাসিত।
এইমতে, পিতঃ, মোরা শিশুকাল হতে
হীনবল— উৎসমুখে পিতৃস্নেহস্রোতে
পাষাণের বাধা পড়ি মোরা পরিক্ষীণ
শীর্ণ নদ, নষ্টপ্রাণ, গতিশক্তিহীন,

পদে পদে প্রতিহত— পাণ্ডবেরা স্ফীত,
অখণ্ড, অবাধগতি। অদ্য হতে, পিতঃ,
যদি সে নিন্দুকদলে নাহি কর দূর
সিংহাসনপার্শ্ব হতে, সঞ্জয় বিদুর
ভীষ্মপিতামহে— যদি তারা বিজ্ঞবেশে
হিতকথা ধর্মকথা সাধু-উপদেশে
নিন্দায় ধিক্কারে তর্কে নিমেষে নিমেষে
ছিন্ন ছিন্ন করি দেয় রাজকর্মডোর,
ভারাক্রান্ত করি রাখে রাজদণ্ড মোর,
পদে পদে দ্বিধা আনে রাজশক্তিমাঝে,
মুকুট মলিন করে অপমানে লাজে,
তবে ক্ষমা দাও পিতৃদেব, নাহি কাজ
সিংহাসনকণ্টকশয়নে— মহারাজ,
বিনিময় করে লই পাণ্ডবের সনে,
রাজ্য দিয়ে বনবাস, যাই নির্বাসনে।

ধৃতরাষ্ট্র। হায় বৎস, অভিমানী! পিতৃস্নেহ মোর
কিছু যদি হ্রাস হত শুনি সুকঠোর
সুহৃদের নিন্দাবাক্য, হইত কল্যাণ।
অধর্মে দিয়েছি যোগ, হারায়েছি জ্ঞান,
এত স্নেহ। করিতেছি সর্বনাশ তোর,
এত স্নেহ। জ্বালাতেছি কালানল ঘোর
পুরাতন কুরুবংশ-মহারণ্যতলে—
তবু, পুত্র, দোষ দিস স্নেহ নাই ব'লে?
মণিলোভে কালসর্প করিলি কামনা,
দিনু তোরে নিজহস্তে ধরি তার ফণা
অন্ধ আমি। অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে
চিরদিন— তোরে লয়ে প্রলয়তিমিরে
চলিয়াছি— বন্ধুগণ হাহাকার-রবে
করিছে নিষেধ, নিশাচর গৃধ্র-সবে
করিতেছে অশুভ চীৎকার, পদে পদে
সংকীর্ণ হতেছে পথ, আসন্ন বিপদে
কণ্টকিত কলেবর, তবু দৃঢ়করে
ভয়ংকর স্নেহে বক্ষে বাঁধি লয়ে তোরে
বায়ুবলে অন্ধবেগে বিনাশের গ্রাসে
ছুটিয়া চলেছি মূঢ় মত্ত অট্টহাসে
উল্কার আলোকে— শুধু তুমি আর আমি,

আর সঙ্গী বজ্রহস্ত দীপ্ত অন্তর্যামী—
নাই সম্মুখের দৃষ্টি, নাই নিবারণ
পশ্চাতের, শুধু নিম্নে ঘোর আকর্ষণ
নিদারুণ নিপাতের। সহসা একদা
চকিতে চেতনা হবে, বিধাতার গদা
মুহূর্তে পড়িবে শিরে, আসিবে সময়—
ততক্ষণ পিতৃস্নেহে কোরো না সংশয়,
আলিঙ্গন কোরো না শিথিল ; ততক্ষণ
দ্রুত হস্তে লুটি লও সর্বস্বার্থধন ;
হও জয়ী, হও সুখী, হও তুমি রাজা
একেশ্বর।— ওরে, তোরা জয়বাদ্য বাজা।
জয়ধ্বজা তোল্ শূন্যে। আজি জয়োৎসবে
ন্যায় ধর্ম বন্ধু ভ্রাতা কেহ নাহি রবে—
না রবে বিদুর ভীষ্ম, না রবে সঞ্জয়,
নাহি রবে লোকনিন্দা লোকলজ্জা-ভয়,
কুরুবংশরাজলক্ষ্মী নাহি রবে আর—
শুধু রবে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার,
আর কালান্তক যম— শুধু পিতৃস্নেহ
আর বিধাতার শাপ, আর নহে কেহ।

চরের প্রবেশ

চর। মহারাজ, অগ্নিহোত্র দেব-উপাসনা
ত্যাগ করি বিপ্রগণ, ছাড়ি সন্ধ্যার্চনা
দাঁড়ায়েছে চতুষ্পথে পাণ্ডবের তরে
প্রতীক্ষিয়া ; পৌরগণ কেহ নাহি ঘরে,
পণ্যশালা রুদ্ধ সব ; সন্ধ্যা হল, তবু
ভৈরবমন্দির-মাঝে নাহি বাজে প্রভু,
শঙ্খঘণ্টা সন্ধ্যাভেরী, দীপ নাহি জ্বলে ;
শোকাতুর নরনারী সবে দলে দলে
চলিয়াছে নগরের সিংহদ্বার-পানে
দীনবেশে সজলনয়নে।

দুর্যোধন। নাহি জানে
জাগিয়াছে দুর্যোধন। মূঢ় ভাগ্যহীন!
ঘনায়ে এসেছে আজি তোদের দুর্দিন।
রাজায় প্রজায় আজি হবে পরিচয়
ঘনিষ্ঠ কঠিন। দেখি কতদিন রয়
প্রজার পরম স্পর্ধা— নির্বিষ সর্পের

ব্যর্থ ফণা-আস্ফালন, নিরস্ত্র দর্পের
হুহুংকার।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। মহারাজ, মহিষী গান্ধারী
দর্শনপ্রার্থিনী পদে।

ধৃতরাষ্ট্র। রহিনু তাঁহারি
প্রতীক্ষায়।

দুর্যোধন। পিতঃ, আমি চলিলাম তবে।

[প্রস্থান

ধৃতরাষ্ট্র। করো পলায়ন। হায়, কেমনে বা সবে
সাধ্বী জননীর দৃষ্টি সমুদ্যত বাজ
ওরে পুণ্যভীত! মোরে তোর নাহি লাজ।

গান্ধারীর প্রবেশ

গান্ধারী। নিবেদন আছে শ্রীচরণে। অনুনয়
রক্ষা করো নাথ!

ধৃতরাষ্ট্র। কভু কি অপূর্ণ রয়
প্রিয়ার প্রার্থনা?

গান্ধারী। ত্যাগ করো এইবার—

ধৃতরাষ্ট্র। কারে হে মহিষী?

গান্ধারী। পাপের সংঘর্ষে যার
পড়িছে ভীষণ শান ধর্মের কৃপাণে
সেই মূঢ়ে।

ধৃতরাষ্ট্র। কে সে জন? আছে কোনখানে?
শুধু কহো নাম তার।

গান্ধারী। পুত্র দুর্যোধন।

ধৃতরাষ্ট্র। তাহারে করিব ত্যাগ!

গান্ধারী। এই নিবেদন
তব পদে।

ধৃতরাষ্ট্র। দারুণ প্রার্থনা হে গান্ধারী,
রাজমাতা!

গান্ধারী। এ প্রার্থনা শুধু কি আমারি
হে কৌরব? কুরুকুল পিতৃপিতামহ
স্বর্গ হতে এ প্রার্থনা করে অহরহ
নরনাথ! ত্যাগ করো, ত্যাগ করো তারে—
কৌরবকল্যাণলক্ষ্মী যার অত্যাচারে
অশ্রুমুখী প্রতীক্ষিছে বিদায়ের ক্ষণ
রাত্রিদিন।

ধৃতরাষ্ট্র। ধর্ম তারে করিবে শাসন
ধর্মেরে যে লঙ্ঘন করেছে— আমি পিতা—
গান্ধারী। মাতা আমি নহি? গর্ভভারজর্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে?
স্নেহবিগলিত চিত্ত শুভ্র দুগ্ধধারে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে নাই দুই স্তন বাহি
তার সেই অকলঙ্ক শিশুমুখ চাহি?
শাখাবন্ধে ফল যথা সেইমত করি
বহু বর্ষ ছিল না সে আমারে আঁকড়ি
দুই ক্ষুদ্র বাহুবৃন্ত দিয়ে— লয়ে টানি
মোর হাসি হতে হাসি, বাণী হতে বাণী,
প্রাণ হতে প্রাণ? তবু কহি, মহারাজ,
সেই পুত্র দুর্যোধনে ত্যাগ করো আজ।
ধৃতরাষ্ট্র। কী রাখিব তারে ত্যাগ করি?
গান্ধারী। ধর্ম তব।
ধৃতরাষ্ট্র। কী দিবে তোমারে ধর্ম?
গান্ধারী। দুঃখ নব নব।
পুত্রসুখ রাজ্যসুখ অধর্মের পণে
জিনি লয়ে চিরদিন বহিব কেমনে
দুই কাঁটা বক্ষে আলিঙ্গিয়া।
ধৃতরাষ্ট্র। হায় প্রিয়ে,
ধর্মবশে একবার দিনু ফিরাইয়ে
দ্যূতবদ্ধ পাণ্ডবের হৃত রাজ্যধন।
পরক্ষণে পিতৃস্নেহ করিল গুঞ্জন
শতবার কর্ণে মোর, 'কী করিলি ওরে?
এককালে ধর্মাধর্ম দুই তরী-'পরে
পা দিয়ে বাঁচে না কেহ। বারেক যখন
নেমেছে পাপের স্রোতে কুরুপুত্রগণ
তখন ধর্মের সাথে সন্ধি করা মিছে;
পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে।
কী করিলি হতভাগ্য, বৃদ্ধ, বুদ্ধিহত,
দুর্বল দ্বিধায় পড়ি? অপমানক্ষত
রাজ্য ফিরে দিলে তবু মিলাবে না আর
পাণ্ডবের মনে— শুধু নব কাষ্ঠভার
হুতাশনে দান। অপমানিতের করে
ক্ষমতার অস্ত্র দেওয়া মরিবার তরে।

সক্ষমে দিয়ো না ছাড়ি দিয়ে স্বল্প পীড়া,
করহ দলন। কোরো না বিফল ক্রীড়া
পাপের সহিত ; যদি ডেকে আন তারে
বরণ করিয়া তবে লহো একেবারে।'
এইমত পাপবুদ্ধি পিতৃস্নেহ রূপে
বিঁধিতে লাগিল মোর কর্ণে চুপে চুপে
কত কথা তীক্ষ্ণসূচিসম। পুনরায়
ফিরানু পাণ্ডবগণে ; দ্যূতছলনায়
বিসর্জিনু দীর্ঘ বনবাসে। হায় ধর্ম,
হায় রে প্রবৃত্তিবেগ ! কে বুঝিবে মর্ম
সংসারের !

গান্ধারী। ধর্ম নহে সম্পদের হেতু,
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু—
ধর্মেই ধর্মের শেষ। মূঢ় নারী আমি,
ধর্মকথা তোমারে কী বুঝাইব স্বামী,
জান তো সকলি। পাণ্ডবেরা যাবে বনে,
ফিরাইলে ফিরিবে না, বদ্ধ তারা পণে ;
এখন এ মহারাজ্য একাকী তোমার
মহীপতি— পুত্রে তব ত্যজ এইবার ;
নিষ্পাপেরে দুঃখ দিয়ে নিজে পূর্ণ সুখ
লইয়ো না ; ন্যায়ধর্মে কোরো না বিমুখ
পৌরবপ্রাসাদ হতে— দুঃখ সুদুঃসহ
আজ হতে ধর্মরাজ, লহো তুলি লহো,
দেহো তুলি মোর শিরে।

ধৃতরাষ্ট্র। হায় মহারানী,
সত্য তব উপদেশ, তীব্র তব বাণী !

গান্ধারী। অধর্মের মধুমাখা বিষফল তুলি
আনন্দে নাচিছে পুত্র ; স্নেহমোহে ভুলি
সে ফল দিয়ো না তারে ভোগ করিবারে—
কেড়ে লও, ফেলে দাও, কাঁদাও তাহারে।
ছললব্ধ পাপস্ফীত রাজ্যধনজনে
ফেলে রাখি সেও চলে যাক নির্বাসনে,
বঞ্চিত পাণ্ডবদের সমদুঃখভার
করুক বহন।

ধৃতরাষ্ট্র। ধর্মবিধি বিধাতার—
জাগ্রত আছেন তিনি, ধর্মদণ্ড তাঁর

রয়েছে উদ্যত নিত্য— অয়ি মনস্বিনী,
তাঁর রাজ্যে তাঁর কার্য করিবেন তিনি।
আমি পিতা—

গান্ধারী। তুমি রাজা, রাজ-অধিরাজ
বিধাতার বাম হস্ত ; ধর্মরক্ষা-কাজ
তোমা-'পরে সমর্পিত। শুধাই তোমারে,
যদি কোনো প্রজা তব সতী অবলারে
পরগৃহ হতে টানি করে অপমান
বিনা দোষে— কী তাহার করিবে বিধান ?

ধৃতরাষ্ট্র। নির্বাসন।

গান্ধারী। তবে আজ রাজপদতলে
সমস্ত নারীর হয়ে নয়নের জলে
বিচার প্রার্থনা করি। পুত্র দুর্যোধন
অপরাধী প্রভু ! তুমি আছ, হে রাজন্,
প্রমাণ আপনি। পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব
স্বার্থ লয়ে বাধে অহরহ— ভালোমন্দ
নাহি বুঝি তার। দণ্ডনীতি, ভেদনীতি,
কূটনীতি কত শত, পুরুষের রীতি
পুরুষেই জানে। বলের বিরোধে বল,
ছলের বিরোধে কত জেগে উঠে ছল,
কৌশলে, কৌশল হানে— মোরা থাকি দূরে
আপনার গৃহকর্মে শান্ত অন্তঃপুরে।
যে সেথা টানিয়া আনে বিদ্বেষ-অনল,
যে সেথা সঞ্চার করে ঈর্ষার গরল
বাহিরের দ্বন্দ্ব হতে, পুরুষেরে ছাড়ি
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া নিরুপায় নারী
গৃহধর্মচারিণীর পুণ্যদেহ-'পরে
কলুষপরুষ স্পর্শে অসম্মানে করে
হস্তক্ষেপ— পতি-সাথে বাধায়ে বিরোধ
যে নর পত্নীরে হানি লয় তার শোধ,
সে শুধু পাষণ্ড নহে, সে যে কাপুরুষ।
মহারাজ, কী তার বিধান ? অকলুষ
পুরুবংশে পাপ যদি জন্ম লাভ করে
সেও সহে, কিন্তু প্রভু, মাতৃগর্বভরে
ভেবেছিনু গর্ভে মোর বীরপুত্রগণ
জন্মিয়াছে— হায় নাথ, সেদিন যখন

অনাথিনী পাঞ্চালীর আর্তকণ্ঠরব
প্রাসাদপাষাণভিত্তি করি দিল দ্রব
লজ্জা-ঘৃণা-করুণার তাপে, ছুটি গিয়া
হেরিনু গবাক্ষে, তার বস্ত্র আকর্ষিয়া
খল খল হাসিতেছে সভা-মাঝখানে
গান্ধারীর পুত্রপিশাচেরা— ধর্ম জানে,
সেদিন চূর্ণিয়া গেল জন্মের মতন
জননীর শেষ গর্ব। কুরুরাজগণ,
পৌরুষ কোথায় গেছে ছাড়িয়া ভারত!
তোমরা হে মহারথী, জড়মূর্তিবৎ
বসিয়া রহিলে সেথা চাহি মুখে মুখে,
কেহ বা হাসিলে, কেহ করিলে কৌতুকে
কানাকানি— কোষ-মাঝে নিশ্চল কৃপাণ
বজ্রনিঃশেষিত লুপ্ত বিদ্যুৎ-সমান
নিদ্রাগত। মহারাজ, শুন মহারাজ,
এ মিনতি— দূর করো জননীর লাজ,
বীরধর্ম করহ উদ্ধার, পদাহত
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন, অবনত
ন্যায়ধর্মে করহ সম্মান, ত্যাগ করো
দুর্যোধনে।

ধৃতরাষ্ট্র। পরিতাপদহনে-জর্জর
হৃদয়ে করিছ শুধু নিষ্ফল আঘাত
হে মহিষী!

গান্ধারী। শতগুণ বেদনা কি, নাথ,
লাগিছে না মোরে? প্রভু, দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ
কোনো ব্যথা নাহি পায় তারে দণ্ডদান
প্রবলের অত্যাচার। যে দণ্ডবেদনা
পুত্রেরে পার না দিতে সে কারে দিয়ো না।
যে তোমার পুত্র নহে তারও পিতা আছে,
মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে
বিচারক! শুনিয়াছি, বিশ্ববিধাতার
সবাই সন্তান মোরা— পুত্রের বিচার
নিয়ত করেন তিনি আপনার হাতে
নারায়ণ; ব্যথা দেন, ব্যথা পান সাথে—

নতুবা বিচারে তাঁর নাই অধিকার,
মূঢ় নারী লভিয়াছি অন্তরে আমার
এই শাস্ত্র। পাপী পুত্রে ক্ষমা কর যদি
নির্বিচারে, মহারাজ, তবে নিরবধি
যত দণ্ড দিলে তুমি যত দোষীজনে
ফিরিয়া লাগিবে আসি দণ্ডদাতা ভূপে ;
ন্যায়ের বিচার তব নির্মমতারূপে
পাপ হয়ে তোমারে দাগিবে। ত্যাগ করো
পাপী দুর্যোধনে।

ধৃতরাষ্ট্র। প্রিয়ে, সংহরো সংহরো
তব বাণী। ছিঁড়িতে পারি নে মোহডোর,
ধর্মকথা শুধু আসি হানে সুকঠোর
ব্যর্থ ব্যথা। পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার,
তাই তারে ত্যজিতে না পারি— আমি তার
একমাত্র। উন্মত্ততরঙ্গ-মাঝখানে
যে পুত্র সঁপেছে অঙ্গ তারে কোন্ প্রাণে
ছাড়ি যাব। উদ্ধারের আশা ত্যাগ করি
তবু তারে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরি,
তারি সাথে এক পাপে ঝাঁপ দিয়া পড়ি,
এক বিনাশের তলে তলাইয়া মরি
অকাতরে— অংশ লই তার দুর্গতির,
অর্ধফল ভোগ করি তার দুর্মতির,
সেই তো সান্ত্বনা মোর— এখন তো আর
বিচারের কাল নাই, নাই প্রতিকার,
নাই পথ— ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার,
ফলিবে যা ফলিবার আছে।

[প্রস্থান

গান্ধারী। হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও। নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি। যেদিন সুদীর্ঘ রাত্রি-পরে
সদ্য জেগে উঠে কাল সংশোধন করে
আপনারে, সেদিন দারুণ দুঃখদিন।
দুঃসহ উত্তাপে যথা স্থির গতিহীন
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু— জাগে ঝঞ্ঝাঝড়ে
অকস্মাৎ, আপনার জড়ত্বের 'পরে

করে আক্রমণ, অন্ধ বৃশ্চিকের মতো
ভীমপুচ্ছে আত্মশিরে হানে অবিরত
দীপ্ত বজ্রশূল, সেইমত কাল যবে
জাগে, তারে সভয়ে অকাল কহে সবে।
লুটাও লুটাও শির, প্রণম রমণী
সেই মহাকালে ; তার রথচক্রধ্বনি
দূর রুদ্রলোক হতে বজ্রঘর্ঘরিত
ওই শুনা যায়। তোর আর্ত জর্জরিত
হৃদয় পাতিয়া রাখ তার পথতলে।
ছিন্ন সিক্ত হৃৎপিণ্ডের রক্তশতদলে
অঞ্জলি রচিয়া থাক্ জাগিয়া নীরবে
চাহিয়া নিমেষহীন। তার পরে যবে
গগনে উড়িবে ধূলি, কাঁপিবে ধরণী,
সহসা উঠিবে শূন্যে ক্রন্দনের ধ্বনি—
হায় হায় হা রমণী, হায় রে অনাথা,
হায় হায় বীরবধূ, হায় বীরমাতা,
হায় হায় হাহাকার— তখন সুধীরে
ধুলায় পড়িস লুটি অবনতশিরে
মুদিয়া নয়ন। তার পরে নমো নম
সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্বাক্ নির্মম
দারুণ করুণ শান্তি! নমো নমো নম
কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা স্নিগ্ধতম!
নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নির্বৃতি,
শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি!

দুর্যোধন-মহিষী ভানুমতীর প্রবেশ
দাসীগণের প্রতি

ভানুমতী। ইন্দুমুখি, পরভৃতে, লহো তুলি শিরে
মাল্যবস্ত্র অলংকার।

গান্ধারী। বৎসে, ধীরে, ধীরে!
পৌরবভবনে কোন্ মহোৎসব আজি?
কোথা যাও নববস্ত্র-অলংকারে সাজি
বধূ মোর?

ভানুমতী। শত্রুপরাভবশুভক্ষণ
সমাগত।

গান্ধারী। শত্রু যার আত্মীয়স্বজন
আত্মা তার নিত্য শত্রু, ধর্ম শত্রু তার,

অজেয় তাহার শক্র। নব অলংকার
কোথা হতে হে কল্যাণী ?

ভানুমতী। জিনি বসুমতী
ভুজবলে পাঞ্চালীরে তার পঞ্চপতি
দিয়েছিল যত রত্ন মণি অলংকার—
যজ্ঞদিনে যাহা পরি ভাগ্য-অহংকার
ঠিকরিত মাণিক্যের শতসূচিমুখে
দ্রৌপদীর অঙ্গ হতে, বিদ্ধ হত বুকে
কুরুকুলকামিনীর, সে রত্নভূষণে
আমারে সাজায়ে তারে যেতে হল বনে।

গান্ধারী। হা রে মূঢ়ে, শিক্ষা তবু হল না তোমার!
সেই রত্ন নিয়ে তবু এত অহংকার!
এ কী ভয়ংকরী কান্তি, প্রলয়ের সাজ!
যুগান্তের উল্কাসম দহিছে না আজ
এ মণিমঞ্জীর তোরে ? রত্নললাটিকা
এ যে তোর সৌভাগ্যের বজ্রানলশিখা।
তোরে হেরি অঙ্গে মোর ত্রাসের স্পন্দন
সঞ্চারিছে, চিত্তে মোর উঠিছে ক্রন্দন—
আনিছে শঙ্কিত কর্ণে তোর অলংকার
উন্মাদিনী শংকরীর তাণ্ডবঝংকার।

ভানুমতী। মাতঃ, মোরা ক্ষত্রনারী, দুর্ভাগ্যের ভয়
নাহি করি। কভু জয়, কভু পরাজয়—
মধ্যাহ্নগগনে কভু, কভু অস্তধামে
ক্ষত্রিয়মহিমাসূর্য উঠে আর নামে।
ক্ষত্রবীরাঙ্গনা, মাতঃ, সেই কথা স্মরি
শঙ্কার বক্ষেতে থাকি সংকটে না ডরি
ক্ষণকাল। দুর্দিন-দুর্যোগ যদি আসে
বিমুখ ভাগ্যেরে তবে হানি উপহাসে
কেমনে মরিতে হয় জানি তাহা দেবী,
কেমনে বাঁচিতে হয় শ্রীচরণ সেবি
সে শিক্ষাও লভিয়াছি।

গান্ধারী। বৎসে, অমঙ্গল
একেলা তোমার নহে। লয়ে দলবল
সে যবে মিটায় ক্ষুধা, উঠে হাহাকার,
কত বীররক্তস্রোতে কত বিধবার
অশ্রুধারা পড়ে আসি— রত্ন-অলংকার

বধূহস্ত হতে খসি পড়ে শত শত
চূতলতাকুঞ্জবনে মঞ্জরীর মতো
ঝঞ্ঝাবাতে। বৎসে, ভাঙিয়ো না বদ্ধ সেতু।
ক্রীড়াচ্ছলে তুলিয়ো না বিপ্লবের কেতু
গৃহমাঝে। আনন্দের দিন নহে আজি।
স্বজনদুর্ভাগ্য লয়ে সর্ব অঙ্গে সাজি
গর্ব করিয়ো না মাতঃ। হয়ে সুসংযত
আজ হতে শুদ্ধচিত্তে উপবাসব্রত
করো আচরণ— বেণী করি উন্মোচন
শান্তমনে করো, বৎসে, দেবতা-অর্চন।
এ পাপ সৌভাগ্যদিনে গর্ব-অহংকারে
প্রতি ক্ষণে লজ্জা দিয়ো নাকো বিধাতারে।
খুলে ফেলো অলংকার, নবরক্তাম্বর ;
থামাও উৎসববাদ্য, রাজ-আড়ম্বর,
অগ্নিগৃহে যাও, পুত্রী, ডাকো পুরোহিতে—
কালের প্রতীক্ষা করো শুদ্ধসত্ত্ব চিতে।

[ভানুমতীর প্রস্থান

দ্রৌপদী-সহ পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ

যুধিষ্ঠির। আশীর্বাদ মাগিবারে এসেছি জননী,
বিদায়ের কালে।

গান্ধারী। সৌভাগ্যের দিনমণি
দুঃখরাত্রি-অবসানে দ্বিগুণ উজ্জ্বল
উদিবে হে বৎসগণ। বায়ু হতে বল,
সূর্য হতে তেজ, পৃথ্বী হতে ধৈর্যক্ষমা
করো লাভ, দুঃখব্রত পুত্র মোর! রমা
দৈন্যমাঝে গুপ্ত থাকি দীনছদ্মরূপে
ফিরুন পশ্চাতে তব সদা চুপে চুপে,
দুঃখ হতে তোমা-তরে করুন সঞ্চয়
অক্ষয় সম্পদ। নিত্য হউক নির্ভয়
নির্বাসনবাস। বিনা পাপে দুঃখভোগ
অন্তরে জ্বলন্ত তেজ করুক সংযোগ
বহ্নিশিখাদগ্ধ দীপ্ত সুবর্ণের প্রায়।
সেই মহাদুঃখ হবে মহৎ সহায়
তোমাদের। সেই দুঃখে রহিবেন ঋণী
ধর্মরাজ বিধি ; যবে শুধিবেন তিনি
নিজহস্তে আত্মঋণ তখন জগতে

দেব নর কে দাঁড়াবে তোমাদের পথে !
মোর পুত্র করিয়াছে যত অপরাধ
খণ্ডন করুক সব মোর আশীর্বাদ
পুত্রাধিক পুত্রগণ। অন্যায় পীড়ন
গভীর কল্যাণসিন্ধু করুক মন্থন।

দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন-পূর্বক

ভূলুণ্ঠিতা স্বর্ণলতা হে বৎসে আমার,
হে আমার রাহুগ্রস্ত শশী ! একবার
তোলো শির, বাক্য মোর করো অবধান।
যে তোমারে অবমানে তারি অপমান
জগতে রহিবে নিত্য, কলঙ্ক অক্ষয়।
তব অপমানরাশি বিশ্বজগন্ময়
ভাগ করে লইয়াছে সর্ব কুলাঙ্গনা—
কাপুরুষতার হস্তে সতীর লাঞ্ছনা।
যাও বৎসে, পতি-সাথে অমলিনমুখ
অরণ্যেরে করো স্বর্গ, দুঃখে করো সুখ।
বধূ মোর, সুদুঃসহ পতিদুঃখব্যথা
বক্ষে ধরি সতীত্বের লভো সার্থকতা।
রাজগৃহে আয়োজন দিবসযামিনী
সহস্র সুখের— বনে তুমি একাকিনী
সর্বসুখ, সর্বসঙ্গ, সর্বৈশ্বর্যময়,
সকল সান্ত্বনা একা, সকল আশ্রয়—
ক্লান্তির আরাম, শান্তি, ব্যাধির শুশ্রূষা,
দুর্দিনের শুভলক্ষ্মী, তামসীর ভূষা
উষা মূর্তিমতী। তুমি হবে একাকিনী
সর্বপ্রীতি, সর্বসেবা, জননী, গেহিনী—
সতীত্বের শ্বেতপদ্ম সম্পূর্ণ সৌরভে
শত দলে প্রস্ফুটিয়া জাগিবে গৌরবে।

[মাঘ ১৩০৪]

## কর্ণকুন্তীসংবাদ

কর্ণ। পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যাসবিতার
বন্দনায় আছি রত। কর্ণ নাম যার,
অধিরথসূতপুত্র, রাধাগর্ভজাত,
সেই আমি— কহো মোরে তুমি কে গো মাতঃ।

কুন্তী। বৎস, তোর জীবনের প্রথম প্রভাতে
পরিচয় করায়েছি তোরে বিশ্বসাথে,
সেই আমি, আসিয়াছি ছাড়ি সর্ব লাজ
তোরে দিতে আপনার পরিচয় আজ।

কর্ণ। দেবী, তব নতনেত্রকিরণসম্পাতে
চিত্ত বিগলিত মোর, সূর্যকরঘাতে
শৈলতুষারের মতো। তব কণ্ঠস্বর
যেন পূর্বজন্ম হতে পশি কর্ণ-'পর
জাগাইছে অপূর্ব বেদনা। কহো মোরে,
জন্ম মোর বাঁধা আছে কী রহস্যডোরে
তোমা-সাথে হে অপরিচিতা!

কুন্তী। ধৈর্য ধর্
ওরে বৎস, ক্ষণকাল। দেব দিবাকর
আগে যাক অস্তাচলে। সন্ধ্যার তিমির
আসুক নিবিড় হয়ে।— কহি তোরে বীর,
কুন্তী আমি।

কর্ণ। তুমি কুন্তী! অর্জুনজননী!

কুন্তী। অর্জুনজননী বটে, তাই মনে গনি
দ্বেষ করিয়ো না বৎস! আজও মনে পড়ে
অস্ত্রপরীক্ষার দিন হস্তিনানগরে
তুমি ধীরে প্রবেশিলে তরুণ কুমার
রঙ্গস্থলে, নক্ষত্রখচিত পূর্বাশার
প্রান্তদেশে নবোদিত অরুণের মতো।
যবনিকা-অন্তরালে নারী ছিল যত
তার মধ্যে বাক্যহীনা কে সে অভাগিনী
অতৃপ্ত স্নেহক্ষুধার সহস্র নাগিনী
জাগায়ে জর্জর বক্ষে— কাহার নয়ন
তোমার সর্বাঙ্গে দিল আশিসচুম্বন?
অর্জুনজননী সে যে! যবে কৃপ আসি

তোমারে পিতার নাম শুধালেন হাসি,
কহিলেন, 'রাজকুলে জন্ম নহে যার
অর্জুনের সাথে যুদ্ধে নাহি অধিকার'—
আরক্ত আনত মুখে না রহিল বাণী,
দাঁড়ায়ে রহিলে, সেই লজ্জা-আভাখানি
দহিল যাহার বক্ষ অগ্নিসম তেজে
কে সে অভাগিনী ? অর্জুনজননী সে যে।
পুত্র দুর্যোধন ধন্য, তখনি তোমারে
অঙ্গরাজ্যে কৈল অভিষেক। ধন্য তারে।
মোর দুই নেত্র হতে অশ্রুবারিরাশি
উদ্দেশে তোমারি শিরে উচ্ছ্বসিল আসি
অভিষেক-সাথে ! হেনকালে করি পথ
রঙ্গমাঝে পশিলেন সূত অধিরথ
আনন্দবিহ্বল। তখনি সে রাজসাজে
চারি দিকে কুতূহলী জনতার মাঝে
অভিষেকসিক্ত শির লুটায়ে চরণে
সূতবৃদ্ধে প্রণমিলে পিতৃসম্ভাষণে।
ক্রূর হাস্যে পাণ্ডবের বন্ধুগণ সবে
ধিক্কারিল ; সেই ক্ষণে পরম গরবে
বীর বলি যে তোমারে, ওগো বীরমণি,
আশিসিল, আমি সেই অর্জুনজননী।

কর্ণ। প্রণমি তোমারে আর্যে ! রাজমাতা তুমি,
কেন হেথা একাকিনী— এ যে রণভূমি,
আমি কুরুসেনাপতি।

কুন্তী। পুত্র, ভিক্ষা আছে—
বিফল না ফিরি যেন।

কর্ণ। ভিক্ষা, মোর কাছে !
আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া আর
যাহা আজ্ঞা করো দিব চরণে তোমার।

কুন্তী। এসেছি তোমারে নিতে।

কর্ণ। কোথা লবে মোরে !

কুন্তী। তৃষিত বক্ষের মাঝে— লব মাতৃক্রোড়ে।

কর্ণ। পঞ্চপুত্রে ধন্য তুমি, তুমি ভাগ্যবতী—
আমি কুলশীলহীন ক্ষুদ্র নরপতি
মোরে কোথা দিবে স্থান ?

কুন্তী। সর্ব-উচ্চভাগে,

তোমারে বসাব মোর সর্বপুত্র-আগে,
জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি।

কর্ণ। কোন্ অধিকারমদে
প্রবেশ করিব সেথা ? সাম্রাজ্যসম্পদে
বঞ্চিত হয়েছে যারা, মাতৃস্নেহ ধনে
তাহাদের পূর্ণ অংশ খণ্ডিব কেমনে
কহো মোরে। দ্যূতপণে না হয় বিক্রয়,
বাহুবলে নাহি হারে মাতার হৃদয়—
সে যে বিধাতার দান।

কুন্তী। পুত্র মোর ওরে,
বিধাতার অধিকার লয়ে এই ক্রোড়ে
এসেছিলি একদিন— সেই অধিকারে
আয় ফিরে সগৌরবে, আয় নির্বিচারে ;
সকল ভ্রাতার মাঝে মাতৃ-অঙ্কে মম
লহো আপনার স্থান।

কর্ণ। শুনি স্বপ্নসম,
হে দেবী, তোমার বাণী। হেরো অন্ধকার
ব্যাপিয়াছে দিগ্বিদিকে, লুপ্ত চারি ধার—
শব্দহীনা ভাগীরথী। গেছ মোরে লয়ে
কোন্ মায়াচ্ছন্ন লোকে, বিস্মৃত আলয়ে,
চেতনাপ্রত্যুষে ! পুরাতন সত্যসম
তব বাণী স্পর্শিতেছে মুগ্ধ চিত্ত মম।
অস্ফুট শৈশবকাল যেন রে আমার,
যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি। রাজমাতঃ অয়ি,
সত্য হোক স্বপ্ন হোক, এসো স্নেহময়ী,
তোমার দক্ষিণ হস্ত ললাটে চিবুকে
রাখো ক্ষণকাল। শুনিয়াছি লোকমুখে,
জননীর পরিত্যক্ত আমি। কতবার
হেরেছি নিশীথস্বপ্নে, জননী আমার
এসেছেন ধীরে ধীরে দেখিতে আমায়—
কাঁদিয়া কহেছি তাঁরে কাতর ব্যথায়
'জননী, গুণ্ঠন খোলো দেখি তব মুখ'—
অমনি মিলায় মূর্তি তৃষার্ত উৎসুক
স্বপনেরে ছিন্ন করি ! সেই স্বপ্ন আজি
এসেছে কি পাণ্ডবজননীরূপে সাজি

সন্ধ্যাকালে, রণক্ষেত্রে, ভাগীরথীতীরে !
হেরো দেবী, পরপারে পাণ্ডবশিবিরে
জ্বলিয়াছে দীপালোক, এ পারে অদূরে
কৌরবের মন্দুরায় লক্ষ অশ্বখুরে
খর শব্দ উঠিছে বাজিয়া। কালি প্রাতে
আরম্ভ হইবে মহারণ। আজ রাতে
অর্জুনজননীকণ্ঠে কেন শুনিলাম
আমার মাতার স্নেহস্বর ! মোর নাম
তাঁর মুখে কেন হেন মধুর সংগীতে
উঠিল বাজিয়া— চিত্ত মোর আচম্বিতে
পঞ্চপাণ্ডবের পানে 'ভাই' বলে ধায় !

কুন্তী। তবে চলে আয়, বৎস, তবে চলে আয়।

কর্ণ। যাব, মাতঃ, চলে যাব, কিছু শুধাব না—
না করি সংশয় কিছু, না করি ভাবনা।
দেবী, তুমি মোর মাতা। তোমার আহ্বানে
অন্তরাত্মা জাগিয়াছে— নাহি বাজে কানে
যুদ্ধভেরী, জয়শঙ্খ— মিথ্যা মনে হয়
রণহিংসা, বীরখ্যাতি, জয়পরাজয়।
কোথা যাব, লয়ে চলো।

কুন্তী। ওই পরপারে
যেথা জ্বলিতেছে দীপ স্তব্ধ স্কন্ধাবারে
পাণ্ডুর বালুকাতটে।

কর্ণ। হোথা মাতৃহারা
মা পাইবে চিরদিন ! হোথা ধ্রুবতারা
চিররাত্রি রবে জাগি সুন্দর উদার
তোমার নয়নে ! দেবী, কহো আরবার,
আমি পুত্র তব।

কুন্তী। পুত্র মোর !

কর্ণ। কেন তবে
আমারে ফেলিয়া দিলে দূরে অগৌরবে
কুলশীলমানহীন মাতৃনেত্রহীন
অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে ? কেন চিরদিন
ভাসাইয়া দিলে মোরে অবজ্ঞার স্রোতে ?
কেন দিলে নির্বাসন ভ্রাতৃকুল হতে ?
রাখিলে বিচ্ছিন্ন করি অর্জুনে আমারে—
তাই শিশুকাল হতে টানিছে দোঁহারে

নিগূঢ় অদৃশ্য পাশ হিংসার আকারে
দুর্নিবার আকর্ষণে।— মাতঃ, নিরুত্তর ?
লজ্জা তব ভেদ করি অন্ধকার স্তর
পরশ করিছে মোরে সর্বাঙ্গে নীরবে,
মুদিয়া দিতেছে চক্ষু। থাক্, থাক্ তবে।
কহিয়ো না, কেন তুমি ত্যজিলে আমারে।
বিধির প্রথম দান এ বিশ্বসংসারে
মাতৃস্নেহ, কেন সেই দেবতার ধন
আপন সন্তান হতে করিলে হরণ
সে কথার দিয়ো না উত্তর। কহো মোরে,
আজি কেন ফিরাইতে আসিয়াছ ক্রোড়ে।

কুন্তী। হে বৎস, ভর্ৎসনা তোর শতবজ্রসম
বিদীর্ণ করিয়া দিক এ হৃদয় মম
শতখণ্ড করি। ত্যাগ করেছিনু তোরে,
সেই অভিশাপে, পঞ্চপুত্র বক্ষে ক'রে
তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন— তবু হায়,
তোরই লাগি বিশ্বমাঝে বাহু মোর ধায়,
খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে! বঞ্চিত যে ছেলে
তারি তরে চিত্ত মোর দীপ্ত-দীপ জ্বেলে
আপনারে দগ্ধ করি করিছে আরতি
বিশ্বদেবতার। আমি আজি ভাগ্যবতী,
পেয়েছি তোমার দেখা— যবে মুখে তোর
একটি ফুটে নি বাণী তখন কঠোর
অপরাধ করিয়াছি; বৎস, সেই মুখে
ক্ষমা কর্ কুমাতায়। সেই ক্ষমা বুকে
ভর্ৎসনার চেয়ে তেজে জ্বালুক অনল,
পাপ দগ্ধ ক'রে মোরে করুক নির্মল।

কর্ণ। মাতঃ, দেহো পদধূলি, দেহো পদধূলি—
লহো অশ্রু মোর।

কুন্তী। তোরে লব বক্ষে তুলি
সে সুখ-আশায় পুত্র আসি নাই দ্বারে।
ফিরাতে এসেছি তোরে নিজ অধিকারে।
সূতপুত্র নহ তুমি, রাজার সন্তান;
দূর করি দিয়া, বৎস, সর্ব অপমান
এসো চলি যেথা আছে তব পঞ্চ ভ্রাতা।

কর্ণ। মাতঃ, সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা—

তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব।
পাণ্ডব পাণ্ডব থাক্ ; কৌরব কৌরব—
ঈর্ষা নাহি করি কারে।

কুন্তী। রাজ্য আপনার
বাহুবলে করি লহো হে বৎস, উদ্ধার।
দুলাবেন ধবল ব্যজন যুধিষ্ঠির,
ভীম ধরিবেন ছত্র, ধনঞ্জয় বীর
সারথি হবেন রথে, ধৌম্য পুরোহিত
গাহিবেন বেদমন্ত্র— তুমি শত্রুজিৎ
অখণ্ড প্রতাপে রবে বান্ধবের সনে
নিঃসপত্ন রাজ্যমাঝে রত্নসিংহাসনে।

কর্ণ। সিংহাসন! যে ফিরাল মাতৃস্নেহপাশ
তাহারে দিতেছ, মাতঃ, রাজ্যের আশ্বাস!
একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত
সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত।
মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল
এক মুহূর্তেই মাতঃ, করেছ নির্মূল
মোর জন্মক্ষণে। সূতজননীরে ছলি
আজ যদি রাজজননীরে মাতা বলি—
কুরুপতি-কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে
ছিন্ন করে ধাই যদি রাজসিংহাসনে—
তবে, ধিক্ মোরে।

কুন্তী। বীর তুমি, পুত্র মোর,
ধন্য তুমি! হায় ধর্ম, এ কী সুকঠোর
দণ্ড তব! সেইদিন কে জানিত হায়,
ত্যজিলাম যে শিশুরে ক্ষুদ্র অসহায়,
সে কখন বলবীর্য লভি কোথা হতে
ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে,
আপনার জননীর কোলের সন্তানে
আপন নির্মম হস্তে অস্ত্র আসি হানে।
এ কী অভিশাপ!

কর্ণ। মাতঃ, করিয়ো না ভয়।
কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়।
আজি এই রজনীর তিমিরফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধফল। এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে

অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
জয়হীন চেষ্টার সংগীত, আশাহীন
কর্মের উদ্যম— হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম! যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।
জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডবসন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে।
জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন, গৃহহীন— আজিও তেমনি
আমারে নির্মমচিত্তে তেয়াগো, জননী,
দীপ্তিহীন, কীর্তিহীন পরাভব-'পরে।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে—
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।

১৫ ফাল্গুন ১৩০৬

## ভাষা ও ছন্দ

যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়,
মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার
দুঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়া উন্মূল
মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনার কূল-উপকূল,
তট-অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডম্বরু বাজায়ে
ক্ষিপ্ত ধূর্জটির প্রায়, সেইমতো বনানীর ছায়ে
স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে
অপূর্ব উদ্‌বেগভরে সঙ্গীহীন ভ্রমিছেন ফিরে
মহর্ষি বাল্মীকি কবি— রক্তবেগতরঙ্গিত-বুকে
গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারংবার আবর্তিয়া মুখে
নব ছন্দ; বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত
মুহূর্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সংগীত
তারে লয়ে কী করিবে, ভাবে মুনি কী তার উদ্দেশ-
তরুণ গরুড়সম কী মহৎ ক্ষুধার আবেশ
পীড়ন করিছে তারে, কী তাহার দুরন্ত প্রার্থনা,
অমর বিহঙ্গশিশু কোন্ বিশ্বে করিবে রচনা
আপন বিরাট নীড়!— অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয় তার বক্ষে বেদনা অপার,

তার নিত্য জাগরণ ; অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

অস্তে গেল দিনমণি। দেবর্ষি নারদ সন্ধ্যাকালে
শাখাসুপ্ত পাখিদের সচকিয়া জটারশ্মিজালে,
স্বর্গের নন্দনগন্ধে অসময়ে শ্রান্ত মধুকরে
বিস্মিত ব্যাকুল করি উত্তরিলা তপোভূমি-'পরে।
নমস্কার করি কবি শুধাইলা সঁপিয়া আসন,
'কী মহৎ দৈবকার্যে, দেব, তব মর্ত্যে আগমন?'
নারদ কহিলা হাসি, 'করুণার উৎসমুখে, মুনি,
যে ছন্দ উঠিল ঊর্ধ্বে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা তাহা শুনি
আমারে কহিলা ডাকি, যাও তুমি তমসার তীরে,
বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবাণ-বিদ্ধ বাল্মীকিরে
বারেক শুধায়ে এসো, বোলো তারে, ওগো ভাগ্যবান্,
এ মহাসংগীতধন কাহারে করিবে তুমি দান?
এই ছন্দে গাঁথি লয়ে কোন্ দেবতার যশঃকথা
স্বর্গের অমরে কবি মর্ত্যলোকে দিবে অমরতা?'

কহিলেন শির নাড়ি ভাবোন্মত্ত মহামুনিবর,
'দেবতার সামগীতি গাহিতেছে বিশ্বচরাচর,
ভাষাশূন্য, অর্থহারা। বহ্নি ঊর্ধ্বে মেলিয়া অঙ্গুলি
ইঙ্গিতে করিছে স্তব ; সমুদ্র তরঙ্গবাহু তুলি
কী কহিছে স্বর্গ জানে ; অরণ্য উঠায়ে লক্ষ শাখা
মর্মরিছে মহামন্ত্র, ঝটিকা উড়ায়ে রুদ্র পাখা
গাহিছে গর্জনগান ; নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী হতে
অরণ্যের পতঙ্গ অবধি মিলাইছে এক স্রোতে
সংগীতের তরঙ্গিণী বৈকুণ্ঠের শান্তিসিন্ধু-পারে।
মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারি ধারে
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে ;
ধূলি ছাড়ি একেবারে ঊর্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সংগীতের মতন স্বাধীন
মেলি দিয়া সপ্তসুর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।
প্রভাতের শুভ্র ভাষা বাক্যহীন প্রত্যক্ষ কিরণ
জগতের মর্মদ্বার মুহূর্তেকে করি উদ্‌ঘাটন

নির্বারিত করি দেয় ত্রিলোকের গীতের ভাণ্ডার ;
যামিনীর শান্তিবাণী ক্ষণমাত্রে অনন্ত সংসার
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বাক্যহীন পরম নিষেধ
বিশ্বকর্মকোলাহল মন্ত্রবলে করি দিয়া ভেদ
নিমেষে নিবায়ে দেয় সর্ব খেদ, সকল প্রয়াস,
জীবলোক-মাঝে আনে মরণের বিপুল আভাস ;
নক্ষত্রের ধ্রুব ভাষা অনির্বাণ অনলের কণা
জ্যোতিষ্কের সূচীপত্রে আপনার করিছে সূচনা
নিত্যকাল মহাকাশে ; দক্ষিণের সমীরের ভাষা
কেবল নিশ্বাসমাত্রে নিকুঞ্জে জাগায় নব আশা,
দুর্গমপল্লবদুর্গে অরণ্যের ঘন অন্তঃপুরে
নিমেষে প্রবেশ করে, নিয়ে যায় দূর হতে দূরে
যৌবনের জয়গান— সেইমতো প্রত্যক্ষ প্রকাশ
কোথা মানবের বাক্যে, কোথা সেই অনন্ত আভাস,
কোথা সেই অর্থভেদী অভ্রভেদী সংগীত-উচ্ছ্বাস,
আত্মবিদারণকারী মর্মান্তিক মহান্ নিশ্বাস !
মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজ-সম
উদ্দাম-সুন্দর-গতি— সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম।
সূর্যেরে বহিয়া যথা ধায় বেগে দিব্য অগ্নিতরী
মহাব্যোমনীলসিন্ধু প্রতিদিন পারাপার করি
ছন্দ সেই অগ্নিসম বাক্যেরে করিব সমর্পণ—
যাবে চলি মর্ত্যসীমা অবাধে করিয়া সন্তরণ,
গুরুভার পৃথিবীরে টানিয়া লইবে ঊর্ধ্বপানে—
কথারে ভাবের স্বর্গে, মানবেরে দেবপীঠস্থানে।
মহাম্বুধি যেইমতো ধ্বনিহীন স্তব্ধ ধরণীরে
বাঁধিয়াছে চতুর্দিকে অন্তহীন নৃত্যগীতে ঘিরে,
তেমনি আমার ছন্দ ভাষারে ঘেরিয়া আলিঙ্গনে
গাবে যুগে যুগান্তরে সরল গম্ভীর কলস্বনে
দিক হতে দিগন্তরে মহামানবের স্তবগান
ক্ষণস্থায়ী নরজন্মে মহৎ মর্যাদা করি দান।
হে দেবর্ষি, দেবদূত, নিবেদিয়ো পিতামহ-পায়ে,
স্বর্গ হতে যাহা এল স্বর্গে তাহা নিয়ো না ফিরায়ে।
দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে—
তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।

ভগবন্, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে—
কহো মোরে, কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।
কহো মোরে, বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম—
কহো মোরে, সর্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।'

নারদ কহিলা ধীরে, 'অযোধ্যার রঘুপতি রাম।'
'জানি আমি, জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীর্তিকথা।
কহিলা বাল্মীকি, 'তবু, নাহি জানি সমগ্র বারতা,
সকল ঘটনা তাঁর— ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে?
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে।'
নারদ কহিলা হাসি, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।'

এত বলি দেবদূত মিলাইল দিব্যস্বপ্ন-হেন
সুদূর সপ্তর্ষিলোকে। বাল্মীকি বসিলা ধ্যানাসনে,
তমসা রহিল মৌন, স্তব্ধতা জাগিল তপোবনে।

প্র. ভাদ্র ১৩০৫

## বর্ষশেষ

১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্র ঝড়ের দিনে রচিত

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধহারা
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জনছায়া সঞ্চারিয়া
হানি দীর্ঘধারা।

বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন,
চৈত্র অবসান—
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্বশেষ গান।

ধূসরপাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় ঊর্ধ্বমুখে,
ছুটে চলে চাষি,
ত্বরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত
তীরপ্রান্তে আসি।
পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি—
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখি।

বীণাতন্ত্রে হানো হানো খরতর ঝংকারঝঞ্ঝনা,
তোলো উচ্চ সুর,
হৃদয় নির্দয়ঘাতে ঝর্ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ুক
প্রবল প্রচুর।
ধাও গান, প্রাণভরা ঝড়ের মতন ঊর্ধ্ববেগে
অনন্ত আকাশে।
উড়ে যাক, দূরে যাক বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা
বিপুল নিশ্বাসে।

আনন্দে আতঙ্কে মিশি, ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া,
মত্ত হাহারবে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হোক তবে।
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত-আঘাতে
উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।

মুক্ত করি দিনু দ্বার ; আকাশের যত বৃষ্টিঝড়
আয় মোর বুকে—
শঙ্খের মতন তুলি একটি ফুৎকার হানি দাও
হৃদয়ের মুখে।

বিজয়গর্জনস্বনে অভ্র ভেদ করিয়া উঠুক
মঙ্গলনির্ঘোষ,
জাগায়ে জাগ্রত চিত্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্মল
কঠিন সন্তোষ।

সে পূর্ণ উদাত্ত ধ্বনি বেদগাথা সামমন্ত্র-সম
সরল গম্ভীর
সমস্ত অন্তর হতে মুহূর্তে অখণ্ড মূর্তি ধরি
হউক বাহির।
নাহি তাহে দুঃখ সুখ, পুরাতন তাপ পরিতাপ,
কম্প লজ্জা ভয়—
শুধু তাহা সদ্যস্নাত ঋজু শুভ্র মুক্ত জীবনের
জয়ধ্বনিময়।

হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি'
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে—
ব্যাপ্ত করি', লুপ্ত করি', স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘনঘোরস্তূপে।
কোথা হতে আচম্বিতে মুহূর্তেকে দিক্-দিগন্তর
করি অন্তরাল
স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ংকর তোমার সঘন অন্ধকারে
রহো ক্ষণকাল।

তোমার ইঙ্গিত যেন ঘনগূঢ় ভ্রূকুটির তলে
বিদ্যুতে প্রকাশে,
তোমার সংগীত যেন গগনের শত ছিদ্রমুখে
বায়ুগর্জে আসে,
তোমার বর্ষণ যেন পিপাসারে তীব্র তীক্ষ্ণ বেগে
বিদ্ধ করি হানে—
তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর
স্তব্ধ রাত্রি আনে।

এবার আস নি তুমি বসন্তের আবেশহিল্লোলে
পুষ্পদল চুমি,
এবার আস নি তুমি মর্মরিত কূজনে গুঞ্জনে—
ধন্য ধন্য তুমি।

রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ীরাজসম
গর্বিত নির্ভয়—
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম নাহি-বুঝিলাম—
জয় তব জয়।

হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন্‌,
সহজপ্রবল,
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে,
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ—
প্রণমি তোমারে।

তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,
অক্লান্ত অম্লান !
সদ্যোজাত মহাবীর, কী এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জান ।
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
জ্বলদর্চিরেখা—
করজোড়ে চেয়ে আছি ঊর্ধ্বমুখে, পড়িতে জানি না
কী তাহাতে লেখা।

হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন-রণন,
বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান—
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরান।

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক,
গনিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।

মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কারলাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি।

শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি,
লাভক্ষতি টানাটানি, অতিসূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ,
কলহ সংশয়—
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগযুগান্তের।
শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন ক'রে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে,
মহান্ মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে।

তার পরে ফেলে দাও, চূর্ণ করো, যাহা ইচ্ছা তব,
ভগ্ন করো পাখা—
যেখানে নিক্ষেপ কর হৃত পত্র, চ্যুত পুষ্পদল,
ছিন্নভিন্ন শাখা,
ক্ষণিক খেলনা তব, দয়াহীন তব দস্যুতার
লুণ্ঠনাবশেষ—
সেথা মোরে ফেলে দিয়ো অনন্ততমিস্র সেই
বিস্মৃতির দেশ।

নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধারা
বিশ্রামবিহীন,
মেঘের অন্তরপথে অন্ধকার হতে অন্ধকারে
চলে গেল দিন।

শান্ত ঝড়ে, ঝিল্লিরবে, ধরণীর স্নিগ্ধ গন্ধোচ্ছ্বাসে
মুক্ত বাতায়নে
বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করি দিনু অঞ্জলিয়া
নিশীথগগনে।

৩০ চৈত্র ১৩০৫

## চিরনবীনতা

দিনান্তের মুখ চুম্বি রাত্রি ধীরে কয়,
'আমি মৃত্যু, তোর মাতা, নাহি মোরে ভয়।
নব নব জন্মদানে পুরাতন দিন
আমি তোরে করে দিই প্রত্যহ নবীন।'

## ধ্রুব সত্য

আমি বিন্দুমাত্র আলো, মনে হয় তবু—
আমি শুধু আছি, আর কিছু নাই কভু।
পলক পড়িলে দেখি আড়ালে আমার
তুমি আছ, হে অনাদি আদি-অন্ধকার!

## পরিচয়

দয়া বলে, 'কে গো তুমি, মুখে নাই কথা!'
অশ্রুভরা আঁখি বলে, 'আমি কৃতজ্ঞতা।'

## দীনের দান

মরু কহে, 'অধমেরে এত দাও জল,
ফিরে কিছু দিব হেন কী আছে সম্বল!'
মেঘ কহে, 'কিছু নাহি চাই, মরুভূমি,
আমারে দানের সুখ দান করো তুমি।'

## কর্তব্যগ্রহণ

'কে লইবে মোর কার্য' কহে সন্ধ্যারবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, 'স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।'

## হারজিত

ভিমরুলে মৌমাছিতে হল রেষারেষি,
দুজনায় মহাতর্ক শক্তি কার বেশি।
ভিমরুল কহে, 'আছে সহস্র প্রমাণ,
তোমার দংশন নহে আমার সমান।'
মধুকর নিরুত্তর, ছলছল আঁখি ;
বনদেবী কহে তারে কানে-কানে ডাকি,
'কেন, বাছা, নতশির ? এ কথা নিশ্চিত,
বিষে তুমি হার মানো, মধুতে যে জিত।'

## কৃতীর প্রমাদ

টিকি মুণ্ডে চড়ি উঠি কহে ডগা নাড়ি,
'হাত পা প্রত্যেক কাজে ভুল করে ভারি।
হাত পা কহিল হাসি, 'হে অভ্রান্ত চুল,
কাজ করি আমরা যে, তাই করি ভুল।'

## মহতের দুঃখ

সূর্য দুঃখ করি কহে নিন্দা শুনি স্বীয়,
'কী করিলে হব আমি সকলের প্রিয় !'
বিধি কহে, 'ছাড়ো তবে এ সৌর সমাজ,
দু-চারি জনেরে লয়ে করো ক্ষুদ্র কাজ।'

## বিরাম

বিরাম কাজেরই অঙ্গ, এক সাথে গাঁথা—
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।

## জীবন

জন্ম মৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা,
যেমন চলার অঙ্গ পা-তোলা পা-ফেলা।

## অতিবাদ

আজ বসন্তে বিশ্বখাতায়
হিসেব নেইকো পুষ্পে পাতায়,
জগৎ যেন ঝোঁকের মাথায়
সকল কথাই বাড়িয়ে বলে ;
ভুলিয়ে দিয়ে সত্যি মিথ্যে,
ঘুলিয়ে দিয়ে নিত্যানিত্যে,
দু ধারে সব উদার চিত্তে
বিধিবিধান ছাড়িয়ে চলে।
আমারো দ্বার মুক্ত পেয়ে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

প্রিয়ার পুণ্যে হলেম রে আজ
একটা রাতের রাজ্যাধিরাজ,
ভাণ্ডারে আজ করছে বিরাজ
সকলপ্রকার অজস্রত্ব !
কেন রাখব কথার ওজন ?
কৃপণতায় কোন্ প্রয়োজন ?
ছুটুক বাণী যোজন যোজন
উড়িয়ে দিয়ে ষত্ব ণত্ব।

চিত্তদুয়ার মুক্ত করে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

হে প্রেয়সী স্বর্গদূতী,
আমার যত কাব্যপুঁথি
তোমার পায়ে পড়ে স্তুতি,
তোমারি নাম বেড়ায় রটি ;
থাকো হৃদয়-পদ্মটিতে
এক দেবতা আমার চিতে—
চাই নে তোমায় খবর দিতে
আরো আছেন তিরিশ কোটি।
চিত্তদুয়ার মুক্ত করে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

ত্রিভুবনে সবার বাড়া
একলা তুমি সুধার ধারা,
উষার ভালে একটি তারা,
এ জীবনে একটি আলো—
সন্ধ্যাতারা ছিলেন কে কে
সেসব কথা যাব ঢেকে,
সময় বুঝে মানুষ দেখে
তুচ্ছ কথা ভোলাই ভালো।
চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

সত্য থাকুন ধরিত্রীতে
শুষ্ক রুক্ষ ঋষির চিতে,
জ্যামিতি আর বীজগণিতে,
কারো ইথে আপত্তি নেই—
কিন্তু আমার প্রিয়ার কানে
এবং আমার কবির গানে,

পঞ্চশরের পুষ্পবাণে
মিথ্যে থাকুন রাত্রিদিনেই!
চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা!

ওগো সত্য বেঁটেখাটো,
বীণার তন্ত্রী যতই ছাঁটো,
কণ্ঠ আমার যতই আঁটো,
বলব তবু উচ্চসুরে—
আমার প্রিয়ার মুগ্ধ দৃষ্টি
করছে ভুবন নূতন সৃষ্টি,
মুচকি হাসির সুধার বৃষ্টি
চলছে আজি জগৎ জুড়ে।
চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

যদি বল আর বছরে
এই কথাটাই এমনি করে
বলেছিলি, কিন্তু ওরে
শুনেছিলেন আরেক জনে—
জেনো তবে, মূঢ়মত্ত,
আর বসন্তে সেটাই সত্য,
এবারও সেই প্রাচীন তত্ত্ব
ফুটল নূতন চোখের কোণে।
চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

আজ বসন্তে বকুল ফুলে
যে গান বায়ু বেড়ায় বুলে
কাল সকালে যাবে ভুলে—
কোথায় বাতাস, কোথায় সে ফুল!

হে সুন্দরী, তেমনি কবে
এসব কথা ভুলব যবে
মনে রেখো আমায় তবে,
ক্ষমা কোরো আমার সে ভুল।
চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

## মাতাল

ওরে মাতাল, দুয়ার ভেঙে দিয়ে
পথেই যদি করিস মাতামাতি,
থলিঝুলি উজাড় করে ফেলে
যা আছে তোর ফুরাস রাতারাতি,
অশ্লেষাতে যাত্রা করে শুরু
পাঁজিপুঁথি করিস পরিহাস,
অকারণে অকাজ লয়ে ঘাড়ে
অসময়ে অপথ দিয়ে যাস,
হালের দড়ি নিজের হাতে কেটে
পালের 'পরে লাগাস ঝোড়ো হাওয়া,
আমিও, ভাই, তোদের ব্রত লব—
মাতাল হয়ে পাতালপানে ধাওয়া

পাড়ার যত জ্ঞানীগুণীর সাথে
নষ্ট হল দিনের পরে দিন,
অনেক শিখে পক্ক হল মাথা,
অনেক দেখে দৃষ্টি হল ক্ষীণ।
কত কালের কত মন্দ ভালো
বসে বসে কেবল জমা করি,
ফেলা-ছড়া ভাঙা-ছেঁড়ার বোঝা
বুকের মাঝে উঠছে ভরি ভরি—
গুঁড়িয়ে সেসব উড়িয়ে ফেলে দিক
দিক্‌-বিদিকে তোদের ঝোড়ো হাওয়া।

বুঝেছি, ভাই, সুখের মধ্যে সুখ
মাতাল হয়ে পাতালপানে ধাওয়া।

হোক রে সিধা কুটিল দ্বিধা যত,
নেশায় মোরে করুক দিশাহারা,
দানোয় এসে হঠাৎ কেশে ধ'রে
এক দমকে করুক লক্ষ্মীছাড়া!
সংসারেতে সংসারী তো ঢের,
কাজের হাটে অনেক আছে কেজো,
মেলাই আছে মস্তবড়ো লোক—
সঙ্গে তাঁদের অনেক সেজো মেজো,
থাকুন তাঁরা ভবের কাজে লেগে—
লাগুক মোরে সৃষ্টিছাড়া হাওয়া!
বুঝেছি, ভাই, কাজের মধ্যে কাজ
মাতাল হয়ে পাতালপানে ধাওয়া।

শপথ করে দিলাম ছেড়ে আজই
যা আছে মোর বুদ্ধি বিবেচনা,
বিদ্যা যত ফেলব ঝেড়ে-ঝুড়ে
ছেড়ে-ছুড়ে তত্ত্ব-আলোচনা!
স্মৃতির ঝারি উপুড় করে ফেলে
নয়নবারি শূন্য করি দিব,
উচ্ছ্বসিত মদের ফেনা দিয়ে
অট্টহাসি শোধন করি নিব!
ভদ্রলোকের তক্‌মা-তাবিজ ছিঁড়ে
উড়িয়ে দেবে মদোন্মত্ত হাওয়া!
শপথ করে বিপথ-ব্রত নেব—
মাতাল হয়ে পাতালপানে ধাওয়া।

## শাস্ত্র

পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে;
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে।

বনে এত বকুল ফোটে,
গেয়ে মরে কোকিল পাখি,
লতাপাতার অন্তরালে
বড়ো সরস ঢাকাঢাকি!
চাঁপার শাখে চাঁদের আলো,
সে সৃষ্টি কি কেবল মিছে?
এসব যারা বোঝে তারা
পঞ্চাশতের অনেক নীচে!
পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে:
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে।

ঘরের মধ্যে বকাবকি,
নানান মুখে নানা কথা;
হাজার লোকে নজর পাড়ে,
একটুকু নাই বিরলতা।
সময় অল্প, ফুরায় তাও
অরসিকের আনাগোনায়,
ঘন্টা ধরে থাকেন তিনি
সৎপ্রসঙ্গ-আলোচনায়।
হতভাগ্য নবীন যুবা
কাজেই থাকে বনের খোঁজে,
ঘরের মধ্যে মুক্তি যে নেই
এ কথা সে বিশেষ বোঝে।
পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে;
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে

আমরা সবাই নব্যকালের
সভ্য যুবা অনাচারী
মনুর শাস্ত্র শুধরে দিয়ে
নতুন বিধি করব জারি—
বুড়ো থাকুন ঘরের কোণে,
পয়সাকড়ি করুন জমা,

দেখুন বসে বিষয়পত্র,
চালান মামলা-মকদ্দমা ;
ফাগুন মাসে লগ্ন দেখে
যুবারা যাক বনের পথে,
রাত্রি জেগে সাধ্যসাধন,
থাকুক রত কঠিন ব্রতে !
পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে ;
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে।

## বোঝাপড়া

মনেরে আজ কহো যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।
কেউ-বা তোমায় ভালোবাসে
কেউ-বা বাসতে পারে না যে,
কেউ বিকিয়ে আছে কেউ-বা
সিকি পয়সা ধারে না যে,
কতকটা সে স্বভাব তাদের
কতকটা বা তোমারো ভাই,
কতকটা এ ভবের গতিক—
সবার তরে নহে সবাই।
তোমায় কতক ফাঁকি দেবে
তুমিও কতক দেবে ফাঁকি,
তোমার ভোগে কতক পড়বে
পরের ভোগে থাকবে বাকি।
মান্ধাতারই আমল থেকে
চলে আসছে এমনি রকম—
তোমারি কি এমন ভাগ্য
বাঁচিয়ে যাবে সকল জখম।
মনেরে আজ কহো যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বুঝি
এলে সুখের বন্দরেতে,
জলের তলে পাহাড় ছিল
লাগল বুকের অন্দরেতে,
মুহূর্তেকে পাঁজরগুলো
উঠল কেঁপে আর্তরবে—
তাই নিয়ে কি সবার সঙ্গে
ঝগড়া করে মরতে হবে।
ভেসে থাকতে পার যদি
সেইটে সবার চেয়ে শ্রেয়,
না পার তো বিনা বাক্যে
টুপ করিয়া ডুবে যেয়ো।
এটা কিছু অপূর্ব নয়,
ঘটনা সামান্য খুবই—
শঙ্কা যেথায় করে না কেউ
সেইখানে হয় জাহাজডুবি।
মনেরে তাই কহো যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

তোমার মাপে হয় নি সবাই
তুমিও হও নি সবার মাপে,
তুমি মর কারো ঠেলায়
কেউ-বা মরে তোমার চাপে—
তবু ভেবে দেখতে গেলে
এমনি কিসের টানাটানি,
তেমন করে হাত বাড়ালে
সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।
আকাশ তবু সুনীল থাকে,
মধুর ঠেকে ভোরের আলো—
মরণ এলে হঠাৎ দেখি
মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।
যাহার লাগি চক্ষু বুজে
বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর
তাহারে বাদ দিয়েও দেখি
বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।

মনেরে তাই কহো যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

নিজের ছায়া মস্ত করে
অস্তাচলে বসে বসে
আঁধার করে তোল যদি
জীবনখানা নিজের দোষে,
বিধির সঙ্গে বিবাদ করে
নিজের পায়েই কুড়ুল মারো,
দোহাই তবে এ কার্যটা
যত শীঘ্র পারো সারো।
খুব খানিকটে কেঁদেকেটে
অশ্রু ঢেলে ঘড়া-ঘড়া
মনের সঙ্গে এক রকমে
করে নে, ভাই, বোঝাপড়া।
তাহার পরে আঁধার ঘরে
প্রদীপখানি জ্বালিয়ে তোলো।
ভুলে যা, ভাই, কাহার সঙ্গে
কতটুকুন তফাত হল।
মনেরে তাই কহো যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

## ভীরুতা

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
মনে মনে হাসবি কি না
বুঝব কেমন করে।
আপনি হেসে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই—
ঠাট্টা ক'রে ওড়াই, সখী,
নিজের কথাটাই।

হালকা তুমি কর পাছে
হালকা করি, ভাই,
আপন ব্যথাটাই।

সত্য কথা সরলভাবে
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
অবিশ্বাসে হাসবি কি না
বুঝব কেমন করে।
মিথ্যা ছলে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই—
উল্টা করে বলি আমি
সহজ কথাটাই।
ব্যর্থ তুমি কর পাছে
ব্যর্থ করি,ভাই,
আপন ব্যথাটাই।

সোহাগ-ভরা প্রাণের কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
সোহাগ ফিরে পাব কি না
বুঝব কেমন করে।
কঠিন কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই—
গর্বছলে দীর্ঘ করি
নিজের কথাটাই।
ব্যথা পাছে না পাও তুমি
লুকিয়ে রাখি তাই
আপন ব্যথাটাই।

ইচ্ছা করে নীরব হয়ে
রহিব তোর কাছে,
সাহস নাহি পাই।
মুখের 'পরে বুকের কথা
উথলে ওঠে পাছে,

অনেক কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই—
কথার আড়ে আড়াল থাকে
মনের কথাটাই।
তোমায় ব্যথা লাগিয়ে শুধু
জাগিয়ে তুলি, ভাই,
আপন ব্যথাটাই।

ইচ্ছা করি সুদূরে যাই,
না আসি তোর কাছে—
সাহস নাহি পাই।
তোমার কাছে ভীরুতা মোর
প্রকাশ হয় রে পাছে,
কেবল এসে তাই
দেখা দিয়েই যাই—
স্পর্ধাতলে গোপন করি
মনের কথাটাই।
নিত্য তব নেত্রপাতে
জ্বালিয়ে রাখি, ভাই,
আপন ব্যথাটাই।

## ক্ষতিপূরণ

তোমার তরে সবাই মোরে
করছে দোষী
হে প্রেয়সী!
বলছে— কবি তোমার ছবি
আঁকছে গানে,
প্রণয়-গীতি গাচ্ছে নিতি
তোমার কানে,
নেশায় মেতে ছন্দে গেঁথে
তুচ্ছ কথা
ঢাকছে শেষে বাংলাদেশে
উচ্চ কথা।
তোমার তরে সবাই মোরে
করছে দোষী
হে প্রেয়সী।

সে কলঙ্কে নিন্দাপঙ্কে
তিলক টানি
এলেম রানী!
ফেলুক মুছি হাস্যশুচি
তোমার লোচন
বিশ্বসুদ্ধ যতেক ক্রুদ্ধ
সমালোচন।
অনুরক্ত তব ভক্ত
নিন্দিতেরে
করো রক্ষে শীতল বক্ষে
বাহুর ঘেরে।
তাই কলঙ্কে নিন্দাপঙ্কে
তিলক টানি
এলেম রানী।

আমি নাবব মহাকাব্য-
সংরচনে
ছিল মনে—
ঠেকল কখন্ তোমার কাঁকন-
কিঙ্কিনিতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।
আমি নাবব মহাকাব্য-
সংরচনে
ছিল মনে।

হায় রে কোথা যুদ্ধকথা
হৈল গত
স্বপ্নমতো!
পুরাণচিত্র বীরচরিত্র
অষ্টসর্গ
কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড
নয়ন-খড়্গ।

রৈল মাত্র দিবারাত্র
প্রেমের প্রলাপ,
দিলেম ফেলে ভাবীকোলে
কীর্তিকলাপ।
হায় রে কোথা যুদ্ধকথা
হৈল গত
স্বপ্নমত

সেসব ক্ষতি-পূরণ প্রতি
দৃষ্টি রাখি
হরিণ-আঁখি!
লোকের মনে সিংহাসনে
নাইকো দাবি,
তোমার মনোগৃহের কোনো
দাও তো চাবি।
মরার পরে চাই নে ওরে
অমর হতে,
অমর হব আঁখির তব
সুধার স্রোতে।
খ্যাতির ক্ষতি-পূরণ প্রতি
দৃষ্টি রাখি
হরিণ-আঁখি!

## সেকাল

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে
দৈবে হতেম দশম রত্ন
নবরত্নের মালে—
একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে
রাজার কাছে নিতাম চেয়ে
উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে
কানন-ঘেরা বাড়ি।
রেবার তটে চাঁপার তলে
সভা বসত সন্ধ্যা হলে,

ক্রীড়াশৈলে আপনমনে
দিতাম কণ্ঠ ছাড়ি।
জীবনতরী বহে যেত
মন্দাক্রান্তা তালে
আমি যদি জন্ম নিতাম
কালিদাসের কালে।

চিন্তা দিতেম জলাঞ্জলি,
থাকত নাকো ত্বরা—
মৃদুপদে যেতেম, যেন
নাইকো মৃত্যু জরা।
ছটা ঋতু পূর্ণ ক'রে
ঘটত মিলন স্তরে স্তরে,
ছটা সর্গে বার্তা তাহার
রইত কাব্যে গাঁথা।
বিরহদুখ দীর্ঘ হত
তপ্ত অশ্রুনদীর মতো
মন্দগতি চলত রচি
দীর্ঘ করুণ গাথা।
আষাঢ় মাসে মেঘের মতন
মন্থরতায় ভরা
জীবনটাতে থাকত নাকো
কিছুমাত্র ত্বরা।

অশোককুঞ্জ উঠত ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে,
বকুল হত ফুল্ল প্রিয়ার
মুখের মদিরাতে।
প্রিয়সখীর নামগুলি সব
ছন্দ ভরি করিত রব,
রেবার কূলে কলহংসের
কলধ্বনির মতো।
কোনো নামটি মন্দালিকা,
কোনো নামটি চিত্রলিখা,
মঞ্জুলিকা মঞ্জরিণী
ঝংকারিত কত।

আসত তারা কুঞ্জবনে
চৈত্রজ্যোৎস্নারাতে,
অশোকশাখা উঠত ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে।

কুরুবকের পরত চূড়া
কালো কেশের মাঝে,
লীলাকমল রইত হাতে
কী জানি কোন্ কাজে।
অলক সাজত কুন্দফুলে,
শিরীষ পরত কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিত
নবনীপের মালা।
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধুঁয়া দিত কেশে,
লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু
মাখত মুখে বালা।
কালাগুরুর গুরু গন্ধ
লেগে থাকত সাজে,
কুরুবকের পরত মালা
কালো কেশের মাঝে।

কুঙ্কুমেরই পত্রলেখায়
বক্ষ রইত ঢাকা,
আঁচলখানির প্রান্তটিতে
হংসমিথুন আঁকা।
বিরহেতে আষাঢ় মাসে
চেয়ে রইত বঁধুর আশে,
একটি করে পূজার পুষ্পে
দিন গনিত বসে।
বক্ষে তুলি বীণাখানি
গান গাহিতে ভুলত বাণী,
রুক্ষ অলক অশ্রুচোখে
পড়ত খসে খসে।
মিলনরাতে বাজত পায়ে
নূপুরদুটি বাঁকা;

কুঙ্কুমেরই পত্রলেখায়
বক্ষ রইত ঢাকা।

প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত
সাধের শারিকারে,
নাচিয়ে নিত ময়ূরটিরে
কঙ্কণঝংকারে।
কপোতটিরে লয়ে বুকে
সোহাগ করত মুখে মুখে,
সারসীরে খাইয়ে দিত
পদ্মকোরক বহি।
অলক নেড়ে দুলিয়ে বেণী
কথা কইত শৌরসেনী,
বলত সখীর গলা ধরে—
হলা পিয় সহি!
জল সেচিত আলবালে
তরুণ সহকারে,
প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত
সাধের শারিকারে।

নবরত্নের সভার মাঝে
রইতাম একটি টেরে,
দূর হইতে গড় করিতাম
দিঙ্‌নাগাচার্যেরে।
আশা করি নামটা হত
ওরই মধ্যে ভদ্রমতো—
বিশ্বসেন কি দেবদত্ত
কিম্বা বসুভূতি।
স্রগ্ধরা কি মালিনীতে
বিম্বাধরের স্তুতিগীতে
দিতাম রচি দুটি-চারটি
ছোটোখাটো পুঁথি।
ঘরে যেতাম তাড়াতাড়ি
শ্লোকরচনা সেরে;
নবরত্নের সভার মাঝে
রইতাম একটি টেরে।

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে
বন্দী হতেম না-জানি কোন্
মালবিকার জালে।
কোন্ বসন্ত-মহোৎসবে
বেণুবীণার কলরবে
মঞ্জরিত কুঞ্জবনের
গোপন অন্তরালে।
কোন্ ফাগুনের শুক্লনিশায়
যৌবনেরই নবীন নেশায়
চকিতে কার দেখা পেতেম
রাজার চিত্রশালে।
ছল করে তার বাধত আঁচল
সহকারের ডালে—
আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে।

হায় রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল!
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে
লয়ে তারিখ সাল।
হারিয়ে গেছে সেসব অব্দ,
ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ—
গেছে যদি আপদ গেছে,
মিথ্যা কোলাহল।
হায় রে গেল সঙ্গে তারি
সেদিনের সেই পৌরনারী
নিপুণিকা চতুরিকা
মালবিকার দল।
কোন্ স্বর্গে নিয়ে গেল
বরমাল্যের থাল!
হায় রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল।

যাদের সঙ্গে হয় নি মিলন
সেসব বরাঙ্গনা
বিচ্ছেদেরই দুঃখে আমায়
করছে অন্যমনা।

তবু মনে প্রবোধ আছে—
তেমনি বকুল ফোটে গাছে
যদিও সে পায় না নারীর
মুখমদের ছিটা।
ফাগুন মাসে অশোক-ছায়ে
অলস প্রাণে শিথিল গায়ে
দখিন হতে বাতাসটুকু
তেমনি লাগে মিঠা।
অনেক দিকেই যায় যে পাওয়া
অনেকটা সান্ত্বনা,
যদিও রে নাইকো কোথাও
সেসব বরাঙ্গনা।

এখন যাঁরা বর্তমানে
আছেন মর্ত্যলোকে
মন্দ তারা লাগত না কেউ
কালিদাসের চোখে।
পরেন বটে জুতা মোজা,
চলেন বটে সোজা সোজা,
বলেন বটে কথাবার্তা
অন্যদেশীর চালে—
তবু দেখো সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য,
যেমনটি ঠিক দেখা যেত
কালিদাসের কালে।
মরব না, ভাই, নিপুণিকা-
চতুরিকার শোকে—
তাঁরা সবাই অন্য নামে
আছেন মর্ত্যলোকে।

আপাতত এই আনন্দে
গর্বে বেড়াই নেচে—
কালিদাস তো নামেই আছেন,
আমি আছি বেঁচে।
তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ
আমি তো পাই মৃদুমন্দ,

আমার কালের কণামাত্র
পান নি মহাকবি।
বিদুষী এই আছেন যিনি
আমার কালের বিনোদিনী
মহাকবির কল্পনাতে
ছিল না তাঁর ছবি।
প্রিয়ে, তোমার তরুণ আঁখির
প্রসাদ যেচে যেচে
কালিদাসকে হারিয়ে দিয়ে
গর্বে বেড়াই নেচে।

## জন্মান্তর

আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি
সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাই না হতে নববঙ্গে
নবযুগের চালক।
আমি নাই-বা গেলেম বিলাত,
নাই-বা পেলেম রাজার খিলাত,
যদি পরজন্মে পাই রে হতে
ব্রজের রাখাল-বালক—
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে
সুসভ্যতার আলোক।

যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশীবটের তলে,
যারা গুঞ্জা ফুলের মালা গেঁথে
পরে পরায় গলে,
যারা বৃন্দাবনের বনে
সদাই শ্যামের বাঁশি শোনে,
যারা যমুনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে
শীতল কালো জলে—
যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশীবটের তলে।

ওরে বিহান হল, জাগো রে ভাই—
ডাকে পরস্পরে।
ওরে ওই-যে দধি-মন্থ-ধ্বনি
উঠল ঘরে ঘরে।
হেরো মাঠের পথে ধেনু
চলে উড়িয়ে গোখুর-রেণু,
হেরো আঙিনাতে ব্রজের বধূ
দুগ্ধ দোহন করে।
ওরে বিহান হল, জাগো রে ভাই—
ডাকে পরস্পরে।

ওরে শাঙন-মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমালমূলে,
ওরে এপার ওপার আঁধার হল
কালিন্দীরই কূলে।
ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে
কাঁপে খেয়াতরীর 'পরে,
হেরো কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর
কলাপখানি তুলে।
ওরে শাঙন-মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমালমূলে।

মোরা নবনবীন ফাগুন-রাতে
নীল নদীর তীরে
কোথা যাব চলি অশোকবনে,
শিখিপুচ্ছ শিরে।
যবে দোলার ফুলরশি
দিবে নীপশাখায় কষি,
যবে দখিনবায়ে বাঁশির ধ্বনি
উঠবে আকাশ ঘিরে,
মোরা রাখাল মিলে করব মেলা
নীল নদীর তীরে।

আমি হব না, ভাই, নববঙ্গে
নবযুগের চালক,
আমি জ্বালাব না আঁধার দেশে
সুসভ্যতার আলোক—

যদি ননিছানার গাঁয়ে
কোথাও অশোকনীপের ছায়ে
আমি কোনো জন্মে পারি হতে
ব্রজের গোপবালক
তবে চাই না হতে নববঙ্গে
নবযুগের চালক।

## বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

কোন্ বাণিজ্যে নিবাস তোমার
কহো আমায়, ধনী,
তাহা হলে সেই বাণিজ্যের
করব মহাজনি।
দুয়ার জুড়ে কাঙালবেশে
ছায়ার মতো চরণদেশে
কঠিন তব নূপুর ঘেঁষে
আর বসে না রইব।
এটা আমি স্থির বুঝেছি
ভিক্ষা নৈব নৈব।
যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই।

সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি,
বসিয়ে হাজার দাঁড়ি,
কোন্ নগরে যাব দিয়ে
কোন্ সাগরে পাড়ি।
কোন্ তারকা লক্ষ্য করি
কূলকিনারা পরিহরি
কোন্ দিকে যে বাইব তরী
অকূল কালো নীরে।
মরব না আর ব্যর্থ আশায়
বালুমরুর তীরে।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই।

সাগর উঠে তরঙ্গিয়া,
বাতাস বহে বেগে,
সূর্য যেথায় অস্তে নামে
ঝিলিক মারে মেঘে।
দক্ষিণে চাই, উত্তরে চাই—
ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই—
যদি কোথাও কূল নাহি পাই
তল পাব তো তবু।
ভিটার কোণে হতাশ মনে
রইব না'আর কভু।
যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই।

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর-বিহঙ্গেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে
বইছে নগনদী।
সোনার রেণু আনব ভরি
সেথায় নামি যদি।
যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই।

অকূলমাঝে ভাসিয়ে তরী
যাচ্ছি অজানায়।

আমি শুধু একলা নেয়ে
আমার শূন্য নায়।
নব নব পবনভরে
যাব দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ করে
অপূর্ব ধন যত।
ভিখারি তোর ফিরবে যখন
ফিরবে রাজার মতো।
যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই।

## এক গাঁয়ে

আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি
সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ।
তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখি
তাহার গানে আমার নাচে বুক।
তাহার দুটি পালন-করা ভেড়া
চরে বেড়ায় মোদের বটমূলে,
যদি ভাঙে আমার খেতের বেড়া
কোলের 'পরে নিই তাহারে তুলে।
আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে-
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

দুইটি পাড়ায় বড়োই কাছাকাছি,
মাঝে শুধু একটি মাঠের ফাঁক।
তাদের বনের অনেক মধুমাছি
মোদের বনে বাঁধে মধুর চাক।
তাদের ঘাটে পূজার জবামালা
ভেসে আসে মোদের বাঁধাঘাটে,

তাদের পাড়ার কুসুম-ফুলের ডালা
বেচতে আসে মোদের পাড়ার হাটে।
আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে—
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

আমাদের এই গ্রামের গলি-'পরে
আমের বোলে ভরে আমের বন।
তাদের খেতে যখন তিসি ধরে
মোদের খেতে তখন ফোটে শণ।
তাদের ছাদে যখন ওঠে তারা
আমার ছাদে দখিন হাওয়া ছোটে।
তাদের বনে ঝরে শ্রাবণধারা,
আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।
আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে—
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

## উদাসীন

হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি,
ছুটি নে কাহারও পিছুতে ;
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই কিছুতে।
নির্ভয়ে ধাই সুযোগ-কুযোগ বিছুরি,
খেয়াল-খবর রাখি নে তো কোনো-কিছুরই ;
উপরে চড়িতে যদি নাই পাই সুবিধা
সুখে পড়ে থাকি নিচুতেই, থাকি নিচুতে।
হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি
ছুটি নে কাহারও পিছুতে ;
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই কিছুতে।

যেথা-সেথা ধাই যাহা-তাহা পাই
ছাড়ি নেকো ভাই, ছাড়ি নে ;

তাই বলে কিছু কাড়াকাড়ি করে কাড়ি নে।
যাহা যেতে চায় ছেড়ে দিই তারে তখুনি—
বকি নে কারেও, শুনি নে কাহারও বকুনি ;
কথা যত আছে মনের তলায় তলিয়ে
ভুলেও কখনো সহসা তাদের নাড়ি নে।
যেথা-সেথা ধাই যাহা-তাহা পাই
ছাড়ি নেকো ভাই, ছাড়ি নে ;
তাই বলে কিছু তাড়াতাড়ি করে কাড়ি নে।

মন-দেয়া-নেয়া অনেক করেছি,
মরেছি হাজার মরণে ;
নূপুরের মতো বেজেছি চরণে চরণে।
আঘাত করিয়া ফিরেছি দুয়ারে দুয়ারে,
সাধিয়া মরেছি ইঁহারে তাঁহারে উঁহারে,
অশ্রু গাঁথিয়া রচিয়াছি কত মালিকা—
রাঙিয়াছি তাহা হৃদয়শোণিত-বরনে।
মন-দেয়া-নেয়া অনেক করেছি,
মরেছি হাজার মরণে ;
নূপুরের মতো বেজেছি চরণে চরণে।

এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি,
মন ফেলে তাই ছুটেছি ;
তাড়াতাড়ি করে খেলাঘরে এসে জুটেছি।
বুকভাঙা বোঝা নেব না রে আর তুলিয়া,
ভুলিবার যাহা একেবারে যাব ভুলিয়া,
যাঁর বেড়ি তাঁরে ভাঙা বেড়িগুলি ফিরায়ে
বহুদিন পরে মাথা তুলে আজ উঠেছি।
এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি,
মন ফেলে তাই ছুটেছি ;
তাড়াতাড়ি করে খেলাঘরে এসে জুটেছি।

কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত
আগে পড়িত না নয়নে—
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম চয়নে।
মধুকরসম ছিনু সঞ্চয়প্রয়াসী ;
কুসুমকান্তি দেখি নাই, মধুপিয়াসি—

বকুল কেবল দলিত করেছি আলসে
ছিলাম যখন নিলীন বকুলশয়নে।
কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত
আগে পড়িত না নয়নে ;
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম চয়নে।

দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি,
মন নাহি মোর কিছুতে ;
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারই পিছুতে।
সবলে কারেও ধরি নে বাসনামুঠিতে,
দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে ;
যখনি ছেড়েছি উচ্চে উঠার দুরাশা
হাতের নাগালে পেয়েছি সবারে নিচুতে।
দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি,
মন নাহি মোর কিছুতে ;
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারই পিছুতে।

[শিলাইদহ
? ১০ বৈশাখ ১৩০৭]

## নববর্ষা

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে, হৃদয়
নাচে রে।
শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ ;
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে,
ময়ূরের মতো নাচে রে।

গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে, গরজে
গগনে।

ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরী ডাকিছে সঘনে।
গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে, নয়নে
লেগেছে।
নবতৃণদলে ঘনবনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপনিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে।

ওগো, প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে, কবরী
এলায়ে?
ওগো, নবঘন নীলবাসখানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি।
তড়িৎশিখার চকিত আলোকে
ওগো, কে ফিরিছে খেলায়ে।
ওগো, প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে?

ওগো, নদীকূলে তীরতৃণতলে
কে ব'সে অমল বসনে, শ্যামল
বসনে?
সুদূর গগনে কাহারে সে চায়,
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়।
নবমালতীর কচি দলগুলি
আনমনে কাটে দশনে।
ওগো, নদীকূলে তীরতৃণতলে
কে ব'সে শ্যামল বসনে?

ওগো, নির্জনে বকুলশাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে? দোদুল
দুলিছে?
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক,
কবরী খসিয়া খুলিছে।
ওগো, নির্জনে বকুলশাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে?

বিকচকেতকী তটভূমি-'পরে
কে বেঁধেছে তার তরণী, তরুণ
তরণী?
রাশি রাশি তুলি শৈবালদল
ভরিয়া লয়েছে লোল অঞ্চল,
বাদলরাগিণী সজলনয়নে
গাহিছে পরানহরণী।
বিকচকেতকী তটভূমি-'পরে
বেঁধেছে তরুণ তরণী।

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে, হৃদয়
নাচে রে।
ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে,
তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে
এল পল্লীর কাছে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে।

শিলাইদহ
২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

## কৃষ্ণকলি

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে,
মুক্তবেণী পিঠের 'পরে লোটে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

ঘন মেঘে আঁধার হল দেখে
ডাকতেছিল শ্যামল দুটি গাই,
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে
কুটির হতে ত্রস্ত এল তাই।
আকাশপানে হানি যুগল ভুরু
শুনলে বারেক মেঘের গুরুগুরু।
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

পুবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে,
ধানের খেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ।
আলের ধারে দাঁড়িয়েছিলেম একা,
মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।
আমার পানে দেখলে কিনা চেয়ে
আমিই জানি আর জানে সেই মেয়ে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

এমনি করে কালো কাজল মেঘ
জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশানকোণে।
এমনি করে কালো কোমল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমালবনে।
এমনি করে শ্রাবণ-রজনীতে
হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে।

কালো ? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
আর যা বলে বলুক অন্য লোক।
দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
মাথার 'পরে দেয় নি তুলে বাস,
লজ্জা পাবার পায় নি অবকাশ।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

৪ আষাঢ় ১৩০৭

## কর্মফল

পরজন্ম সত্য হলে
কী ঘটে মোর সেটা জানি
আবার আমায় টানবে ধরে
বাংলাদেশের এ রাজধানী।
গদ্যপদ্য লিখনু ফেঁদে,
তারাই আমায় আনবে বেঁধে,
অনেক লেখায় অনেক পাতক—
সে মহাপাপ করব মোচন।
আমায় হয়তো করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

ততদিনে দৈবে যদি
পক্ষপাতী পাঠক থাকে
কর্ণ হবে রক্তবর্ণ
এমনি কটু বলব তাকে।
যে বইখানি পড়বে হাতে
দগ্ধ করব পাতে পাতে,
আমার ভাগ্যে হব আমি
দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন।

আমায় হয়তো করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

বলব, এসব কী পুরাতন!
আগাগোড়া ঠেকছে চুরি—
মনে হচ্ছে আমিও এমন
লিখতে পারি ঝুড়ি ঝুড়ি।
আরো যেসব লিখব কথা
ভাবতে মনে বাজছে ব্যথা
পরজন্মের নিষ্ঠুরতায়
এ জন্মে হয় অনুশোচন।
আমায় হয়তো করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

তোমরা, যাঁদের বাক্য হয় না
আমার পক্ষে মুখরোচক,
তোমরা যদি পুনর্জন্মে
হও পুনর্বার সমালোচক—
আমি আমায় পাড়ব গালি,
তোমরা তখন ভাববে খালি
কলম কষে বসে বসে
প্রতিবাদের প্রতিবচন।
আমায় হয়তো করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

লিখব ইনি কবিসভায়
হংসমধ্যে বকো যথা।
তুমি লিখবে— কোন্ পাষণ্ড
বলে এমন মিথ্যা কথা!
আমি তোমায় বলব— মূঢ়,
তুমি আমায় বলবে রূঢ়,
তার পরে যা লেখালেখি
হবে না সে রুচিরোচন।
তুমি লিখবে কড়া জবাব,
আমি কড়া সমালোচন।

৫ আষাঢ়। ১৩০৭

## কবি

আমি যে বেশ সুখে আছি,
অন্তত নই দুঃখে কৃশ---
সে কথাটা পদ্যে লিখতে
লাগে একটু বিসদৃশ।
সেই কারণে গভীর ভাবে
খুঁজে খুঁজে গভীর চিতে
বেরিয়ে পড়ে গভীর ব্যথা
স্মৃতি কিংবা বিস্মৃতিতে।
কিন্তু সেটা এত সুদূর,
এতই সেটা অধিক গভীর,
আছে কি না আছে তাহার
প্রমাণ দিতে হয় না কবির।
মুখের হাসি থাকে মুখে,
দেহের পুষ্টি পোষে দেহ,
প্রাণের ব্যথা কোথায় থাকে
জানে না সেই খবর কেহ।
কাব্য পড়ে যেমন ভাবো
কবি তেমন নয় গো।
আঁধার করে রাখে নি মুখ,
দিবারাত্র ভাঙছে না বুক,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
হাস্যমুখেই বয় গো।

ভালোবাসে ভদ্রসভায়
ভদ্রপোশাক পরতে অঙ্গে,
ভালোবাসে ফুল্লমুখে
কইতে কথা লোকের সঙ্গে।
বন্ধু যখন ঠাট্টা করে
মরে না সে অর্থ খুঁজে,
ঠিক যে কোথায় হাসতে হবে
একেক সময় দিব্যি বুঝে।
সামনে যখন অন্ন থাকে
থাকে না সে অন্যমনে,

সঙ্গীদলের সাড়া পেলে
রয় না বসে ঘরের কোণে।
বন্ধুরা কয়, লোকটা রসিক—
কয় কি তারা মিথ্যামিথ্যি।
শত্রুরা কয়, লোকটা হালকা—
কিছু কি তার নাইকো ভিত্তি।
কাব্য দেখে যেমন ভাবো
কবি তেমন নয় গো।
চাঁদের পানে চক্ষু তুলে
রয় না পড়ে নদীর কূলে,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
মনের সুখেই বয় গো।

'সুখে আছি' লিখতে গেলে
লোকে বলে— প্রাণটা ক্ষুদ্র!
আশাটা এর নয়কো বিরাট,
পিপাসা এর নয়কো রুদ্র।
পাঠকদলে তুচ্ছ করে,
অনেক কথা বলে কঠোর।
বলে একটু হেসে খেলেই
ভরে যায় এর মনের জঠর।
কবিরে তাই ছন্দে বন্ধে
বানাতে হয় দুখের দলিল।
মিথ্যা যদি হয় সে, তবু
ফেলো পাঠক চোখের সলিল।
তাহার পরে আশিস কোরো
রুদ্ধকণ্ঠে ক্ষুব্ধবুকে,
কবি যেন আজন্মকাল
দুখের কাব্য লেখেন সুখে।
কাব্য যেমন কবি যেন
তেমন নাহি হয় গো।
বুদ্ধি যেন একটু থাকে,
স্নানাহারের নিয়ম রাখে—
সহজ লোকের মতোই যেন
সরল গদ্য কয় গো।

৬ আষাঢ়। ১৩০৭

## আবির্ভাব

বহুদিন হল কোন্ ফাল্গুনে
ছিনু আমি তব ভরসায়,
এলে তুমি ঘন বরষায়।
আজি উত্তাল তুমুল ছন্দে
আজি নবঘনবিপুলমন্দ্রে
আমার পরানে যে গান বাজাবে
সে গান তোমার করো সায়,
আজি জলভরা বরষায়।

দূরে একদিন দেখেছিনু তব
কনকাঞ্চল-আবরণ,
নবচম্পক-আভরণ।
কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘননীল গুণ্ঠন তব,
চলচপলার চকিত চমকে
করিছে চরণ বিচরণ—
কোথা চম্পক-আভরণ।

সেদিন দেখেছি খনে খনে তুমি
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে বনতল,
নুয়ে নুয়ে যেত ফুলদল।
শুনেছিনু যেন মৃদু রিনিরিনি
ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিঙ্কিণী,
পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে
তব নিশ্বাসপরিমল,
ছুঁয়ে যেতে যবে বনতল।

আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল,
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছ আমারে তোমার ছায়ায়
সঘন সজল বিশাল মায়ায়,
আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে

হৃদয়সাগর-উপকূল
চরণে জড়ায়ে বনফুল।

ফাল্গুনে আমি ফুলবনে বসে
গেঁথেছিনু যত ফুলহার
সে নহে তোমার উপহার।
যেথা চলিয়াছ সেথা পিছে পিছে
স্তবগান তব আপনি ধ্বনিছে,
বাজাতে শেখে নি সে গানের সুর
এ ছোটো বীণার ক্ষীণ তার—
এ নহে তোমার উপহার।

কে জানিত সেই ক্ষণিকামুরতি
দূরে করি দিবে বরষন,
মিলাবে চপল দরশন।
কে জানিত মোরে এত দিবে লাজ!
তোমার যোগ্য করি নাই সাজ,
বাসরঘরের দুয়ারে করালে
পূজার অর্ঘ্য বিরচন—
এ কী রূপে দিলে দরশন।

ক্ষমা করো তবে, ক্ষমা করো মোর
আয়োজনহীন পরমাদ—
ক্ষমা করো যত অপরাধ।
এই ক্ষণিকের পাতার কুটিরে
প্রদীপ-আলোকে এসো ধীরে ধীরে
এই বেতসের বাঁশিতে পড়ুক
তব নয়নের পরসাদ—
ক্ষমা করো যত অপরাধ।

আস নাই তুমি নবফাল্গুনে
ছিনু যবে তব ভরসায়—
এসো এসো ভরা বরষায়।
এসো গো গগনে আঁচল লুটায়ে,
এসো গো সকল স্বপন ছুটায়ে,

এ পরান ভরি যে গান বাজাবে
সে গান তোমার করো সায়,
আজি জলভরা বরষায়।

১০ আষাঢ়। ১৩০৭

## একটিমাত্র

গিরিনদী বালির মধ্যে
যাচ্ছে বেঁকে বেঁকে
একটি ধারে স্বচ্ছ ধারায়
শীর্ণ রেখা এঁকে।
মরু-পাহাড়-দেশে
শুষ্ক বনের শেষে
ফিরেছিলেম দুই প্রহরে
দগ্ধ চরণতল—
বনের মধ্যে পেয়েছিলেম
একটি আঙুর ফল।

রৌদ্র তখন মাথার 'পরে,
পায়ের তলায় মাটি
জলের তরে কেঁদে মরে
তৃষায় ফাটি ফাটি।
পাছে ক্ষুধার ভরে
তুলি মুখের 'পরে
আকুল ঘ্রাণে নিই নি তাহার
শীতল পরিমল।
রেখেছিলেম লুকিয়ে আমার
একটি আঙুর ফল।

বেলা যখন পড়ে এল,
রৌদ্র হল রাঙা,
নিশ্বাসিয়া উঠল হুহু
ধূ ধূ বালুর ডাঙা।
থাকতে দিনের আলো
ঘরে ফেরাই ভালো—

তখন খুলে দেখনু চেয়ে
চক্ষে লয়ে জল
মুঠির মাঝে শুকিয়ে আছে
একটি আঙুর ফল।

## তোমার ইঙ্গিতখানি

তোমার ইঙ্গিতখানি দেখি নি যখন
ধূলিমুষ্টি ছিল তারে করিয়া গোপন।

যখনি দেখেছি আজ তখনি পুলকে
নিরখি ভুবনময় আঁধারে আলোকে
জ্বলে সে ইঙ্গিত ; শাখে শাখে ফুলে ফুলে
ফুটে সে ইঙ্গিত ; সমুদ্রের কূলে কূলে
ধরিত্রীর তটে তটে চিহ্ন আঁকি ধায়
ফেনাঙ্কিত তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
দ্রুত সে ইঙ্গিত ; শুভ্রশীর্ষ হিমাদ্রির
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঊর্ধ্বমুখে জাগি রহে স্থির
স্তব্ধ সে ইঙ্গিত।

তখন তোমার পানে
বিমুখ হইয়া ছিনু কী লয়ে কে জানে।

বিপরীত মুখে তারে পড়েছিনু, তাই
বিশ্বজোড়া সে লিপির অর্থ বুঝি নাই।

## বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।

অসংখ্যবন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারংবার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়

জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির-মাঝে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

## এ আমার শরীরের

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্‌বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে— সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে ; বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।
করিতেছে অনুভব সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান।

সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।

## শতাব্দীর সূর্য আজি

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘমাঝে
অস্ত গেল ; হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদরাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী

তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত ; লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম ; প্রলয়মন্থনক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।

কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

## তোমার ন্যায়ের দণ্ড

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে। প্রত্যেকের 'পরে
দিয়েছ শাসনভার হে রাজাধিরাজ !
সে গুরু সম্মান তব, সে দুরূহ কাজ,
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি
সবিনয়ে। তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে।

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজস্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

## এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার,
এই চিরপেষণ-যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারংবার
মনুষ্যমর্যাদাগর্ব চিরপরিহার—

এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গলপ্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোকমাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।

## চিত্ত যেথা ভয়শূন্য

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা— নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—

নিজহস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

## আমি ভালোবাসি দেব

আমি ভালোবাসি, দেব, এই বাঙলার
দিগন্তপ্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার
বিরাজ করিছে নিত্য— মুক্ত নীলাম্বরে
অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে
যে ভৈরবীগান, যে মাধুরী একাকিনী
নদীর নির্জন তটে বাজায় কিঙ্কিণী
তরল কল্লোলরোলে, যে সরল স্নেহ
তরুচ্ছায়া-সাথে মিশি স্নিগ্ধপল্লীগেহ
অঞ্চলে আবরি আছে, যে মোর ভবন
আকাশে বাতাসে আর আলোকে মগন
সন্তোষে কল্যাণে প্রেমে।—

করো আশীর্বাদ,
যখনি তোমার দূত আনিবে সংবাদ
তখনি তোমার কার্যে আনন্দিতমনে
সব ছাড়ি যেতে পারি দুঃখে ও মরণে।

## দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অতি দীর্ঘকাল,
হে ইন্দ্র, হৃদয়ে মম। দিক্‌চক্রবাল
ভয়ংকর শূন্য হেরি, নাই কোনোখানে
সরস সজল রেখা— কেহ নাহি আনে
নববারিবর্ষণের শ্যামল সংবাদ।

যদি ইচ্ছা হয়, দেব, আনো বজ্রনাদ
প্রলয়মুখর হিংস্র ঝটিকার সাথে।
পলে পলে বিদ্যুতের বক্র কশাঘাতে
সচকিত করো মোর দিগ্‌দিগন্তর।
সংহরো সংহরো, প্রভো, নিস্তব্ধ প্রখর
এই রুদ্র, এই ব্যাপ্ত, এ নিঃশব্দ দাহ,
নিঃসহ নৈরাশ্যতাপ। চাহো নাথ, চাহো,
জননী যেমন চাহে সজলনয়ানে
পিতার ক্রোধের দিনে সন্তানের পানে।

## আমার এ মানসের

আমার এ মানসের কানন কাঙাল
শীর্ণ শুষ্ক বাহু মেলি বহু দীর্ঘকাল
আছে ক্রুদ্ধ ঊর্ধ্বপানে চাহি। ওহে নাথ,
এ রুদ্র মধ্যাহ্নমাঝে কবে অকস্মাৎ
পথিক পবন কোন্ দূর হতে এসে
ব্যগ্র শাখাপ্রশাখায় চক্ষের নিমেষে
কানে কানে রটাইবে আনন্দমর্মর,
প্রতীক্ষায় পুলকিয়া বন বনান্তর।

গম্ভীর মাভৈঃমন্দ্র কোথা হতে ব'হে
তোমার প্রসাদপুঞ্জ ঘনসমারোহে
ফেলিবে আচ্ছন্ন করি নিবিড়চ্ছায়ায়।
তার পরে বিপুল বর্ষণ, তার পরে
পরদিন প্রভাতের সৌম্যরবিকরে
রিক্ত মালঞ্চের মাঝে পূজাপুষ্পরাশি
নাহি জানি কোথা হতে উঠিবে বিকাশি।

## একাধারে তুমিই আকাশ

একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
প্রতি ক্ষণে নানা বর্ণে নানা গন্ধে গীতে
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারি ভিতে।
সেথা উষা ডান হাতে ধরি স্বর্ণথালা
নিয়ে আসে একখানি মাধুর্যের মালা
নীরবে পরায়ে দিতে ধরার ললাটে;
সন্ধ্যা আসে নম্রমুখে ধেনুশূন্য মাঠে
চিহ্নহীন পথ দিয়ে লয়ে স্বর্ণঝারি
পশ্চিমসমুদ্র হতে ভরি শান্তিবারি।

তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সঞ্চারক্ষেত্র, সেথা শুভ্র ভাস;
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই— নাই নাই বাণী।

## পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত

পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে,
তব আহ্বান করি সে বহন
পার হয়ে এল পারে।

আজি এ রজনী তিমির-আঁধার,
ভয়ভারাতুর হৃদয় আমার,
তবু দীপ হাতে খুলি দিয়া দ্বার
নমিয়া লইব তারে।
পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে।

পূজিব তাহারে জোড়-কর করি
ব্যাকুল নয়নজলে ;
পূজিব তাহারে পরানের ধন
সঁপিয়া চরণতলে।

আদেশ পালন করিয়া তোমারি
যাবে সে আমার প্রভাত আঁধারি,
শূন্য ভবনে বসি তব পায়ে
অর্পিব আপনারে।
পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে।

## মরণমিলন

অত চুপিচুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো এ কি প্রণয়েরই ধরন !
যবে সন্ধ্যাবেলায় ফুলদল
পড়ে ক্লান্ত বৃন্তে নমিয়া,
যবে ফিরে আসে গোঠে গাভীদল
সারা দিনমান মাঠে ভ্রমিয়া,

তুমি পাশে আসি বস অচপল
ওগো, অতি মৃদুগতি-চরণ।
আমি বুঝি না যে কী যে কথা কও,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

হায় এমনি করে কি ওগো চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
চোখে বিছাইয়া দিবে ঘুমঘোর
করি হৃদিতলে অবতরণ!
তুমি এমনি কি ধীরে দিবে দোল
মোর অবশ বক্ষশোণিতে?
কানে বাজাবে ঘুমের কলরোল
তব কিঙ্কিণী-রনরনিতে?
শেষে পসারিয়া তব হিম-কোল
মোরে স্বপনে করিবে হরণ?
আমি বুঝি না যে কেন আস-যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

কহো মিলনের এ কি রীতি এই,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
তার সমারোহভার কিছু নেই,
নেই কোনো মঙ্গলাচরণ?
তব পিঙ্গলছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না?
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে পিছে কেহ রবে না?
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না রাঙাবরন?
ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ?

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো, মরণ, হে মোর মরণ,
তাঁর কতমতো ছিল আয়োজন,
ছিল কতশত উপকরণ!

তাঁর লটপট করে বাঘছাল,
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।
তাঁর ববম্‌ববম্‌ বাজে গাল,
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

শুনি শ্মশানবাসীর কলকল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল,
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থরথর,
তাঁর হিয়া দুরুদুরু দুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জরজর,
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।
তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর,
ক্ষ্যাপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

তুমি চুরি করি কেন এস চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ?
শুধু নীরবে কখন্ নিশিভোর,
শুধু অশ্রুনিঝর-ঝরন!
তুমি উৎসব করো সারারাত
তব বিজয়শঙ্খ বাজায়ে।
মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি হাত
নব রক্তবসনে সাজায়ে।
তুমি কারে করিয়ো না দৃক্‌পাত,
আমি নিজে লব তব শরণ
যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,

তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ,
কোরো সব লাজ অপহরণ।
যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখশয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধজাগরূক নয়নে,
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ—
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

আমি যাব যেথা তব তরী রয়
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়
করি আঁধারের অনুসরণ।
যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে আকাশে,
যদি বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়
তার উদ্যত ফণা বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়—
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

[ ভাদ্র ১৩০৯ ]

## প্রেম এসেছিল

প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি দ্বার,
আর কভু আসিবে না।
বাকি আছে শুধু আরেক অতিথি আসিবার,
তারি সাথে শেষ চেনা।
সে আসি প্রদীপ নিবাইয়া দিবে একদিন,
তুলি লবে মোরে রথে,
নিয়ে যাবে মোরে গৃহ হতে কোন্ গৃহহীন
গ্রহতারকার পথে।

ততকাল আমি একা বসি রব খুলি দ্বার,
কাজ করি লব শেষ।
দিন হবে যবে আরেক অতিথি আসিবার
পাবে না সে বাধালেশ।
পূজা-আয়োজন সব সারা হবে একদিন,
প্রস্তুত হয়ে রব,
নীরবে বাড়ায়ে বাহুদুটি সেই গৃহহীন
অতিথিরে বরি লব।

যে জন আজিকে ছেড়ে চলে গেল খুলি দ্বার
সেই বলে গেল ডাকি,
'মোছো আঁখিজল, আরেক অতিথি আসিবার
এখনো রয়েছে বাকি।'
সেই বলে গেল, 'গাঁথা সেরে নিয়ো একদিন
জীবনের কাঁটা বাছি—
নবগৃহমাঝে বহি এনো, তুমি গৃহহীন,
পূর্ণ মালিকাগাছি।'

## ভালো তুমি বেসেছিলে

ভালো তুমি বেসেছিলে এই শ্যাম ধরা,
তোমার হাসিটি ছিল বড়ো সুখে ভরা।
মিলি নিখিলের স্রোতে
জেনেছিলে খুশি হতে,
হৃদয়টি ছিল তাই হৃদিপ্রাণহরা।
তোমার আপন ছিল এই শ্যাম ধরা।

আজি এ উদাস মাঠে আকাশ বাহিয়া
তোমার নয়ন যেন ফিরিছে চাহিয়া।
তোমার সে হাসিটুক্‌,
সে চেয়ে দেখার সুখ
সবারে পরশি চলে বিদায় গাহিয়া
এই তালবন গ্রাম প্রান্তর বাহিয়া।

তোমার সে ভালো-লাগা মোর চোখে আঁকি
আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছ রাখি।

আজি আমি একা-একা
দেখি দুজনের দেখা,
তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি—
আমার তারায় তব মুগ্ধদৃষ্টি আঁকি।

এই-যে শীতের আলো শিহরিছে বনে,
শিরীষের পাতাগুলি ঝরিছে পবনে—
তোমার আমার মন
খেলিতেছে সারাক্ষণ
এই ছায়া-আলোকের আকুল কম্পনে,
এই শীতমধ্যাহ্নের মর্মরিত বনে।

আমার জীবনে তুমি বাঁচো, ওগো বাঁচো—
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচো।
যেন আমি বুঝি মনে
অতিশয় সংগোপনে
তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ।
আমারি জীবনে তুমি বাঁচো, ওগো বাঁচো।

১ পৌষ। ১৩০৯

## পাগল বসন্তদিন

পাগল বসন্তদিন কতবার অতিথির বেশে
তোমার আমার দ্বারে বীণা হাতে এসেছিল হেসে
লয়ে তার কত গীত, কত মন্ত্র মন-ভুলাবার—
জাদু করিবার কত পুষ্পপত্র-আয়োজনভার!
কুহুতানে হেঁকে গেছে, 'খোলো ওগো, খোলো দ্বার খোলো।
কাজকর্ম ভোলো আজি, ভোলো বিশ্ব, আপনারে ভোলো।'
এসে এসে কত দিন চলে গেছে দ্বারে দিয়ে নাড়া—
আমি ছিনু কোন্ কাজে, তুমি তারে দাও নাই সাড়া।
আজ তুমি চলে গেছ, সে এল দক্ষিণবায়ু বাহি,
আজ তারে ক্ষণকাল ভুলে থাকি হেন সাধ্য নাহি।
আনিছে সে দৃষ্টি তব, তোমার প্রকাশহীন বাণী,
মর্মরি তুলিছে কুঞ্জে তোমার আকুল চিত্তখানি!

মিলনের দিনে যারে কতবার দিয়েছিনু ফাঁকি,
তোমার বিচ্ছেদ তারে শূন্যঘরে আনে ডাকি ডাকি!

শান্তিনিকেতন
২৫ পৌষ ১৩০৯

## পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরীমৃগসম।
ফাল্গুনরাতে দক্ষিণবায়ে
কোথা দিশা খুঁজে পাই না—
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া
আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকাসম।
বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে
বক্ষে ফিরিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

নিজের গানেরে বাঁধিয়া ধরিতে
চাহে যেন বাঁশি মম
উতলা-পাগলসম।
যারে বাঁধি ধরে তার মাঝে আর
রাগিণী খুঁজিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

## আমি চঞ্চল হে

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসি।
দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে—
ওগো, প্রাণে মনে আমি যে তাহার
পরশ পাবার প্রয়াসী।
আমি সুদূরের পিয়াসি।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই,
সে কথা যে যাই পাশরি।

আমি উৎসুক হে,
হে সুদূর, আমি প্রবাসী।
তুমি দুর্লভ দুরাশার মতো
কী কথা আমায় শুনাও সতত,
তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয়
জেনেছে তাহার স্বভাষী।
হে সুদূর, আমি প্রবাসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—
নাহি জানি পথ, নাহি মোর রথ,
সে কথা যে যাই পাশরি।

আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর, আমি উদাসী।
রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়
তরুমর্মরে ছায়ার খেলায়
কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি!
হে সুদূর, আমি উদাসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার,
সে কথা যে যাই পাশরি।

[মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৯]

## তোমারে পাছে সহজে বুঝি

তোমারে পাছে সহজে বুঝি
তাই কি এত লীলার ছল—
বাহিরে যবে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল।
বুঝি গো আমি বুঝি গো তব
ছলনা—
যে কথা তুমি বলিতে চাও
সে কথা তুমি বল না।

তোমারে পাছে সহজে ধরি
কিছুরই তব কিনারা নাই—
দশের দলে টানি গো পাছে
বিরূপ তুমি বিমুখ তাই।
বুঝি গো আমি বুঝি গো তব
ছলনা—
যে পথে তুমি চলিতে চাও
সে পথে তুমি চল না।

সবার চেয়ে অধিক চাহ,
তাই কি তুমি ফিরিয়া যাও।
হেলার ভরে খেলার মতো
ভিক্ষাঝুলি ভাসায়ে দাও ?
বুঝেছি আমি বুঝেছি তব
ছলনা—
সবার যাহে তৃপ্তি হল
তোমার তাহে হল না।

## হায় গগন নহিলে

'হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা !
ওগো তপন, তোমার স্বপন দেখি যে, করিতে পারি নে সেবা।'
শিশির কহিল কাঁদিয়া,
'তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া,

হে রবি, এমন নাহিকো আমার বল।
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন
কেবলি অশ্রুজল।'
'আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি,
বাসিতে পারি যে ভালো।'
শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া,
'ছোটো হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি,
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
হাসির মতন করি।'

## ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা—
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

## শিশুলীলা

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
অন্তহীন গগনতল
মাথার 'পরে অচঞ্চল,
ফেনিল ওই সুনীল জল
নাচিছে সারা বেলা।

উঠিছে তটে কী কোলাহল—
ছেলেরা করে মেলা।

বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর,
ঝিনুক নিয়ে খেলা।
বিপুল নীল সলিল-'পরি
ভাসায় তারা খেলার তরী
আপন হাতে হেলায় গড়ি
পাতায় গাঁথা ভেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা।

জানে না তারা সাঁতার দেওয়া,
জানে না জাল ফেলা!
ডুবারি ডুবে মুকুতা চেয়ে,
বণিক ধায় তরণী বেয়ে—
ছেলেরা নুড়ি কুড়ায়ে পেয়ে
সাজায় বসি ঢেলা।
রতন ধন খোঁজে না তারা,
জানে না জাল ফেলা।
ফেনিয়ে উঠে সাগর হাসে,
হাসে সাগর-বেলা।
ভীষণ ঢেউ শিশুর কানে
রচিছে গাথা তরল তানে,
দোলনা ধরি যেমন গানে
জননী দেয় ঠেলা।
সাগর খেলে শিশুর সাথে,
হাসে সাগর-বেলা।

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
ঝঞ্ঝা ফিরে গগনতলে,
তরণী ডুবে সুদূর জলে,
মরণদূত উড়িয়া চলে—
ছেলেরা করে খেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
শিশুর মহামেলা।

[আলমোড়া। ৬ ভাদ্র ১৩১০]

## মাতৃবৎসল

মেঘের মধ্যে মা গো, যারা থাকে
তারা আমায় ডাকে আমায় ডাকে।
বলে, 'আমরা কেবল করি খেলা
সকাল থেকে দুপুর সন্ধেবেলা।
সোনার খেলা খেলি আমরা ভোরে,
রুপোর খেলা খেলি চাঁদকে ধরে।'
আমি বলি, 'যাব কেমন করে?'
তারা বলে, 'এসো মাঠের শেষে।
সেইখানেতে দাঁড়াবে হাত তুলে,
আমরা তোমায় নেব মেঘের দেশে।'
আমি বলি, 'মা যে আমার ঘরে
বসে আছে চেয়ে আমার তরে,
তারে ছেড়ে থাকব কেমন করে?'
শুনে তারা হেসে যায় মা, ভেসে।
তার চেয়ে মা, আমি হব মেঘ,
তুমি যেন হবে আমার চাঁদ—
দু হাত দিয়ে ফেলব তোমায় ঢেকে,
আকাশ হবে এই আমাদের ছাদ।

ঢেউয়ের মধ্যে, মা গো, যারা থাকে
তারা আমায় ডাকে আমায় ডাকে।
বলে, 'আমরা কেবল করি গান
সকাল থেকে সকল দিনমান।'
তারা বলে, 'কোন্ দেশে যে ভাই,
আমরা চলি ঠিকানা তার নাই।'
আমি বলি, 'কেমন করে যাই!'
তারা বলে, 'এসো ঘাটের শেষে।
সেইখানেতে দাঁড়াবে চোখ বুজে,
আমরা তোমায় নেব ঢেউয়ের দেশে।'
আমি বলি, 'মা যে চেয়ে থাকে,
সন্ধে হলে নাম ধরে মোর ডাকে,
কেমন করে ছেড়ে থাকব তাকে।'
শুনে তারা হেসে যায় মা, ভেসে।

তার চেয়ে মা, আমি হব ঢেউ,
তুমি হবে অনেক দূরের দেশ—
লুটিয়ে আমি পড়ব তোমার কোলে,
কেউ আমাদের পাবে না উদ্দেশ।

## শেষ খেয়া

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটাপরা ওই ছায়া
ভুলাল রে ভুলাল মোর প্রাণ।
ও পারেতে সোনার কূলে আঁধার মূলে কোন্ মায়া
গেয়ে গেল কাজভাঙানো গান।
নামিয়ে মুখ চুকিয়ে সুখ যাবার মুখে যায় যারা
ফেরার পথে ফিরেও নাহি চায়,
তাদের পানে ভাঁটার টানে যাব রে আজ ঘরছাড়া—
সন্ধ্যা আসে, দিন যে চলে যায়।
ওরে আয়,
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনশেষের শেষ খেয়ায়।

সাঁঝের বেলা ভাঁটার স্রোতে ও পার হতে একটানা
একটি দুটি যায় যে তরী ভেসে—
কেমন করে চিনব, ওরে, ওদের মাঝে কোন্‌খানা
আমার ঘাটে ছিল আমার দেশে।
অস্তাচলে তীরের তলে ঘন গাছের কোল ঘেঁষে
ছায়ায় যেন ছায়ার মতো যায়—
ডাকলে আমি ক্ষণেক থামি হেথায় পাড়ি ধরবে সে
এমন নেয়ে আছে রে কোন্ নায়!
ওরে আয়,
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনশেষের শেষ খেয়ায়।

ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে,
পারে যারা যাবার গেছে পারে।
ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।

ফুলের বাহার নাইকো যাহার, ফসল যাহার ফলল না,
অশ্রু যাহার ফেলতে হাসি পায়—
দিনের আলো যার ফুরাল, সাঁঝের আলো জ্বলল না,
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায় !
ওরে আয়,
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলাশেষের শেষ খেয়ায়।

আষাঢ় ১৩১২

## শুভক্ষণ

ওগো মা,
রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে
রহিব বলো কী মতে !
বলে দে আমায় কী করিব সাজ
কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে
কোন্ বরনের বাস।

মা গো, কী হল তোমার, অবাক নয়নে
মুখপানে কেন চাস্ ?
আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়নকোণে
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ,
যাবে সে সুদূর পুরে—
শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন্ মাঠ হতে
বাজিবে ব্যাকুল সুরে।

তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে,
শুধু সে-নিমেষ-লাগি না করিয়া বেশ
রহিব বলো কী মতে !

## ত্যাগ

ওগো মা,
রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখপথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণশিখর রথে,
ঘোমটা খসায়ে বাতায়ন থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি, মা, দেখে--
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধুলার 'পরে।

মা গো, কী হল তোমার, অবাক নয়নে
চাহিস কিসের তরে?
মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে,
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কী দিলেম কারে জানে না সে কেউ,
ধুলায় রহিল ঢাকা।

তবু রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখপথে—
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বলো কী মতে!

বোলপুর
১৩ শ্রাবণ ১৩১২

## অনাবশ্যক

কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে
আমি তারে জিজ্ঞাসিলাম ডেকে,
'একলা পথে কে তুমি যাও ধীরে
আঁচল-আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে?

আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা,
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।'
গোধূলিতে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেকতরে আমার মুখে তুলে
সে কহিল, 'ভাসিয়ে দেব আলো,
দিনের শেষে তাই এসেছি কূলে।'
চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে কাশের বনে,
প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে।

ভরা সাঁঝে আঁধার হয়ে এলে
আমি ডেকে জিজ্ঞাসিলাম তারে,
'তোমার ঘরে সকল আলো জ্বেলে
এ দীপখানি সঁপিতে যাও কারে?
আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা,
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।'
আমার মুখে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেকতরে রইল চেয়ে ভুলে—
সে কহিল, 'আমার এ-যে আলো
আকাশপ্রদীপ শূন্যে দিব তুলে।'
চেয়ে দেখি, শূন্য গগনকোণে
প্রদীপখানি জ্বলে অকারণে।

অমাবস্যা আঁধার দুই পহরে
জিজ্ঞাসিলাম তাহার কাছে গিয়ে,
'ওগো, তুমি চলেছ কার তরে
প্রদীপখানি বুকের কাছে নিয়ে?
আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা,
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।'
অন্ধকারে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক মোরে দেখল চেয়ে তবে—
সে কহিল, 'এনেছি এই আলো,
দীপালিতে সাজিয়ে দিতে হবে।'
চেয়ে দেখি, লক্ষ দীপের সনে
দীপখানি তার জ্বলে অকারণে।

বোলপুর
২৫ শ্রাবণ ১৩১২

## আগমন

তখন রাত্রি আঁধার হল,
সাঙ্গ হল কাজ—
আমরা মনে ভেবেছিলেম,
আসবে না কেউ আজ।
মোদের গ্রামে দুয়ার যত
রুদ্ধ হল রাতের মতো ;
দু-এক জনে বলেছিল,
'আসবে মহারাজ।'
আমরা হেসে বলেছিলেম,
'আসবে না কেউ আজ।'
দ্বারে যেন আঘাত হল
শুনেছিলেম সবে—
আমরা তখন বলেছিলেম,
'বাতাস বুঝি হবে।'
নিবিয়ে প্রদীপ ঘরে ঘরে
শুয়েছিলেম আলসভরে ;
দু-এক জনে বলেছিল,
'দূত এল বা তবে!'
আমরা হেসে বলেছিলেম,
'বাতাস বুঝি হবে।'

নিশীথরাতে শোনা গেল
কিসের যেন ধ্বনি—
ঘুমের ঘোরে ভেবেছিলেম
মেঘের গরজনি।
ক্ষণে ক্ষণে চেতন করি
কাঁপল ধরা থরহরি,
দু-এক জনে বলেছিল
'চাকার ঝনঝনি'।
ঘুমের ঘোরে কহি মোরা
'মেঘের গরজনি'।
তখনো রাত আঁধার আছে,
বেজে উঠল ভেরী—

কে ফুকারে, 'জাগো সবাই,
আর কোরো না দেরি।'
বক্ষ-'পরে দু হাত চেপে
আমরা ভয়ে উঠি কেঁপে ;
দু-এক জনে কহে কানে,
'রাজার ধ্বজা হেরি।'
আমরা জেগে উঠে বলি,
'আর তবে নয় দেরি।'

কোথায় আলো, কোথায় মাল্য,
কোথায় আয়োজন !
রাজা আমার দেশে এল,
কোথায় সিংহাসন !
হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা—
কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা !
দু-এক জনে কহে কানে,
'বৃথা এ ক্রন্দন—
রিক্তকরে শূন্য ঘরে
করো অভ্যর্থন।'

ওরে, দুয়ার খুলে দে রে,
বাজা শঙ্খ বাজা !
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরই ঝিলিক ঝলে,
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা—
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখরাতের রাজা

কলকাতা। ২৮ শ্রাবণ ১৩১২

## দান

ভেবেছিলাম চেয়ে নেব—
চাই নি সাহস করে
সন্ধেবেলায় যে মালাটি
গলায় ছিলে পরে—

আমি চাই নি সাহস করে।
ভেবেছিলাম সকাল হলে
যখন পারে যাবে চলে
ছিন্ন মালা শয্যাতলে
রইবে বুঝি পড়ে।
তাই আমি কাঙালের মতো
এসেছিলেম ভোরে—
তবু চাই নি সাহস করে।

এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
বজ্র-হেন ভারী—
এ যে তোমার তরবারি।
তরুণ আলো জানলা বেয়ে
পড়ল তোমার শয়ন ছেয়ে,
ভোরের পাখি শুধায় গেয়ে,
'কী পেলি তুই নারী?'
নয় এ মালা, নয় এ থালা,
গন্ধজলের ঝারি—
এ যে ভীষণ তরবারি।

তাই তো আমি ভাবি বসে
এ কী তোমার দান!
কোথায় এরে লুকিয়ে রাখি
নাই যে হেন স্থান।
ওগো, এ কী তোমার দান!
শক্তিহীনা মরি লাজে,
এ ভূষণ কি আমায় সাজে!
রাখতে গেলে বুকের মাঝে
ব্যথা যে পায় প্রাণ।
তবু আমি বইব বুকে
এই বেদনার মান—
নিয়ে তোমারি এই দান।

আজকে হতে জগৎমাঝে
ছাড়ব আমি ভয়,

আজ হতে মোর সকল কাজে
তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়ব সকল ভয়।
মরণকে মোর দোসর করে
রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তারে বরণ করে
রাখব পরানময়।
তোমার তরবারি আমার
করবে বাঁধন ক্ষয়—
আমি ছাড়ব সকল ভয়।

তোমার লাগি অঙ্গ ভরি
করব না আর সাজ।
নাইবা তুমি ফিরে এলে
ওগো হৃদয়রাজ।
আমি করব না আর সাজ।
ধুলায় বসে তোমার তরে
কাঁদব না আর একলা ঘরে,
তোমার লাগি ঘরেপরে
মানব না আর লাজ।
তোমার তরবারি আমায়
সাজিয়ে দিল আজ—
আমি করব না আর সাজ।

গিরিডি
২৬ ভাদ্র ১৩১২

## মিলন

আমি কেমন করিয়া জানাব আমার
জুড়াল হৃদয় জুড়াল, আমার
জুড়াল হৃদয় প্রভাতে!
আমি কেমন করিয়া জানাব, আমার
পরান কী নিধি কুড়াল, ডুবিয়া
নিবিড় নীরব শোভাতে!

আজ গিয়েছি সবার মাঝারে, সেথায়
দেখেছি একেলা আলোকে, দেখেছি
আমার হৃদয়রাজারে।
আমি দু-একটি কথা কয়েছি তা-সনে
সে নীরব সভা-মাঝারে, দেখেছি
চিরজনমের রাজারে।

ওগো, সে কি মোরে শুধু দেখেছিল চেয়ে
অথবা জুড়াল পরশে, তাহার
কমলকরের পরশে—
আমি সে কথা সকলই গিয়েছি যে ভুলে
ভুলেছি পরম হরযে।
আমি জানি না কী হল, শুধু এই জানি
চোখে মোর সুখ মাখাল, কে যেন
সুখ-অঞ্জন মাখাল—
কার আঁখিভরা হাসি উঠিল প্রকাশি
যে দিকেই আঁখি তাকাল।

আজ মনে হল কারে পেয়েছি, কারে যে
পেয়েছি সে কথা জানি না।
আজ কী লাগি উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
সারা আকাশের আঙিনা কিসে যে
পুরেছে শূন্য জানি না।
এই বাতাস আমারে হৃদয়ে লয়েছে—
আলোক আমার তনুতে, কেমনে
মিলে গেছে মোর তনুতে—
তাই এ গগনভরা প্রভাত পশিল
আমার অণুতে অণুতে।

আজ ত্রিভুবনজোড়া কাহার বক্ষে
দেহমন মোর ফুরাল, যেন রে
নিঃশেষে আজি ফুরাল—
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরই মাঝে
জুড়াল জীবন জুড়াল, আমার
আদি ও অন্ত জুড়াল।

শিলাইদহ। 'পদ্মা' ২৩ মাঘ ১৩১২

## কৃপণ

আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম
গ্রামের পথে পথে,
তুমি তখন চলেছিলে
তোমার স্বর্ণরথে।
অপূর্ব এক স্বপ্নসম
লাগতেছিল চক্ষে মম—
কী বিচিত্র শোভা তোমার,
কী বিচিত্র সাজ!
আমি মনে ভাবতেছিলেম,
এ কোন্ মহারাজ!

আজি শুভক্ষণে রাত পোহাল—
ভেবেছিলেম, তবে
আজ আমারে দ্বারে দ্বারে
ফিরতে নাহি হবে।
বাহির হতে নাহি হতে
কাহার দেখা পেলেম পথে,
চলিতে রথ ধনধান্য
ছড়াবে দুই ধারে—
মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব,
নেব ভারে ভারে।

দেখি সহসা রথ থেমে গেল
আমার কাছে এসে,
আমার মুখপানে চেয়ে
নামলে তুমি হেসে।
দেখে মুখের প্রসন্নতা
জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা,
হেনকালে কিসের লাগি
তুমি অকস্মাৎ
'আমায় কিছু দাও গো' বলে
বাড়িয়ে দিলে হাত!

মরি, এ কী কথা রাজাধিরাজ—
'আমায় দাও গো কিছু'!

শুনে ক্ষণকালের তরে
রইনু মাথানিচু।
তোমার কী বা অভাব আছে
ভিখারি ভিক্ষুকের কাছে!
এ কেবল কৌতুকের বশে
আমায় প্রবঞ্চনা!
ঝুলি হতে দিলেম তুলে
একটি ছোটো কণা।

যবে পাত্রখানি ঘরে এনে
উজাড় করি— এ কী!
ভিক্ষামাঝে একটি ছোটো
সোনার কণা দেখি।
দিলেম যা রাজভিখারিরে
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে,
তখন কাঁদি চোখের জলে
দুটি নয়ন ভ'রে—
তোমায় কেন দিই নি আমার
সকল শূন্য ক'রে!

কলকাতা
৮ চৈত্র [১৩১২]

## কুয়ার ধারে

তোমার কাছে চাই নি কিছু,
জানাই নি মোর নাম!
তুমি যখন বিদায় নিলে
নীরব রহিলাম।

একলা ছিলেম কুয়ার ধারে
নিমের ছায়াতলে,
কলস নিয়ে সবাই তখন
পাড়ায় গেছে চলে।
আমায় তারা ডেকে গেল,
'আয় গো বেলা যায়।'

কোন্ আলসে রইনু বসে
কিসের ভাবনায়!

পদধ্বনি শুনি নাইকো
কখন্ তুমি এলে।
কইলে কথা ক্লান্ত কণ্ঠে
করুণ চক্ষু মেলে
'তৃষাকাতর পান্থ আমি'—
শুনে চম্‌কে উঠে
জলের ধারা দিলেম ঢেলে
তোমার করপুটে।
মর্মরিয়া কাঁপে পাতা,
কোকিল কোথা ডাকে,
বাবলা ফুলের গন্ধ ওঠে
পল্লীপথের বাঁকে।

যখন তুমি শুধালে নাম
পেলেম বড়ো লাজ—
তোমার মনে থাকার মতো
করেছি কোন্ কাজ!
তোমায় দিতে পেরেছিলেম
একটু তৃষার জল,
এই কথাটি আমার মনে
রহিল সম্বল।
কুয়ার ধারে দুপুরবেলা
তেমনি ডাকে পাখি,
তেমনি কাঁপে নিমের পাতা—
আমি বসেই থাকি।

৯ চৈত্র ১৩১২

## ফুল ফোটানো

তোরা কেউ পারবি নে গো,
পারবি নে ফুল ফোটাতে।
যতই বলিস, যতই করিস,
যতই তারে তুলে ধরিস,
ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন
আঘাত করিস বোঁটাতে—
তোরা কেউ পারবি নে গো,
পারবি নে ফুল ফোটাতে।

দৃষ্টি দিয়ে বারে বারে
ম্লান করতে পারিস তারে,
ছিঁড়তে পারিস দলগুলি তার,
ধুলায় পারিস লোটাতে—
তোদের বিষম গণ্ডগোলে
যদিই বা সে মুখটি খোলে
ধরবে না রঙ, পারবে না তার
গন্ধটুকু ছোটাতে।
তোরা কেউ পারবি নে গো,
পারবি নে ফুল ফোটাতে।

যে পারে সে আপনি পারে,
পারে সে ফুল ফোটাতে।
সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে,
অমনি যেন পূর্ণপ্রাণের
মন্ত্র লাগে বোঁটাতে।
যে পারে সে আপনি পারে,
পারে সে ফুল ফোটাতে।

নিশ্বাসে তার নিমেষেতে
ফুল যেন চায় উড়ে যেতে,
পাতার পাখা মেলে দিয়ে
হাওয়ায় থাকে লোটাতে।

রঙ যে ফুটে ওঠে কত
প্রাণের ব্যাকুলতার মতো,
যেন কারে আনতে ডেকে
গন্ধ থাকে ছোটাতে।
যে পারে সে আপনি পারে,
পারে সে ফুল ফোটাতে।

বোলপুর
১১ চৈত্র [১৩১২]

## বিদায়

বিদায় দেহো, ক্ষমো আমায় ভাই—
কাজের পথে আমি তো আর নাই।
এগিয়ে সবে যাও-না দলে দলে,
জয়মাল্য লও-না তুলি গলে,
আমি এখন বনচ্ছায়াতলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই।
তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই।

অনেক দূরে এলেম সাথে সাথে,
চলেছিলেম সবাই হাতে হাতে—
এইখানেতে দুটি পথের মোড়ে
হিয়া আমার উঠল কেমন করে
জানি নে কোন্ ফুলের গন্ধঘোরে
সৃষ্টিছাড়া ব্যাকুল বেদনাতে।
আর তো চলা হয় না সাথে সাথে।

তোমরা আজি ছুটেছ যার পাছে
সেসব মিছে হয়েছে মোর কাছে—
রত্ন খোঁজা, রাজ্যভাঙাগড়া,
মতের লাগি দেশবিদেশে লড়া,
আলবালে জলসেচন করা
উচ্চশাখা স্বর্ণচাঁপার গাছে।
পারি নে আর চলতে সবার পাছে।

আকাশ ছেয়ে মনভোলানো হাসি
আমার প্রাণে বাজাল আজ বাঁশি।
লাগল আলস পথে চলার মাঝে,
হঠাৎ বাধা পড়ল সকল কাজে,
একটি কথা পরান জুড়ে বাজে
'ভালোবাসি হায় রে ভালোবাসি'---
সবার বড়ো হৃদয়হরা হাসি।

তোমরা তবে বিদায় দেহো মোরে—
অকাজ আমি নিয়েছি সাধ করে।
মেঘের পথের পথিক আমি আজি,
হাওয়ার মুখে চলে যেতেই রাজি,
অকূলভাসা তরীর আমি মাঝি
বেড়াই ঘুরে অকারণের ঘোরে।
তোমরা সবে বিদায় দেহো মোরে।

বোলপুর
১৪ চৈত্র ১৩১২

## হারাধন

বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন
সৃষ্টি করার কাজে
সকল তারা উঠল ফুটে
নীল আকাশের মাঝে।
নবীন সৃষ্টি সামনে রেখে
সুরসভার তলে
ছায়াপথে দেব্‌তা সবাই
বসেন দলে দলে।
গাহেন তাঁরা, 'কী আনন্দ!
এ কী পূর্ণ ছবি।
এ কী মন্ত্র, এ কী ছন্দ—
গ্রহ চন্দ্র রবি!'

হেনকালে সভায় কে গো
হঠাৎ বলি উঠে,

'জ্যোতির মালায় একটি তারা
কোথায় গেছে টুটে!'
ছিঁড়ে গেল বীণার তন্ত্রী,
থেমে গেল গান—
হারা তারা কোথায় গেল
পড়িল সন্ধান।
সবাই বলে, 'সেই তারাতেই
স্বর্গ হত আলো—
সেই তারাটাই সবার বড়ো,
সবার চেয়ে ভালো।'

সে দিন হতে জগৎ আছে
সেই তারাটির খোঁজে—
তৃপ্তি নাহি দিনে, রাত্রে
চক্ষু নাহি বোজে।
সবাই বলে, 'সকল চেয়ে
তারেই পাওয়া চাই।'
সবাই বলে, 'সে গিয়েছে,
ভুবন কানা তাই।'
শুধু গভীর রাত্রিবেলায়
স্তব্ধ তারার দলে
'মিথ্যা খোঁজা, সবাই আছে'
নীরব হেসে বলে।

বোলপুর
১০ আষাঢ় ১৩১৩

## কোথায় আলো

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো!
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।
রয়েছে দীপ, না আছে শিখা,
এই কি ভালে ছিল রে লিখা—
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো।

বেদনাদূতী গাহিছে, 'ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।
নিশীথে ঘন অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।'

গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি,
বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি।
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরান মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি।
বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি।

বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে,
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।
জানি না কোথা অনেক দূরে
বাজিল গান গভীর সুরে,
সকল প্রাণ টানিছে পথপানে।
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো!
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।
ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া—
সময় গেলে হবে না যাওয়া,
নিবিড় নিশা নিকষঘন কালো।
পরান দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো।

বোলপুর
আষাঢ় ১৩১৬

## শ্রাবণঘন-গহন-মোহে

আজি শ্রাবণঘন-গহন-মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।
প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি,
বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি,
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি
নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে।

কূজনহীন কাননভূমি,
দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে—
একেলা কোন্ পথিক তুমি
পথিকহীন পথের 'পরে।
হে একা সখা, হে প্রিয়তম,
রয়েছে খোলা এ ঘর মম,
সমুখ দিয়ে স্বপনসম
যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে।

বোলপুর
আষাঢ় ১৩১৬

## পারবি না কি যোগ দিতে

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে,
খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙবারই আনন্দে রে।
পাতিয়া কান শুনিস না যে
দিকে দিকে গগনমাঝে
মরণবীণায় কী সুর বাজে
তপন-তারা-চন্দ্রে রে
জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে
জ্বলবারই আনন্দে রে।

পাগলকরা গানের তানে
ধায় যে কোথা কেইবা জানে,

চায় না ফিরে পিছনপানে,
রয় না বাঁধা বন্ধে রে
লুটে যাবার ছুটে যাবার
চলবারই আনন্দে রে।
সেই আনন্দ-চরণপাতে
ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,
প্লাবন বহে যায় ধরাতে
বরন গীতে গন্ধে রে
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার
মরবারই আনন্দে রে।

বোলপুর
১৮ ভাদ্র ১৩১৬

## আকাশতলে উঠল ফুটে

আকাশতলে উঠল ফুটে
আলোর শতদল।
পাপড়িগুলি থরে থরে
ছড়াল দিক্‌-দিগন্তরে,
ঢেকে গেল অন্ধকারের
নিবিড় কালো জল।
মাঝখানেতে সোনার কোষে
আনন্দে, ভাই, আছি বসে—
আমায় ঘিরে ছড়ায় ধীরে
আলোর শতদল।

আকাশেতে ঢেউ দিয়ে রে
বাতাস বহে যায়।
চার দিকে গান বেজে ওঠে,
চার দিকে প্রাণ নাচে ছোটে,
গগনভরা পরশখানি
লাগে সকল গায়।
ডুব দিয়ে এই প্রাণসাগরে
নিতেছি প্রাণ বক্ষ ভরে,
ফিরে ফিরে আমায় ঘিরে
বাতাস বহে যায়।

দশ দিকেতে আঁচল পেতে
কোল দিয়েছে মাটি।
রয়েছে জীব যে যেখানে
সকলকে সে ডেকে আনে,
সবার হাতে সবার পাতে
অন্ন সে দেয় বাঁটি।
ভরেছে মন গীতে গন্ধে,
বসে আছি মহানন্দে,
আমায় ঘিরে আঁচল পেতে
কোল দিয়েছে মাটি।

আলো, তোমায় নমি, আমার
মিলাক অপরাধ।
ললাটেতে রাখো আমার
পিতার আশীর্বাদ।
বাতাস, তোমায় নমি, আমার
ঘুচুক অবসাদ।
সকল দেহে বুলায়ে দাও
পিতার আশীর্বাদ।
মাটি, তোমায় নমি, আমার
মিটুক সর্ব সাধ।
গৃহ ভরে ফলিয়ে তোলো
পিতার আশীর্বাদ।

পৌষ ১৩১৬

## নিভৃত প্রাণের দেবতা

নিভৃত প্রাণের দেবতা
যেখানে জাগেন একা,
ভক্ত, সেথায় খোলো দ্বার—
আজ লব তাঁর দেখা।
সারা দিন শুধু বাহিরে
ঘুরে ঘুরে কারে চাহি রে,
সন্ধ্যাবেলার আরতি
হয় নি আমার শেখা।

তব জীবনের আলোতে
জীবনপ্রদীপ জ্বালি
হে পূজারী, আজ নিভৃতে
সাজাব আমার থালি।
যেথা নিখিলের সাধনা
পূজালোক করে রচনা
সেথায় আমিও ধরিব
একটি জ্যোতির রেখা।

শান্তিনিকেতন
১৭ পৌষ ১৩১৬

## বিশ্ব যখন নিদ্রামগন

বিশ্ব যখন নিদ্রামগন,
গগন অন্ধকার,
কে দেয় আমার বীণার তারে
এমন ঝংকার।
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে,
উঠে বসি শয়ন ছেড়ে,
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি—
পাই নে দেখা তার।

গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া
প্রাণ উঠিল পুরে,
জানি নে কোন্ বিপুল বাণী
বাজে ব্যাকুল সুরে।
কোন্ বেদনায় বুঝি না রে
হৃদয় ভরা অশ্রুভারে,
পরিয়ে দিতে চাই কাহারে
আপন কণ্ঠহার।

১ বৈশাখ ১৩১৭

## সুন্দর, তুমি এসেছিলে

সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণবরন পারিজাত লয়ে হাতে।
নিদ্রিত পুরী, পথিক ছিল না পথে,
একা চলি গেলে তোমার সোনার রথে—
বারেক থামিয়া মোর বাতায়ন-পানে
চেয়েছিলে তব করুণ নয়নপাতে।
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে।

স্বপন আমার ভরেছিল কোন্ গন্ধে,
ঘরের আঁধার কেঁপেছিল কী আনন্দে,
ধুলায়-লুটানো নীরব আমার বীণা
বেজে উঠেছিল অনাহত কী আঘাতে।

কতবার আমি ভেবেছিনু উঠি-উঠি,
আলস ত্যজিয়া পথে বাহিরাই ছুটি,
উঠিনু যখন তখন গিয়েছ চলে—
দেখা বুঝি আর হল না তোমার সাথে।
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে।

তিনধরিয়া
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

## বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগব আমি,
দাও মোরে সেই কান।
ভুলব না আর সহজেতে,
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।

সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত
নাচাও যে ঝংকারে।
আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান।

তিনধরিয়া। ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

## ভারততীর্থ

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে
নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর,
নদীজপমালাধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র
ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য,
হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শকহুনদল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।

পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে,
যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

রণধারা বাহি জয়গান গাহি
উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত
যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তারি বিচিত্র সুর।
হে রুদ্রবীণা, বাজো বাজো বাজো,
ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজও
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে,
দাঁড়াবে ঘিরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

হেথা একদিন বিরামবিহীন
মহা ওংকারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রনরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালায় খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে
দুখের রক্তশিখা।
হবে তা সহিতে, মর্মে দহিতে—
আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখবহন করো মোর মন,
শোনো রে একের ডাক।
যত লাজ ভয় করো করো জয়,
অপমান দূরে যাক।
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ।
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

এসো হে আর্য, এসো অনার্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা
তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

১৮ আষাঢ় ১৩১৭

## অপমানিত

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে ব'সে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হয়ে
ধুলায় সে যায় বয়ে—
সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ।
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান।

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি
দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধুলার তলে হীন-পতিতের ভগবান।
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান।

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে।
সবারে না যদি ডাক
এখনো সরিয়া থাক
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।

২০ আষাঢ় ১৩১৭

## ওগো আমার এই জীবনের

ওগো আমার এই জীবনের
শেষ পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।
সারা জনম তোমার লাগি
প্রতিদিন যে আছি জাগি,
তোমার তরে বহে বেড়াই
দুঃখসুখের ব্যথা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

যা পেয়েছি, যা হয়েছি,
যা-কিছু মোর আশা,
না জেনে ধায় তোমার পানে
সকল ভালোবাসা।
মিলন হবে তোমার সাথে
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে,
জীবনবধূ হবে তোমার
নিত্য-অনুগতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

বরণমালা গাঁথা আছে
আমার চিত্তমাঝে,
কবে নীরব হাস্যমুখে
আসবে বরের সাজে।

সেদিন আমার রবে না ঘর,
কেই-বা আপন কেই-বা অপর,
বিজন রাতে পতির সাথে
মিলবে পতিব্রতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

শিলাইদহ
২৬ আষাঢ় ১৩১৭

## আমার এ গান

আমার এ গান ছেড়েছে তার
সকল অলংকার
তোমার কাছে রাখে নি আর
সাজের অহংকার।
অলংকার যে মাঝে প'ড়ে
মিলনেতে আড়াল করে,
তোমার কথা ঢাকে যে তার
মুখর ঝংকার।

তোমার কাছে খাটে না মোর
কবির গরব করা—
মহাকবি, তোমার পায়ে
দিতে চাই যে ধরা।
জীবন লয়ে যতন করি
যদি সরল বাঁশি গড়ি,
আপন সুরে দিবে ভরি
সকল ছিদ্র তার।

কলকাতা
১ শ্রাবণ ১৩১৭

## যাবার দিনে

যাবার দিনে এই কথাটি
বলে যেন যাই—
যা দেখেছি যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতিঃসমুদ্রমাঝে
যে শতদল পদ্ম রাজে
তারই মধু পান করেছি,
ধন্য আমি তাই—
যাবার দিনে এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই।

বিশ্বরূপের খেলাঘরে
কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম
দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি
শেষ করে দিন তাই—
যাবার বেলা এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই।

২০ শ্রাবণ ১৩১৭

## একটি নমস্কারে, প্রভু

একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক
তোমার এ সংসারে।
ঘন শ্রাবণ-মেঘের মতো
রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে

সমস্ত মন পড়িয়া থাক্
তব ভবন-দ্বারে।

নানা সুরের আকুল ধারা
মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক
নীরব পারাবারে।

হংস যেমন মানসযাত্রী
তেমনি সারা দিবসরাত্রি
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক
মহামরণ-পারে।

২৩ শ্রাবণ ১৩১৭

## প্রেমের হাতে ধরা দেব

প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে :
অনেক দেরি হয়ে গেল,
দোষী অনেক দোষে।
বিধিবিধান-বাঁধন-ডোরে
ধরতে আসে, যাই যে সরে—
তার লাগি যা শাস্তি নেবার
নেব মনের তোষে।
প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে।

লোকে আমায় নিন্দা করে,
নিন্দা সে নয় মিছে—

সকল নিন্দা মাথায় ধরে
রব সবার নীচে।
শেষ হয়ে যে গেল বেলা,
ভাঙল বেচা-কেনার মেলা—
ডাকতে যারা এসেছিল
ফিরল তারা রোষে।
প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে।

২৫ শ্রাবণ ১৩১৭

## দিবস যদি সাঙ্গ হল

দিবস যদি সাঙ্গ হল, না যদি গাহে পাখি,
ক্লান্ত বায়ু না যদি আর চলে,
এবার তবে গভীর করে ফেলো গো মোরে ঢাকি
অতি নিবিড় ঘনতিমিরতলে—
স্বপন দিয়ে গোপনে ধীরে ধীরে
যেমন করে ঢেকেছ ধরণীরে,
যেমন করে ঢেকেছ তুমি মুদিয়া-পড়া আঁখি,
ঢেকেছ তুমি রাতের শতদলে।

পাথেয় যার ফুরায়ে আসে পথের মাঝখানে,
ক্ষতির রেখা উঠেছে যার ফুটে,
বসনভূষা মলিন হল ধুলায় অপমানে,
শকতি যার পড়িতে চায় টুটে—
ঢাকিয়া দিক তাহার ক্ষতব্যথা
করুণাঘন গভীর গোপনতা,
ঘুচায়ে লাজ ফুটাও তারে নবীন উষাপানে
জুড়ায়ে তারে আঁধারসুধাজলে।

কলকাতা
২৯ শ্রাবণ ১৩১৭

## রাত্রি এসে যেথায় মেশে

রাত্রি এসে যেথায় মেশে
দিনের পারাবারে
তোমায় আমায় দেখা হল
সেই মোহানার ধারে।
সেইখানেতে সাদায় কালোয়
মিলে গেছে আঁধার-আলোয়,
সেইখানেতে ঢেউ ছুটেছে
এপারে ওইপারে।

নিতল নীল নীরব-মাঝে
বাজল গভীর বাণী ;
নিকষেতে উঠল ফুটে
সোনার রেখাখানি।
মুখের পানে তাকাতে যাই
দেখি-দেখি দেখতে না পাই,
স্বপনসাথে জড়িয়ে জাগা—
কাঁদি আকুল ধারে।

শান্তিনিকেতন
১৫ আশ্বিন [ ১৩১৭ ]। নিশীথে

## যেদিন ফুটল কমল

যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই,
আমি ছিলেম অন্যমনে।
আমার সাজিয়ে সাজি তারে আনি নাই,
সে যে রইল সংগোপনে।
মাঝে মাঝে হিয়া আকুলপ্রায়
স্বপন দেখে চম্‌কে উঠে চায়,
মন্দ মধুর গন্ধ আসে হায়
কোথায় দখিন সমীরণে।

ওগো সেই সুগন্ধে ফিরায় উদাসিয়া
আমায় দেশে দেশান্তে।

যেন সন্ধানে তার উঠে নিশ্বাসিয়া
ভুবন নবীন বসন্তে।
কে জানিত দূরে তো নেই সে,
আমারি গো আমারি সেই যে,
এ মাধুরী ফুটেছে হায় রে
আমার হৃদয়-উপবনে।

শিলাইদহ
২৬ চৈত্র ১৩১৮

## পেয়েছি ছুটি, বিদায় দেহো

পেয়েছি ছুটি, বিদায় দেহো, ভাই,
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।
ফিরায়ে দিনু দ্বারের চাবি,
রাখি না আর ঘরের দাবি,
সবার আজি প্রসাদবাণী চাই—
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।

অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী,
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি।
প্রভাত হয়ে এসেছে রাতি,
নিবিয়া গেল কোণের বাতি,
পড়েছে ডাক চলেছি আমি তাই—
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।

শান্তিনিকেতন
৯ বৈশাখ ১৩১৯

## যে রাতে মোর দুয়ারগুলি

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি
ভাঙল ঝড়ে,
জানি নাই তো তুমি এলে
আমার ঘরে।

সব যে হয়ে গেল কালো,
নিবে গেল দীপের আলো,
আকাশপানে হাত বাড়ালেম
কাহার তরে।

অন্ধকারে রইনু পড়ে
স্বপন মানি।
ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা
তাই কি জানি।
সকালবেলায় চেয়ে দেখি—
দাঁড়িয়ে আছ তুমি এ কী
ঘরভরা মোর শূন্যতারি
বুকের 'পরে।

শান্তিনিকেতন
২৩ ফাল্গুন ১৩২০

## ওই যে সন্ধ্যা

ওই যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল তার
সোনার অলংকার।
ওই সে আকাশে লুটায়ে আকুল চুল
অঞ্জলি ভরি ধরিল তারার ফুল,
পূজায় তাহার ভরিল অন্ধকার।

ক্লান্তি আপন রাখিয়া দিল সে ধীরে
স্তব্ধ পাখির নীড়ে।
বনের গহনে জোনাকি-রতন-জ্বালা
লুকায়ে বক্ষে শান্তির জপমালা
জপিল সে বারবার।

ওই যে তাহার লুকানো ফুলের বাস
গোপনে ফেলিল শ্বাস।
ওই যে তাহার প্রাণের গভীর বাণী
শান্ত পবনে নীরবে রাখিল আনি
আপন বেদনাভার।

ওই যে নয়ন অবগুণ্ঠনতলে
ভাসিল শিশিরজলে।
ওই যে তাহার বিপুল রূপের ধন
অরূপ আঁধারে করিল সমর্পণ
চরম নমস্কার।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন [১৩২১]। সন্ধ্যা

## দুঃখ এ নয়

দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো—
গভীর শান্তি এ যে,
আমার সকল ছাড়িয়ে গিয়ে
উঠল কোথায় বেজে।
ছাড়িয়ে গৃহ, ছাড়িয়ে আরাম,
ছাড়িয়ে আপনারে
সাথে করে নিল আমায়
জন্মমরণপারে—
এল পথিক সেজে।
দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো—
গভীর শান্তি এ যে।

চরণে তার নিখিল ভুবন
নীরব গগনেতে
আলো-আঁধার-আঁচলখানি
আসন দিল পেতে।
এত কালের ভয় ভাবনা
কোথায় যে যায় সরে,
ভালোমন্দ ভাঙাচোরা
আলোয় ওঠে ভরে—
কালিমা যায় মেজে।
দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো—
গভীর শান্তি এ যে।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন [১৩২১]। রাত্রি

## মেঘ বলেছে 'যাব যাব'

মেঘ বলেছে 'যাব যাব' ;
রাত বলেছে 'যাই' ;
সাগর বলে 'কূল মিলেছে—
আমি তো আর নাই'।
দুঃখ বলে 'রইনু চুপে
তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে' ;
আমি বলে 'মিলাই আমি
আর কিছু না চাই'।

ভুবন বলে 'তোমার তরে
আছে বরণমালা'।
গগন বলে 'তোমার তরে
লক্ষ প্রদীপ জ্বালা'।
প্রেম বলে যে 'যুগে যুগে
তোমার লাগি আছি জেগে' ;
মরণ বলে 'আমি তোমার
জীবনতরী বাই'।

শান্তিনিকেতন
১৭ আশ্বিন [১৩২১]। প্রভাত

## অন্ধকারের উৎস হতে

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধমাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।
পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ
সেই তো তোমার গেহ।
সমরঘাতে অমর করে রুদ্র নিঠুর স্নেহ
সেই তো তোমার স্নেহ।
সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেই তো তোমার দান।

মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ
সেই তো তোমার প্রাণ।
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি।

এলাহাবাদ
২৯ আশ্বিন [১৩২১]।

## প্রভাত

মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার-পর্ণপুটে।
উতরিবে যবে নব প্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।
উদয়াচলের সে তীর্থপথে আমি
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী,
দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে।

সেই প্রভাতের স্নিগ্ধ সুদূর গন্ধ
আঁধার বাহিয়া রহিয়া রহিয়া আসে।
আকাশে যে গান ঘুমাইছে নিঃস্পন্দ
তারাদীপগুলি কাঁপিছে তাহারি শ্বাসে।
অন্ধকারের বিপুল গভীর আশা,
অন্ধকারের ধ্যাননিমগ্ন ভাষা
বাণী খুঁজে ফিরে আমার চিত্তাকাশে।

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা।
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমেষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নবজীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।

হে মোর সন্ধ্যা, যাহা কিছু ছিল সাথে
রাখিনু তোমার অঞ্চলতলে ঢাকি।
আঁধারের সাথি, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখি।
কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি,
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুখের প্রীতি,
বিদায়বেলায় আজিও রহিল বাকি।

যা-কিছু পেয়েছি, যাহা-কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে,
যে মণি দুলিল, যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদপরশ তাদের 'পরে।

এলাহাবাদ
২ কার্তিক [১৩২১] সন্ধ্যা

## ছবি

তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা?
ওই-যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়,
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদেরি মতো সত্য নও?
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি?

চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও?
পথিকের সঙ্গ লও
ওগো পথহীন।
কেন রাত্রিদিন
সকলের মাঝে থেকে সবা হতে আছ এত দূরে
স্থিরতার চির-অন্তঃপুরে?

এই ধূলি
ধূসর অঞ্চল তুলি
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে,
বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে,
অঙ্গে তার পত্রলিখা দেয় লিখে
বসন্তের মিলন-উষায়—
এই ধূলি এও সত্য হায় ;
এই তৃণ
বিশ্বের চরণতলে লীন,
এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবই—
তুমি স্থির, তুমি ছবি,
তুমি শুধু ছবি।

একদিন এই পথে চলেছিলে আমাদের পাশে।
বক্ষ তব দুলিত নিশ্বাসে,
অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব
কত গানে কত নাচে
রচিয়াছে
আপনার ছন্দ নব নব
বিশ্বতালে রেখে তাল—
সে যে আজ হল কত কাল !
এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে !
মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তূলিকা ধরি রসের মুরতি।
সে প্রভাতে তুমিই তো ছিলে
এ বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী।

একসাথে পথে যেতে যেতে
রজনীর আড়ালেতে
তুমি গেলে থামি।

তার পরে আমি
কত দুঃখে সুখে
রাত্রিদিন চলেছি সম্মুখে।
চলেছে জোয়ার ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশপাথারে ;
পথের দু ধারে
চলেছে ফুলের দল নীরব চরণে
বরনে বরনে ;
সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবননির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।
অজানার সুরে
চলিয়াছি দূর হতে দূরে,
মেতেছি পথের প্রেমে।
তুমি পথ হতে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।
এই তৃণ, এই ধূলি, ওই তারা, ওই শশীরবি,
সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি।

কী প্রলাপ কহে কবি!
তুমি ছবি?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি।
কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে?
মরি মরি, সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ,
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।
তোমার চিকন
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত

মর্মরমুখর ছায়া মাধবীবনের
হ'ত স্বপনের।
তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে ?
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে,
তাই ভুল।
অন্যমনে চলি পথে, ভুলি নে কি ফুল ?
ভুলি নে কি তারা ?
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতামাঝে ভরি দেয় সুর।
ভুলে থাকা, নয় সে তো ভোলা ;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই—
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে,
তব সুর বাজে মোর গানে ;
কবির অন্তরে তুমি কবি—
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।
তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তার পরে হারায়েছি রাতে।
তার পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।
নও ছবি, নও তুমি ছবি।

এলাহাবাদ। ৩ কার্তিক ১৩২১। রাত্রি

## শা-জাহান

এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তরবেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক সম্রাটের ছিল এ সাধনা।

রাজশক্তি বজ্রসুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগ-সম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ,
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

হায় ওরে মানবহৃদয়,
বার বার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই।
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।
দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবীমঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়গোধূলি আসে ধুলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই;
আবার শিশিররাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোল নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।
হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।
নাই নাই, নাই যে সময়।

হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয়হরণ
সৌন্দর্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কী মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে।
রহে না যে
বিলাপের অবকাশ
বারো মাস,
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌনজাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।
জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।
হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্তসন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাসে—
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্যদূত যুগ যুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া—
'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া!'

চলে গেছ তুমি আজ
মহারাজ ;
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে,
সিংহাসন গেছে টুটে,
তব সৈন্যদল
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লির পথের ধূলি-'পরে।
বন্দীরা গাহে না গান ;
যমুনাকল্লোল-সাথে নহবত মিলায় না তান ;
তব পুরসুন্দরীর নূপুরনিক্কণ
ভগ্ন প্রাসাদের কোণে
মরে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।
তবুও তোমার দূত অমলিন,
শ্রান্তিক্লান্তিহীন,
তুচ্ছ করি রাজ্য-ভাঙাগড়া,
তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠাপড়া
যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া—
'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া !'

মিথ্যা কথা— কে বলে যে ভোল নাই ?
কে বলে রে খোল নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার ?
অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার
আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া ?
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
আজিও সে হয় নি বাহির ?
সমাধিমন্দির
এক ঠাঁই রহে চিরস্থির ;
ধরার ধুলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।

তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।
মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে ;
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে—
তাই এ ধরারে
জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে।
তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারংবার
তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।
যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধূলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে,
দিয়েছ তা ধূলিরে ফিরায়ে।
সেই তব পশ্চাতের পদধূলি-'পরে
তব চিত্ত হতে বায়ুভরে
কখন সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা।
তুমি চলে গেছ দূরে ;
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
উঠেছে অম্বরপানে,
কহিছে গম্ভীর গানে—
'যত দুর চাই
নাই নাই, সে পথিক নাই।
প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।

## সূর্যাবর্ত

আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার-পানে।
তাই
স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি,
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।'

এলাহাবাদ
১৫ কার্তিক ১৩২১

## চঞ্চলা

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে ;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে ;
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে ;
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্যচন্দ্রতারা যত
বুদ্‌বুদের মতো।

হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,
চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,
শব্দহীন সুর।
অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া ?
সর্বনাশা প্রেম তার, নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া।
উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা— ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি ;

আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল ;
দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল ;
অঞ্চল আকুল
গড়ায় কম্পিত তৃণে,
চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে ;
বারংবার ঝরে ঝরে পড়ে ফুল
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হতে।
শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও ;
ফিরে নাহি চাও,
যা-কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লও না কিছু, করো না সঞ্চয় ;
নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় করো ক্ষয়।
যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।
তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি
পলকে পলকে—
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।
যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি,
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে ;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে ;
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে।

ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী,
অলক্ষ্য সুন্দরী,
তব নৃত্যমন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষ নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন।

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝংকারমুখরা এই ভুবনমেখলা
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষ তোর উঠে রনরনি।
নাহি জানে কেউ—
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা;
মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।
নিশীথে প্রভাতে
যা-কিছু পেয়েছি হাতে
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে,
গান হতে গানে।

ওরে দেখ্ সেই স্রোত হয়েছে মুখর,
তরণী কাঁপিছে থরথর্।
তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্ তীরে,
তাকাস নে ফিরে।
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে— অকূল আলোতে।

এলাহাবাদ। ৩ পৌষ ১৩২১। রাত্রি

## জীবনমরণ

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে ;
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে ;
প্রভাত-সন্ধ্যার
আলো অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে ভেসে ;
অবশেষে
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।
ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো,
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।

তবুও মরিতে হবে, এও সত্য জানি।
মোর বাণী
একদিন এ বাতাসে ফুটিবে না,
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবে না
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে ;
মোর কানে কানে
রজনী কবে না তার রহস্যবারতা—
শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা।

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত,
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেইমতো।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল ;
নহিলে নিখিল
এত বড়ো নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না—
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো।

সুরুল। ২৯ পৌষ ১৩২১

## এবার

যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
লয়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য তুলে
দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে,
নবীন পল্লবে বনে বনে
বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে,
সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে
অনিমেষে
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

পদ্মা
২০ মাঘ ১৩২১

## দেনাপাওনা

পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান,
আমি গাই গান।

বাতাসেরে করেছ স্বাধীন,
সহজে সে ভৃত্য তব বন্ধনবিহীন।
আমারে দিয়েছ যত বোঝা
তাই নিয়ে চলি পথে, কভু বাঁকা কভু সোজা—
একে একে ফেলে ভার মরণে মরণে
নিয়ে যাই তোমার চরণে
একদিন রিক্ত হস্ত সেবায় স্বাধীন;
বন্ধন যা দিলে মোরে করি তারে মুক্তিতে বিলীন।

পূর্ণিমারে দিলে হাসি;
সুখস্বপ্নরসরাশি
ঢালে তাই ধরণীর করপুট সুধায় উচ্ছ্বাসি।

দুঃখখানি দিলে মোর তপ্ত ভালে থুয়ে,
অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে
আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে
দিনশেষে মিলনের রাতে।
তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার 'পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

আর সকলেরে তুমি দাও,
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।
আমি যাহা দিতে পারি আপনার প্রেমে,
সিংহাসন হতে নেমে
হাসিমুখে বক্ষে তুলে নাও।
মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও।

পদ্মাতীর
২৪ মাঘ ১৩২১

## তুমি-আমি

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয় নি তোমার দেখা।
সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিল না পথ-চাওয়া ;
এ পার হতে ও পার বেয়ে
বয় নি ধেয়ে
কাঁদনভরা বাঁধনছেঁড়া হাওয়া।

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম-
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দকুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।

আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে;
আমায় তুমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন করে পেলে।

আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক;
আমি এলেম, এল তোমার দুখ;
আমি এলেম, এল তোমার আগুনভরা আনন্দ—
জীবন-মরণ-তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে—
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

আমার চোখে লজ্জা আছে, আমার বুকে ভয়,
আমার মুখে ঘোমটা পড়ে রয়;
দেখতে তোমায় বাধে ব'লে পড়ে চোখের জল।
ওগো আমার প্রভু,
জানি আমি, তবু
আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতূহল—
নইলে তো এই সূর্যতারা সকলই নিষ্ফল।

পদ্মাতীর
২৫ মাঘ ১৩২১

## বলাকা

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপেঢাকা
বাঁকা তলোয়ার;
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে;
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার তরু সারে সারে;
মনে হল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি—
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।
হে হংসবলাকা,
ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

ওই পক্ষধ্বনি
শব্দময়ী অপ্সররমণী
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমিরমগন,
শিহরিল দেওদারবন।

মনে হল, এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি
হে পাখা বিবাগী।
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে
'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে!'

হে হংস-বলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।

মৃত্যু ভেদ করি
দুলিয়া চলেছে তরী।
কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,
সময় তো নাই শুধাবার
এই শুধু জানিয়াছে সার—
তরঙ্গের সাথে লড়ি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী;
টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল;
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
এসেছে আদেশ—
বন্দরের কাল হল শেষ।

অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ—
সেথাকার লাগি
উঠিয়াছে জাগি
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।
মরণের গান
উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে।
যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল,
যত হিংসাহলাহল,
সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া
ঊর্ধ্ব আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।
তবু বেয়ে তরী
সব ঠেলে হতে হবে পার,
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন,
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন,
হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত।
ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি? মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ

বহু যুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাব বহু অসম্মান—
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।
ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ।
রাখো নিন্দাবাণী রাখো আপন সাধুত্ব-অভিমান—
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।

দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে;
মৃত্যু করে লুকাচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।
ভেসে যায় তারা সরে যায়
জীবনেরে করে যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ।
আজ দেখো তাহাদের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ।
তার পরে দাঁড়াও সম্মুখে,
বলো অকম্পিত বুকে—
'তোরে নাহি করি ভয়;
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব দেখ্।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।'

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখসাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশলজ্জায়,
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,

তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাসরবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো ?
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা,
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা ?
স্বর্গ কি হবে না কেনা ?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

কলকাতা
২৩ কার্তিক ১৩২২

## মুক্তি

ডাক্তারে যা বলে বলুক-নাকো,
রাখো রাখো খুলে রাখো
শিয়রের ওই জানলা দুটো— গায়ে লাগুক হাওয়া।
ওষুধ ? আমার ফুরিয়ে গেছে ওষুধ খাওয়া।
তিতো কড়া কত ওষুধ খেলেম এ জীবনে,
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে।
বেঁচে থাকা সেই যেন এক রোগ—
কতরকম কবিরাজি, কতই মুষ্টিযোগ ;
একটু মাত্র অসাবধানেই বিষম কর্মভোগ।
'এইটে ভালো ওইটে মন্দ' যে যা বলে সবার কথা মেনে,
নামিয়ে চক্ষু মাথায় ঘোমটা টেনে,
বাইশ বছর কাটিয়ে দিলেম এই তোমাদের ঘরে—
তাই তো ঘরে পরে
সবাই আমায় বললে, 'লক্ষ্মী সতী
ভালোমানুষ অতি !'

এ সংসারে এসেছিলেম ন বছরের মেয়ে,
তার পরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে
দশের-ইচ্ছা-বোঝাই-করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে।
সুখের দুখের কথা
একটুখানি ভাবব এমন সময় ছিল কোথা!
এই জীবনটা ভালো কিংবা মন্দ কিংবা যা-হোক-একটা-কিছু
সে কথাটা বুঝব কখন, দেখব কখন ভেবে আগুপিছু!
একটানা এক ক্লান্ত সুরে
কাজের চাকা চলছে ঘুরে ঘুরে।
বাইশ বছর রয়েছি সেই এক চাকাতেই বাঁধা
পাকের ঘোরে আঁধা।
জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা।
শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি—
রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা,
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।
মনে হচ্ছে, সেই চাকাটা ওই-যে থামল যেন—
থামুক তবে। আবার ওষুধ কেন?

বসন্তকাল বাইশ বছর এসেছিল বনের আঙিনায়।
গন্ধে-বিভোল দক্ষিণবায়
দিয়েছিল জলস্থলের মর্মদোলায় দোল—
হেঁকেছিল 'খোল্ রে দুয়ার খোল্'।
সে যে কখন আসত যেত জানতে পেতেম না যে।
হয়তো মনের মাঝে
সংগোপনে দিত নাড়া; হয়তো ঘরের কাজে
আচম্বিতে ভুল ঘটাত; হয়তো বাজত বুকে
জন্মান্তরের ব্যথা; কারণভোলা দুঃখে সুখে
হয়তো পরান রইত চেয়ে যেন রে কার পায়ের শব্দ শুনে
বিহ্বল ফাল্গুনে।
তুমি আসতে আপিস থেকে, যেতে সন্ধ্যাবেলায়
পাড়ায় কোথা শতরঞ্জ-খেলায়।
থাক্ সে কথা।
আজকে কেন মনে আসে প্রাণের যত ক্ষণিক ব্যাকুলতা!

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশপানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা।
বাইশ বছর ধ'রে
মনে ছিল, বন্দী আমি অনন্তকাল তোমাদের এই ঘরে।
দুঃখ তবু ছিল না তার তরে ;
অসাড় মনে দিন কেটেছে, আরো কাটত আরো বাঁচলে পরে।
যেথায় যত জ্ঞাতি
লক্ষ্মী ব'লে করে আমার খ্যাতি ;
এই জীবনে সেই যেন মোর পরম সার্থকতা—
ঘরের কোণে পাঁচের মুখের কথা !
আজকে কখন মোর
কাটল বাঁধনডোর।
জনম মরণ এক হয়েছে ওই-যে অকূল বিরাট মোহানায়
ওই অতলে কোথায় মিলে যায়
ভাঁড়ার ঘরের দেয়াল যত
একটু ফেনার মতো।
এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ-মাঝে।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধুলায় পড়ে থাক্।
মরণবাসরঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু—
হেলা আমায় করবে না সে কভু।
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে।
গ্রহতারার সভার মাঝখানে সে
ওই-যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হোথায় রইল নির্নিমেষে।
মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারি !
দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার।

## নিষ্কৃতি

মা কেঁদে কয়, 'মঞ্জুলী মোর ওই তো কচি মেয়ে,
ওরই সঙ্গে বিয়ে দেবে?— বয়সে ওর চেয়ে
পাঁচগুনো সে বড়ো;
তাকে দেখে বাছা আমার ভয়েই জড়সড়।
এমন বিয়ে ঘটতে দেব নাকো।'
বাপ বললে, 'কান্না তোমার রাখো।
পঞ্চাননকে পাওয়া গেছে অনেক দিনের খোঁজে,
জান না কি মস্ত কুলীন ও যে!
সমাজে তো উঠতে হবে, সেটা কি কেউ ভাবো?
ওকে ছাড়লে পাত্র কোথায় পাব?'
মা বললে, 'কেন, ওই যে চাটুজ্জেদের পুলিন,
নাই-বা হল কুলীন—
দেখতে যেমন তেমনি স্বভাবখানি,
পাস করে ফের পেয়েছে জলপানি—
সোনার টুকরো ছেলে।
এক পাড়াতে থাকে ওরা, ওরই সঙ্গে হেসে খেলে
মেয়ে আমার মানুষ হল; ওকে যদি বলি আমি আজই
এখ্‌খনি হয় রাজি।'
বাপ বললে, 'থামো,
আরে আরে, রামোঃ!
ওরা আছে সমাজের সব তলায়।
বামুন কি হয় পইতে দিলেই গলায়!
দেখতে শুনতে ভালো হলেই পাত্র হল! রাধে!
স্ত্রীবুদ্ধি কি শাস্ত্রে বলে সাধে!'

যেদিন ওরা গিনি দিয়ে দেখলে কনের মুখ
সেদিন থেকে মঞ্জুলিকার বুক
প্রতি পলের গোপন কাঁটায় হল রক্তে মাখা।
মায়ের স্নেহ অন্তর্যামী, তার কাছে তো রয় না কিছুই ঢাকা;
মায়ের ব্যথা মেয়ের ব্যথা চলতে খেতে শুতে
ঘরের আকাশ প্রতি ক্ষণে হানছে যেন বেদনাবিদ্যুতে।

অটলতার গভীর গর্ব বাপের মনে জাগে—
সুখে দুঃখে দ্বেষে রাগে

ধর্ম থেকে নড়েন তিনি নাই হেন দৌর্বল্য।
তাঁর জীবনের রথের চাকা চলল
লোহার বাঁধা রাস্তা দিয়ে প্রতি ক্ষণেই,
কোনোমতেই ইঞ্চিখানেক এদিক-ওদিক
একটু হবার জো নেই।
তিনি বলেন তাঁর সাধনা বড়োই সুকঠোর,
আর কিছু নয়, শুধুই মনের জোর,
অষ্টাবক্র জমদগ্নি প্রভৃতি সব ঋষির সঙ্গে তুল্য—
মেয়েমানুষ বুঝবে না তার মূল্য।
অন্তঃশীলা অশ্রুনদীর নীরব নীরে
দুটি নারীর দিন বয়ে যায় ধীরে।
অবশেষে বৈশাখে এক রাতে
মঞ্জুলিকার বিয়ে হল পঞ্চাননের সাথে।
বিদায়বেলায় মেয়েকে বাপ বলে দিলেন মাথায় হস্ত ধরি,
'হও তুমি সাবিত্রীর মতো, এই কামনা করি।'

কিমাশ্চর্যমতঃপরং, বাপের সাধনজোরে
আশীর্বাদের প্রথম অংশ দু মাস যেতেই ফলল কেমন করে,
পঞ্চাননকে ধরল এসে যমে ;
কিন্তু মেয়ের কপালক্রমে
ফলল না তার শেষের দিকটা, দিলে না যম ফিরে—
মঞ্জুলিকা বাপের ঘরে ফিরে এল সিঁদুর মুছে শিরে।

দুঃখে সুখে দিন হয়ে যায় গত
স্রোতের জলে ঝরে-পড়া ভেসে-যাওয়া ফুলের মতো।
অবশেষে হল
মঞ্জুলিকার বয়স ভরা ষোলো।
কখন শিশুকালে
হৃদয়লতার পাতার অন্তরালে
বেরিয়েছিল একটি কুঁড়ি
প্রাণের গোপন রহস্যতল ফুঁড়ি ;
জানত না তো আপনাকে সে,
শুধায় নি তার নাম কোনোদিন বাহির হতে খেপা বাতাস এসে ;
সেই কুঁড়ি আজ অন্তরে তার উঠছে ফুটে
মধুর রসে ভরে উঠে।

সে যে প্রেমের ফুল
আপন রাঙা পাপড়িভারে আপনি সমাকুল।
আপ্‌নাকে তার চিনতে যে আর নাইকো বাকি,
তাই তো থাকি থাকি
চমকে ওঠে নিজের পানে চেয়ে।
আকাশপারের বাণী তারে ডাক দিয়ে যায় আলোর ঝর্না বেয়ে;
রাতের অন্ধকারে
কোন্‌-অসীমের-রোদন-ভরা বেদন লাগে তারে!
বাহির হতে তার
ঘুচে গেছে সকল অলংকার,
অন্তর তার রাঙিয়ে ওঠে স্তরে স্তরে—
তাই দেখে সে আপনি ভেবে মরে;
কখন কাজের ফাঁকে
জানলা ধরে চুপ করে সে বাইরে চেয়ে থাকে—
যেখানে ওই সজনে গাছের ফুলের ঝুরি বেড়ার গায়ে
রাশি রাশি হাসির ঘায়ে
আকাশটারে পাগল করে দিবসরাতি!
যে ছিল তার ছেলেবেলার খেলাঘরের সাথি
আজ সে কেমন করে
জলস্থলের হৃদয়খানি দিল ভরে!
অরূপ হয়ে সে যেন আজ সকল রূপে রূপে
মিশিয়ে গেল চুপে চুপে!
পায়ের শব্দ তারই
মর্মরিত পাতায় পাতায় গিয়েছে সঞ্চারি।
কানে কানে তারই করুণ বাণী
মৌমাছিদের পাখার গুনগুনানি।

মেয়ের নীরব মুখে
কী দেখে মা, শেল বাজে তার বুকে।
না-বলা কোন্‌ গোপন কথার মায়া
মঞ্জুলিকার কালো চোখে ঘনিয়ে তোলে জলভরা এক ছায়া;
অশ্রুভেজা গভীর প্রাণের ব্যথা
এনে দিল অধরে তার শরৎনিশির স্তব্ধ ব্যাকুলতা।
মায়ের মুখে অন্ন রোচে নাকো—
কেঁদে বলে, 'হায় ভগবান, অভাগীরে ফেলে কোথায় থাকো!'

একদা বাপ দুপুরবেলায় ভোজন সাঙ্গ করে
গুড়গুড়িটার নলটা মুখে ধরে
ঘুমের আগে, যেমন চিরাভ্যাস,
পড়তেছিলেন ইংরেজি এক প্রেমের উপন্যাস।
মা বললেন, বাতাস করে গায়ে,
কখনো বা হাত বুলিয়ে পায়ে,
'যার খুশি সে নিন্দে করুক, মরুক বিষে জ্ব'রে,
আমি কিন্তু পারি যেমন করে
মঞ্জুলিকার দেবই দেব বিয়ে।'
বাপ বললেন কঠিন হেসে, 'তোমরা মায়ে ঝিয়ে
এক লগ্নেই বিয়ে কোরো আমার মরার পরে ;
সেই কটা দিন থাকো ধৈর্য ধরে।'
এই বলে তাঁর গুড়গুড়িতে দিলেন মৃদু টান।
মা বললেন, 'উঃ, কী পাষাণ প্রাণ,
স্নেহমায়া কিচ্ছু কি নেই ঘটে!'
বাপ বললেন, 'আমি পাষাণ বটে।
ধর্মের পথ কঠিন বড়ো, ননির পুতুল হলে
এতদিনে কেঁদেই যেতেম গ'লে।'
মা বললেন, 'হায় রে কপাল! বোঝাবই বা কারে?
তোমার এ সংসারে
ভরা ভোগের মধ্যখানে দুয়ার এঁটে
পলে পলে শুকিয়ে মরবে ছাতি ফেটে
একলা কেবল একটুকু ওই মেয়ে,
ত্রিভুবনে অধর্ম আর নেই কিছু এর চেয়ে।
তোমার পুঁথির শুকনো পাতায় নেই তো কোথাও প্রাণ—
দরদ কোথায় বাজে সেটা অন্তর্যামী জানেন ভগবান।'
বাপ একটু হাসল কেবল, ভাবলে, 'মেয়েমানুষ
হৃদয়তাপের-ভাপে-ভরা ফানুস।
জীবন একটা কঠিন সাধন, নেই সে ওদের জ্ঞান।'
এই বলে ফের চলল পড়া ইংরেজি সেই প্রেমের উপাখ্যান।

দুখের তাপে জ্বলে জ্বলে অবশেষে নিবল মায়ের তাপ ;
সংসারেতে একা পড়লেন বাপ।
বড়ো ছেলে বাস করে তার স্ত্রীপুত্রদের সাথে
বিদেশে পাটনাতে।

দুই মেয়ে তার কেউ থাকে না কাছে,
শ্বশুরবাড়ি আছে।
একটি থাকে ফরিদপুরে,
আরেক মেয়ে থাকে আরো দূরে
মাদ্রাজে কোন্ বিন্ধ্যগিরির পার।
পড়ল মঞ্জুলিকার 'পরে বাপের সেবাভার।
রাঁধুনে ব্রাহ্মণের হাতে খেতে করেন ঘৃণা ;
স্ত্রীর রান্না বিনা
অন্নপানে হত না তাঁর রুচি—
সকালবেলায় ভাতের পালা, সন্ধ্যাবেলায় রুটি কিংবা লুচি,
ভাতের সঙ্গে মাছের ঘটা,
ভাজাভুজি হত পাঁচটা-ছটা ;
পাঁঠা হত রুটি লুচির সাথে।
মঞ্জুলিকা দু বেলা সব আগাগোড়া রাঁধে আপন হাতে।
একাদশী ইত্যাদি তার সকল তিথিতেই
রাঁধার ফর্দ এই।
বাপের ঘরটি আপনি মোছে ঝাড়ে ;
রৌদ্রে দিয়ে গরম পোশাক আপনি তোলে পাড়ে।
ডেস্কে বাক্সে কাগজপত্র সাজায় থাকে থাকে,
ধোবার বাড়ির ফর্দ টুকে রাখে।
গয়লানি আর মুদির হিসাব রাখতে চেষ্টা করে,
ঠিক দিতে ভুল হলে তখন বাপের কাছে ধমক খেয়ে মরে।
কাসুন্দি তার কোনোমতেই হয় না মায়ের মতো,
তাই নিয়ে তার কত
নালিশ শুনতে হয়।
তা ছাড়া তার পান-সাজাটা মনের মতো নয়।
মায়ের সঙ্গে তুলনাতে পদে-পদেই ঘটে যে তার ত্রুটি।
মোটামুটি—
আজকালকার মেয়েরা কেউ নয় সেকালের মতো।
হয়ে নীরব নত,
মঞ্জুলী সব সহ্য করে, সর্বদাই সে শান্ত,
কাজ করে অক্লান্ত।
যেমন করে মাতা বারংবার
শিশু ছেলের সহস্র আবদার
হেসে সকল বহন করেন স্নেহের কৌতুকে,
তেমনি করেই সুপ্রসন্ন মুখে

মঞ্জুলী তার বাপের নালিশ দণ্ডে দণ্ডে শোনে,
হাসে মনে মনে।
বাবার কাছে মায়ের স্মৃতি কতই মূল্যবান্
সেই কথাটি মনে করে গর্বসুখে পূর্ণ তাহার প্রাণ—
'আমার মায়ের যত্ন যে জন পেয়েছে একবার
আর-কিছু কি পছন্দ হয় তার!'

হোলির সময় বাপকে সেবার বাতে ধরল ভারি।
পাড়ায় পুলিন করছিল ডাক্তারি,
ডাকতে হল তারে।
হৃদয়যন্ত্র বিকল হতে পারে
ছিল এমন ভয়।
পুলিনকে তাই দিনের মধ্যে বারে বারেই আসতে যেতে হয়.
মঞ্জুলী তার সনে
সহজভাবে কইবে কথা যতই করে মনে
ততই বাধে আরো!
এমন বিপদ কারো
হয় কি কোনোদিন!
গলাটি তার কাঁপে কেন, কেন এতই ক্ষীণ।
চোখের পাতা কেন
কিসের ভারে জড়িয়ে আসে যেন!
ভয়ে মরে বিরহিণী
শুনতে যেন পাবে কেহ রক্তে যে তার বাজে রিনিরিনি।
পদ্মপাতায় শিশির যেন, মনখানি তার বুকে
দিবারাত্রি টলছে কেন এমনতরো ধরাপড়ার মুখে!

ব্যামো সেরে আসছে ক্রমে,
গাঁটের ব্যথা অনেক এল কমে।
রোগী শয্যা ছেড়ে
একটু এখন চলে হাত পা নেড়ে।
এমন সময় সন্ধ্যাবেলা
হাওয়ায় যখন যূথীবনের পরানখানি মেলা,
আঁধার যখন চাঁদের সঙ্গে কথা বলতে যেয়ে
চুপ করে শেষ তাকিয়ে থাকে চেয়ে,
তখন পুলিন রোগীসেবার পরামর্শছলে
মঞ্জুলীরে পাশের ঘরে ডেকে বলে—

'জানো তুমি তোমার মায়ের সাধ ছিল এই চিতে
মোদের দোঁহার বিয়ে দিতে!
সে ইচ্ছাটি তাঁরই
পুরাতে চাই যেমন করেই পারি।
এমন করে আর কেন দিন কাটাই মিছিমিছি?'
'না না, ছিছি, ছিছি!'
এই বলে সে মঞ্জুলিকা দু হাত দিয়ে মুখখানি তার ঢেকে
ছুটে গেল ঘরের থেকে।
আপন ঘরে দুয়ার দিয়ে পড়ল মেঝের 'পরে---
ঝরঝরিয়ে ঝরঝরিয়ে বুক ফেটে তার অশ্রু ঝরে পড়ে।
ভাবলে, 'পোড়া মনের কথা এড়ায় নি ওঁর চোখ।
আর কেন গো? এবার মরণ হোক।'

মঞ্জুলিকা বাপের সেবায় লাগল দ্বিগুণ করে
অষ্টপ্রহর ধরে।
আবশ্যকটা সারা হলে তখন লাগে অনাবশ্যক কাজে;
যে বাসনটা মাজা হল আবার সেটা মাজে।
দু-তিন ঘণ্টা পর
একবার যে ঘর ঝেড়েছে ফের ঝাড়ে সেই ঘর।
কখন যে স্নান, কখন যে তার আহার,
ঠিক ছিল না তাহার।
কাজের কামাই ছিল নাকো যতক্ষণ না রাত্রি এগারোটায়
শ্রান্ত হয়ে আপনি ঘুমে মেঝের 'পরে লোটায়।
যে দেখল সেই অবাক হয়ে রইল চেয়ে;
বললে, 'ধন্যি মেয়ে!'
বাপ শুনে কয় বুক ফুলিয়ে, 'গর্ব করি নেকো---
কিন্তু তবু আমার মেয়ে সেটা স্মরণ রেখো।
ব্রহ্মচর্য ব্রত
আমার কাছেই শিক্ষা যে ওর। নইলে দেখতে অন্যরকম হত।
আজকালকার দিনে
সংযমেরই কঠোর সাধন বিনে
সমাজেতে রয় না কোনো বাঁধ;
মেয়েরা তাই শিখছে কেবল বিবিয়ানার ছাঁদ।'

স্ত্রীর মরণের পরে যবে
সবেমাত্র এগারো মাস হবে

গুজব গেল শোনা,
এই বাড়িতে ঘটক করে আনাগোনা।
প্রথম শুনে মঞ্জুলিকার হয়নিকো বিশ্বাস ;
তার পরে সব রকম দেখে ছাড়লে সে নিশ্বাস।
ব্যস্ত সবাই, কেমনতরো ভাব—
আসছে ঘরে নানারকম বিলিতি আসবাব।
দেখলে বাপের নতুন করে সাজসজ্জা শুরু,
হঠাৎ কালো ভ্রমরকৃষ্ণ ভুরু
পাকা চুল সব কখন হল কটা,
চাদরেতে যখন-তখন গন্ধ মাখার ঘটা।

মার কথা আজ মঞ্জুলিকার পড়ল মনে
বুকভাঙা এক বিষম ব্যথার সনে।
হোক-না মৃত্যু, তবু
এ বাড়ির এই হাওয়ার সঙ্গে বিরহ তাঁর ঘটে নাই তো কভু।
কল্যাণী সেই মূর্তিখানি সুধামাখা
এ সংসারের মর্মে ছিল আঁকা ;
সাধ্বীর সেই সাধনপুণ্য ছিল ঘরের মাঝে,
তাঁরই পরশ ছিল সকল কাজে।
এ সংসারে তাঁর হবে আজ পরম মৃত্যু, বিষম অপমান—
সেই ভেবে যে মঞ্জুলিকার ভেঙে পড়ল প্রাণ।

ছেড়ে লজ্জা ভয়
কন্যা তখন নিঃসংকোচে কয়
বাপের কাছে গিয়ে—
'তুমি নাকি করতে যাবে বিয়ে !
আমরা তোমার ছেলে মেয়ে নাতনি নাতি যত
সবার মাথা করবে নত ?
মায়ের কথা ভুলবে তবে ?
তোমার প্রাণ কি এত কঠিন হবে !'

বাবা বললে শুষ্ক হাসে—
'কঠিন আমি কেই বা জানে না সে !
আমার পক্ষে বিয়ে করা বিষম কঠোর কর্ম,
কিন্তু গৃহধর্ম
স্ত্রী না হলে অপূর্ণ যে রয়

মনু হতে মহাভারত সকল শাস্ত্রে কয়।
সহজ তো নয় ধর্মপথে হাঁটা,
এ তো কেবল হৃদয় নিয়ে নয়কো কাঁদাকাটা।
যে করে ভয় দুঃখ নিতে, দুঃখ দিতে,
সে কাপুরুষ কেনই আসে পৃথিবীতে?'

বাখরগঞ্জে মেয়ের বাপের ঘর।
সেথায় গেলেন বর
বিয়ের ক' দিন আগে। বউকে নিয়ে শেষে
যখন ফিরে এলেন দেশে,
ঘরেতে নেই মঞ্জুলিকা। খবর পেলেন চিঠি পড়ে
পুলিন তাকে বিয়ে করে
গেছে দোঁহে ফরাক্কাবাদ চলে,
সেইখানেতেই ঘর পাতবে বলে।
আগুন হয়ে বাপ
বারে বারে দিলেন অভিশাপ।

## হারিয়ে-যাওয়া

ছোট্ট আমার মেয়ে
সঙ্গিনীদের ডাক শুনতে পেয়ে
সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলায় যাচ্ছিল সে নেমে
অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে।
হাতে ছিল প্রদীপখানি,
আঁচল দিয়ে আড়াল করে চলছিল সাবধানি।

আমি ছিলাম ছাতে
তারায়-ভরা চৈত্রমাসের রাতে।
হঠাৎ মেয়ের কান্না শুনে উঠে
দেখতে গেলেম ছুটে।
সিঁড়ির মধ্যে যেতে যেতে
প্রদীপটা তার নিবে গেছে বাতাসেতে।
শুধাই তারে, 'কী হয়েছে বামি?'
সে কেঁদে কয় নীচে থেকে, 'হারিয়ে গেছি আমি!'

তারাভরা চৈত্রমাসের রাতে
ফিরে গিয়ে ছাতে
মনে হল আকাশপানে চেয়ে,
আমার বামির মতোই যেন অমনি কে এক মেয়ে
নীলাম্বরের আঁচলখানি ঘিরে
দীপশিখাটি বাঁচিয়ে একা চলছে ধীরে ধীরে।
নিবত যদি আলো, যদি হঠাৎ যেত থামি
আকাশ ভরে উঠত কেঁদে 'হারিয়ে গেছি আমি'।

## সন্ধ্যা ও প্রভাত

এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন্ দেশে, কোন্ সমুদ্রপারে, তোমার প্রভাত হল?

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো; কোন্খানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা?

জাগল কে? নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায়-জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রেগাঁথা সেঁউতিফুলের মালা।

এখানে একে একে দরজায় আগল পড়ল, সেখানে জানলা গেল খুলে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।

ওরা পান্থশালা থেকে বেরিয়ে পড়েছে, পুবের দিকে মুখ করে চলেছে; ওদের কপালে লেগেছে সকালের আলো, ওদের পারানির কড়ি এখনো ফুরোয় নি; ওদের জন্যে পথের ধারের জানলায় জানলায় কালো চোখের করুণ কামনা অনিমেষ চেয়ে আছে; রাস্তা ওদের সামনে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খুলে ধরলে, বললে, 'তোমাদের জন্যে সব প্রস্তুত।' ওদের হৃৎপিণ্ডে রক্তের তালে তালে জয়ভেরী বেজে উঠল।

এখানে সবাই ধূসর আলোয় দিনের শেষ খেয়া পার হল।

পান্থশালার আঙিনায় এরা কাঁথা বিছিয়েছে; কেউ বা একলা, কারো বা সঙ্গী ক্লান্ত, সামনের পথে কী আছে অন্ধকারে দেখা গেল না, পিছনের পথে কী ছিল কানে কানে বলাবলি করছে; বলতে বলতে কথা বেধে যায়, তার পরে চুপ করে থাকে; তার পরে আঙিনা থেকে উপরে চেয়ে দেখে, আকাশে উঠেছে সপ্তর্ষি।

সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক।

কার্তিক ১৩২৬

## সতেরো বছর

আমি তার সতেরো বছরের জানা।

কত আসা-যাওয়া, কত দেখাদেখি, কত বলাবলি ; তারই আশেপাশে কত স্বপ্ন, কত অনুমান, কত ইশারা ; তারই সঙ্গে সঙ্গে কখনো বা ভোরের ভাঙা ঘুমে শুকতারার আলো, কখনো বা আষাঢ়ের ভরসন্ধ্যায় চামেলি ফুলের গন্ধ, কখনো বা বসন্তের শেষ প্রহরে ক্লান্ত নহবতের পিলু-বারোয়াঁ ; সতেরো বছর ধরে এইসব গাঁথা পড়েছিল তার মনে।

আর, তারই সঙ্গে মিলিয়ে সে আমার নাম ধরে ডাকত। ঐ নামে যে মানুষ সাড়া দিত সে তো একা বিধাতার রচনা নয়। সে যে তারই সতেরো বছরের জানা দিয়ে গড়া ; কখনো আদরে কখনো অনাদরে, কখনো কাজে কখনো অকাজে, কখনো সবার সামনে কখনো একলা আড়ালে,কেবল একটি লোকের মনে- মনে-জানা দিয়ে গড়া সেই মানুষ।

তার পরে আরো সতেরো বছর যায়।—

কিন্তু, এর দিনগুলি, এর রাতগুলি, সেই নামের রাখিবন্ধনে আর তো এক হয়ে মেলে না— এরা ছড়িয়ে পড়ে।

তাই এরা রোজ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'আমরা থাকব কোথায় ? আমাদের ডেকে নিয়ে ঘিরে রাখবে কে ?'

আমি তার কোনো জবাব দিতে পারি নে, চুপ করে বসে থাকি আর ভাবি। আর, ওরা বাতাসে উড়ে চলে যায়। বলে, 'আমরা খুঁজতে বেরলাম।'

'কাকে ?'

কাকে সে এরা জানে না। তাই কখনো যায় এ দিকে, কখনো যায় ও দিকে ; সন্ধ্যাবেলাকার খাপছাড়া মেঘের মতো অন্ধকারে পাড়ি দেয়, আর দেখতে পাই নে।

কার্তিক ১৩২৬

## একটি দিন

মনে পড়ছে সেই দুপুরবেলাটি। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টিধারা ক্লান্ত হয়ে আসে, আবার দমকা হাওয়া তাকে মাতিয়ে তোলে।

ঘরে অন্ধকার, কাজে মন যায় না। যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বর্ষার গানে মল্লারের সুর লাগালেম।

পাশের ঘর থেকে একবার সে কেবল দুয়ার পর্যন্ত এল। আবার ফিরে গেল। আবার একবার বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পরে ধীরে ধীরে ভিতরে এসে বসল। হাতে তার সেলাইয়ের কাজ ছিল, মাথা নিচু করে সেলাই করতে লাগল। তার পরে

সেলাই বন্ধ করে জানলার বাইরে ঝাপসা গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

বৃষ্টি ধরে এল, আমার গান থামল। সে উঠে চুল বাঁধতে গেল।

এইটুকু ছাড়া আর কিছুই না। বৃষ্টিতে গানেতে অকাজে আঁধারে জড়ানো কেবল সেই একটি দুপুরবেলা।

ইতিহাসে রাজাবাদশার কথা, যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী, সস্তা হয়ে ছড়াছড়ি যায়। কিন্তু একটি দুপুরবেলার ছোটো একটু কথার-টুকরো দুর্লভ রত্নের মতো কালের কৌটোর মধ্যে লুকোনো রইল, দুটি লোক তার খবর জানে।

অগ্রহায়ণ ১৩২৬

## মনে পড়া

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু কখন খেলতে গিয়ে
হঠাৎ অকারণে
একটা কী সুর গুনগুনিয়ে
কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলায় যেন
আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত, আমার
দোলনা ঠেলে ঠেলে ;
মা গিয়েছে, যেতে যেতে
গানটি গেছে ফেলে।

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন আশ্বিনেতে
ভোরে শিউলিবনে
শিশিরভেজা হাওয়া বেয়ে
ফুলের গন্ধ আসে,
তখন কেন মায়ের কথা
আমার মনে ভাসে ?
কবে বুঝি আনত মা সেই
ফুলের সাজি বয়ে,
পুজোর গন্ধ আসে যে তাই
মায়ের গন্ধ হয়ে।

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন বসি গিয়ে
শোবার ঘরের কোণে
জানলা থেকে তাকাই দূরে
নীল আকাশের দিকে,
মনে হয় মা আমার পানে
চাইছে অনিমিখে।
কোলের 'পরে ধরে কবে
দেখত আমায় চেয়ে,
সেই চাউনি রেখে গেছে
সারা আকাশ ছেয়ে।

৯ আশ্বিন ১৩২৮

## তপোভঙ্গ

যৌবনবেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি,
হে ভোলা সন্ন্যাসী।
চঞ্চল চৈত্রের রাতে
কিংশুকমঞ্জরী-সাথে
শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি।
আশ্বিনের বৃষ্টিহারা শীর্ণশুভ্র মেঘের ভেলায়
গেল বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
নির্মম হেলায়?

একদা সে দিনগুলি তোমার পিঙ্গল জটাজালে
শ্বেত রক্ত নীল পীত নানা পুষ্পে বিচিত্র সাজালে,
গেছ কি পাসরি।
দস্যু তারা হেসে হেসে
হে ভিক্ষুক, নিল শেষে
তোমার ডম্বরু শিঙা, হাতে দিল মঞ্জিরা বাঁশরি।
গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদনরসে
ভরি তব কমণ্ডলু নিমজ্জিল নিবিড় আলসে
মাধুর্যরভসে।

সেদিন তপস্যা তব অকস্মাৎ শূন্যে গেল ভেসে
শুষ্কপত্রে ঘূর্ণবেগে গীতরিক্ত হিমমরুদেশে
উত্তরের মুখে।
তব ধ্যানমন্ত্রটিরে
আনিল বাহিরতীরে
পুষ্পগন্ধে লক্ষ্যহারা দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে।
সে মন্ত্রে উঠিল মাতি সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা,
সে মন্ত্রে নবীন পত্রে জ্বালি দিল অরণ্যবীথিকা
শ্যাম বহ্নিশিখা।

বসন্তের বন্যাস্রোতে সন্ন্যাসের হল অবসান,
জটিল জটার বন্ধে জাহ্নবীর অশ্রুকলতান
শুনিলে তন্ময়।
সেদিন ঐশ্বর্য তব
উন্মেষিল নব নব,
অন্তরে উদ্‌বেল হল আপনাতে আপন বিস্ময়।
আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য উদার,
আনন্দে ধরিলে হাতে জ্যোতির্ময় পাত্রটি সুধার
বিশ্বের ক্ষুধার।

সেদিন উন্মত্ত তুমি যে নৃত্যে ফিরিলে বনে বনে
সে নৃত্যের ছন্দেলয়ে সংগীত রচিনু ক্ষণে ক্ষণে
তব সঙ্গ ধরে।
ললাটের চন্দ্রালোকে
নন্দনের স্বপ্নচোখে
নিত্যনূতনের লীলা দেখেছিনু চিত্ত মোর ভরে।
দেখেছিনু সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা—
দেখেছিনু লজ্জিতের পুলকের কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা,
রূপতরঙ্গিমা।

সেদিনের পানপাত্র, আজ তার ঘুচালে পূর্ণতা?
মুছিলে চুম্বনরাগে-চিহ্নিত বঙ্কিম রেখালতা
রক্তিম অঙ্কনে?
অগীতসংগীতধার,
অশ্রুর সঞ্চয়ভার,
অযত্নে লুণ্ঠিত সে কি ভগ্ন ভাণ্ডে তোমার অঙ্গনে।

তোমার তাণ্ডবনৃত্যে চূর্ণ চূর্ণ হয়েছে সে ধূলি ?
নিঃস্ব কালবৈশাখীর নিশ্বাসে কি উঠিছে আকুলি
লুপ্ত দিনগুলি।

নহে নহে, আছে তারা ; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সংবরিয়া
রাখ সংগোপনে।
তোমার জটায় হারা
গঙ্গা আজ শান্তধারা,
তোমার ললাটে চন্দ্র গুপ্ত আজি সুপ্তির বন্ধনে।
আবার কী লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজেছ বাহিরে।
অন্ধকারে নিঃস্বনিছে যত দূরে দিগন্তে চাহি রে—
'নাহি রে, নাহি রে।'

কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,
দিনধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ-মাঝে
উৎকণ্ঠিত বেগে।
নির্জনপ্রান্তরতলে
আলেয়ার আলো জ্বলে,
বিদ্যুৎবহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।
চঞ্চল মুহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
নিবিড়নিবদ্ধ হয়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিশ্বাসে
শান্ত হয়ে আসে।

জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।
বিদ্রোহী নবীন বীর স্থবিরের শাসন-নাশন
বারে বারে দেখা দিবে ; আমি রচি তারি সিংহাসন,
তারি সম্ভাষণ।

তপোভঙ্গদূত আমি মহেন্দ্রের হে রুদ্র সন্ন্যাসী—
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।

দুর্জয়ের জয়মালা
পূর্ণ করে মোর ডালা—
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী—
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহলকোলাহল আনি
মোর গান হানি।

হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব—
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্মরণবেশে।
বারে বারে পঞ্চশরে
অগ্নিতেজে দগ্ধ ক'রে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।
বারে বারে তারি তূণ সম্মোহনে ভরি দিব বলে
আমি কবি সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে
মৃত্তিকার কোলে।

জানি জানি, বারংবার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অনামনা,
নূতন উৎসাহে।
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে
বিলীন বিরহতলে,
উমারে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখদাহে!
ভগ্নতপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী—
আমি সেই কবি।

আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ।
হেনকালে মধুমাসে
মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্যবিকশিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রাপথতলে,
পুষ্পমাল্যমাঙ্গল্যের সাজি লয়ে সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে।

ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল, রক্ত-আঁখি,
দেখে তব শুভ্র তনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি
প্রাতঃসূর্যরুচি।
অস্থিমালা গেছে খুলে
মাধবীবল্লরীমূলে—
ভালে মাখা পুষ্পরেণু, চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি!
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবিপানে;
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে
কবির পরানে।

কার্তিক ১৩৩০

## লীলাসঙ্গিনী

দুয়ারবাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হল যেন চিনি—
কবে নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলাসঙ্গিনী।
কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে?
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে—
বাজাইলে কিঙ্কিণী।
বিস্মরণের গোধূলি-ক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি।

এলোচুলে বহে এনেছ কী মোহে
সেদিনের পরিমল।
বকুলগন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সম্বল।
চৈত্রহাওয়ায় উতলা কুঞ্জমাঝে
চারু চরণের ছায়ামঞ্জীর বাজে,
সেদিনের তুমি এলে এদিনের সাজে
ওগো চিরচঞ্চল।
অঞ্চল হতে ঝরে বায়ুস্রোতে
সেদিনের পরিমল।

মনে আছে সে কি সব কাজ, সখী,
ভুলায়েছ বারে বারে—
বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার
কঙ্কণঝংকারে।
ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে
কখনো আমের নবমুকুলের বেশে
কভু নবমেঘভারে।
চকিতে চকিতে চলচাহনিতে
ভুলায়েছ বারে বারে।

নদীকূলে-কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।
বর্ষাশেষের গগনকোনায়-কোনায়
সন্ধ্যামেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জন ক্ষণে কখন অন্যমনায়
ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে।
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।

কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ বেলা
কাজের কক্ষকোণে।
সাথি খুঁজিতে কি ফিরিছ একেলা
তব খেলাপ্রাঙ্গণে?
নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘরছাড়া যত দিশাহারাদের দলে—
অযাত্রা পথে যাত্রী যাহারা চলে
নিষ্ফল আয়োজনে?
কাজ ভোলাবারে ফেরো বারে বারে
কাজের কক্ষকোণে।

আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানসপ্রতিমাগুলি?
কল্পনাপটে নেশার বরনে
বুলাব রসের তুলি?

বিবাগী মনের ভাবনা ফাগুন-প্রাতে
উড়ে চলে যাবে উৎসুক বেদনাতে
কলগুঞ্জিত মৌমাছিদের সাথে
পাখায় পুষ্পধূলি।
আবার নিভৃতে হবে কি রচিতে
মানস প্রতিমাগুলি।

দেখ না কি, হায়, বেলা চলে যায়—
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীন।
এত দিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিশ্বাসি
গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়,
সারা হয়ে এল দিন।

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ-অন্ধকারে।
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি
অমাবস্যার পারে?
মালতীলতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে
তারায় তারায় তারি লুকাচুরি রাতে?
সুর বেজেছিল যাহার পরশপাতে
নীরবে লভিব তারে?
দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা
রচিবে অন্ধকারে?

যদি রাত হয় না করিব ভয়—
চিনি যে তোমারে চিনি।
চোখে নাই দেখি তবু ছলিবে কি
হে গোপনরঙ্গিণী।
নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চলে
তবু সব কথা যাবে সে আমায় বলে,

তিমিরে তোমার পরশলহরী দোলে
হে রসতরঙ্গিণী।
হে আমার প্রিয়, আবার ভুলিয়ো,
চিনি যে তোমারে চিনি।

ফাল্গুন ১৩৩০

## সাবিত্রী

ঘন-অশ্রুবাষ্পে-ভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি
ফেলো, ফেলো টুটি।
হে সূর্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপদ্মখানি
দেখা দিক ফুটি।
বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে, দীপ্ত কেশে, উদ্‌বোধিনী বাণী
সে পদ্মের কেন্দ্রমাঝে 'নিত্য রাজে, জানি তারে জানি'
মোর জন্মকালে
প্রথম প্রত্যুষে মম তাহারি চুম্বন দিলে আনি
আমার কপালে।

সে চুম্বনে উচ্ছলিল জ্বালার তরঙ্গ মোর প্রাণে
অগ্নির প্রবাহ!
উচ্ছ্বসি উঠিল মন্দ্রি বারংবার মোর গানে গানে
শান্তিহীন দাহ।
ছন্দের বন্যায় মোর রক্ত নাচে সে চুম্বন লেগে,
উন্মাদ সংগীত কোথা ভেসে যায় উদ্দাম আবেগে
আপনা-বিস্মৃত।
সে চুম্বনমন্ত্রে বক্ষে অজানা ক্রন্দন উঠে জেগে
ব্যথায় বিস্মিত।

তোমার হোমাগ্নি মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি,
তারে নমো নম।
তমিস্রসুপ্তির কূলে যে বংশী বাজাও, আদিকবি,
ধ্বংস করি তম
সে বংশী আমারি চিত্ত, রন্ধ্রে তারি উঠিছে গুঞ্জরি—
মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবীমঞ্জরী,
নির্ঝরে কল্লোল।

তাহারি ছন্দের ভঙ্গে সর্ব অঙ্গে উঠিছে সঞ্চরি
জীবনহিল্লোল।

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী ;
আয়ুস্রোতমুখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে— কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।
আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্ফুরিত
উৎকণ্ঠার বেগে যেন শেফালির শিশিরচ্ছুরিত
উৎসুক আলোক।
তরঙ্গহিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে পূরিত
করে মুগ্ধ চোখ।

তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভরে
কেই বা সে জানে।
কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্তপ্রাণে।
তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা ;
মুহূর্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মুছে যায় সরে।
তেমনি সহজ হোক হাসিকান্না ভাবনাবেদনা—
না বাঁধুক মোরে।

তারা সবে মিলে থাক্ অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে,
শ্রাবণবর্ষণে ;
যোগ দিক নির্ঝরের মঞ্জীরগুঞ্জনকলরবে
উপলঘর্ষণে।
ঝঞ্ঝার-মদিরা-মত্ত বৈশাখের তাণ্ডবলীলায়
বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব বিলায়,
সঙ্গে যেন থাকে।
তার পরে যেন তারা সর্বহারা দিগন্তে মিলায়,
চিহ্ন নাহি রাখে।

হে রবি, প্রাঙ্গণে তব শরতের সোনার বাঁশিতে
জাগিল মূর্ছনা।
আলোতে শিশিরে বিশ্ব দিকে দিকে অশ্রুতে হাসিতে
চঞ্চল উন্মনা।

জানি না কী মত্ততায়, কী আহ্বানে আমার রাগিণী
ধেয়ে যায় অন্যমনে শূন্যপথে হয়ে বিবাগিনী
লয়ে তার ডালি।
সে কি তব সভাস্থলে স্বপ্নাবেশে চলে একাকিনী
আলোর কাঙালি?

দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হল শেষ—
বুকে লও তারে।
শান্তি-অভিষেক হোক; ধৌত হোক সকল আবেশ
অগ্নি-উৎসধারে।
সীমন্তে গোধূলিলগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দূর,
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোকবিন্দুর
তার স্নিগ্ধ ভালে।
দিনান্তসংগীতধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক সিন্ধুর
তরঙ্গের তালে।

হারুনা-মারু জাহাজ
২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৪

## পূর্ণতা

স্তব্ধরাতে একদিন
নিদ্রাহীন
আবেগের আন্দোলনে তুমি
বলেছিলে নতশিরে
অশ্রুনীরে
ধীরে মোর করতল চুমি—
'তুমি দূরে যাও যদি
নিরবধি
শূন্যতার সীমাশূন্য ভারে
সমস্ত ভুবন মম
মরুসম
রুক্ষ হয়ে যাবে একেবারে।
আকাশবিস্তীর্ণ ক্লান্তি
সব শান্তি
চিত্ত হতে করিবে হরণ—

নিরানন্দ নিরালোক
স্তব্ধ শোক
মরণের অধিক মরণ।'

২

শুনে, তোর মুখখানি
বক্ষে আনি
বলেছিনু তোরে কানে কানে—
'তুই যদি যাস দূরে
তোরি সুরে
বেদনাবিদ্যুৎ গানে গানে
ঝলিয়া উঠিবে নিত্য,
মোর চিত্ত
সচকিবে আলোকে আলোকে।
বিরহ বিচিত্র খেলা
সারা বেলা
পাতিবে আমার বক্ষে চোখে।
তুমি খুঁজে পাবে প্রিয়ে,
দূরে গিয়ে
মর্মের নিকটতম দ্বার—
আমার ভুবনে তবে
পূর্ণ হবে
তোমার চরম অধিকার।'

৩

দুজনের সেই বাণী,
কানাকানি,
শুনেছিল সপ্তর্ষির তারা—
রজনীগন্ধার বনে
ক্ষণে ক্ষণে
বহে গেল সে বাণীর ধারা।
তার পরে চুপে চুপে
মৃত্যুরূপে
মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার।

দেখাশুনা হল সারা,
স্পর্শহারা
সে অনন্তে বাক্য নাহি আর।
তবু শূন্য শূন্য নয়,
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।
একা-একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।

হারুনা-মারু জাহাজ
১ অক্টোবর ১৯২৪

## পদধ্বনি

আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে
আশঙ্কার পরশনে
হরিণের থরথর হৃৎপিণ্ড যেমন—
সেইমতো রাত্রি দ্বিপ্রহরে
শয্যা মোর ক্ষণতরে
সহসা কাঁপিল অকারণ।
পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
শুনিনু তখনি?
মোর জন্মনক্ষত্রের অদৃশ্যজগতে
মোর ভাগ্য মোর তরে বার্তা লয়ে ফিরিছে কি পথে?

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি?
অজানার যাত্রী কে গো? ভয়ে কেঁপে উঠিল ধরণী।
এই কি নির্মম সেই যে আপন চরণের তলে
পদে পদে চিরদিন
উদাসীন
পিছনের পথ মুছে চলে?
এ কি সেই নিত্যশিশু, কিছু নাহি চাহে—
নিজের খেলেনাচূর্ণ
ভাসাইছে অসম্পূর্ণ
খেলার প্রবাহে।
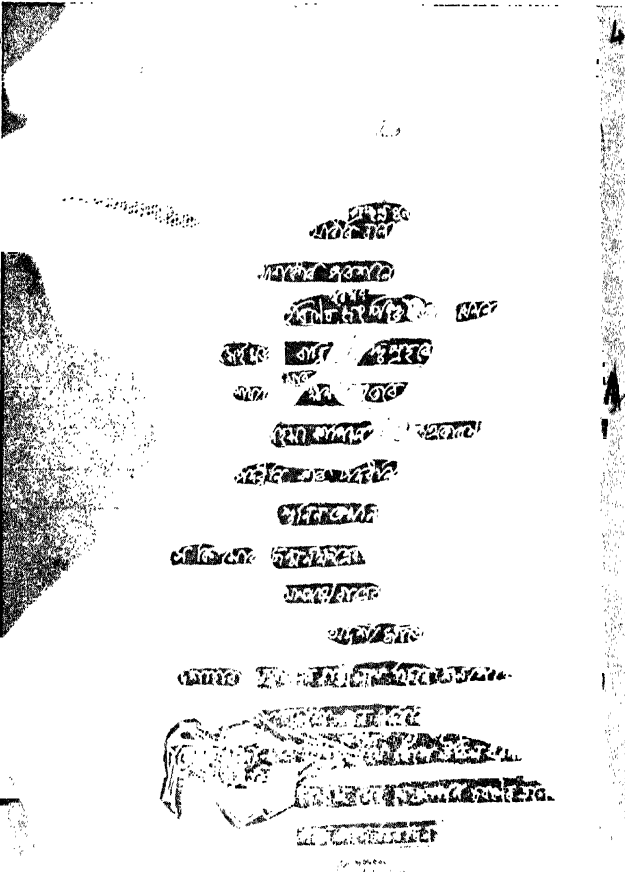
ভাঙিয়া স্বপ্নের ঘোর,
ছিঁড়ি মোর
শয্যার বন্ধনমোহ, এ রাত্রিবেলায়
মোরে কি করিবে সঙ্গী প্রলয়ের ভাসানখেলায় ?

হোক তাই,
ভয় নাই, ভয় নাই,
এ খেলা খেলেছি বারংবার
জীবনে আমার।
জানি জানি, ভাঙিয়া নূতন করে তোলা
ভুলায়ে পূর্ব্বের পথ অপূর্ব্বের পথে দ্বার খোলা ;
বাঁধন গিয়েছে যবে চুকে
তারি ছিন্ন রশিগুলি কুড়ায়ে কৌতুকে
বার বার গাঁথা হল দোলা।
নিয়ে যত মুহূর্ত্তের ভোলা
চিরস্মরণের ধন
গোপনে হয়েছে আয়োজন।

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
চিরদিন শুনেছি এমনি
বারে বারে ?
এ কি বাজে মৃত্যুসিন্ধুপারে ?
এ কি মোর আপন বক্ষেতে ?
ডাকে মোরে ক্ষণে ক্ষণে কিসের সংকেতে ?
তবে কি হবেই যেতে ?
সব বন্ধ করিব ছেদন ?
ওগো কোন্ বন্ধু তুমি কোন্ সঙ্গী দিতেছ বেদন
বিচ্ছেদের তীর হতে ?
তরী কি ভাসাব স্রোতে ?
হে বিরহী,
আমার অন্তরে দাও কহি—
ডাকো মোরে কী খেলা খেলাতে
আতঙ্কিত নিশীথবেলাতে।

বারে বারে দিয়েছ নিঃসঙ্গ করি ;
এ শূন্য প্রাণের পাত্র কোন্ সঙ্গসুধা দিয়ে ভরি
তুলে নেবে মিলন-উৎসবে ?

সূর্যাস্তের পথ দিয়ে যবে
সন্ধ্যাতারা উঠে আসে নক্ষত্রসভায়,
প্রহর না যেতে যেতে
কী সংকেতে
সব সঙ্গ ফেলে রেখে অস্তপথে ফিরে চলে যায়।
সেও কি এমনি
শোনে পদধ্বনি ?
তারে কি বিরহী
বলে কিছু দিগন্তের অন্তরালে রহি ?
পদধ্বনি, কার পদধ্বনি ?
দিনশেষে
কম্পিত বক্ষের মাঝে এসে
কী শব্দে ডাকিছে কোন্ অজানা রজনী ?

আন্ডেস জাহাজ
২৪ অক্টোবর ১৯২৪

## কৃতজ্ঞ

বলেছিনু 'ভুলিব না' যবে তব ছলছল আঁখি
নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা কোরো যদি ভুলে থাকি।
সে যে বহুদিন হল। সেদিনের চুম্বনের 'পরে
কত নববসন্তের মাধবীমঞ্জরী থরে থরে
শুকায়ে পড়িয়া গেছে ; মধ্যাহ্নের কপোতকাকলি
তারি 'পরে ক্লান্ত ঘুম চাপা দিয়ে এল গেল চলি
কতদিন ফিরে ফিরে। তব কালো নয়নের দিঠি
মোর প্রাণে লিখেছিল প্রথম প্রেমের সেই চিঠি
লজ্জাভয়ে ; তোমার সে হৃদয়ের স্বাক্ষরের 'পরে
চঞ্চল আলোকছায়া কত কাল প্রহরে প্রহরে
বুলায়ে গিয়েছে তুলি, কত সন্ধ্যা দিয়ে গেছে এঁকে
তারি 'পরে সোনার বিস্মৃতি, কত রাত্রি গেছে রেখে
অস্পষ্ট রেখার জালে আপনার স্বপনলিখন
তাহারে আচ্ছন্ন করি। প্রতিমুহূর্তটি প্রতিক্ষণ
বাঁকাচোরা নানা চিত্রে চিন্তাহীন বালকের প্রায়
আপনার স্মৃতিলিপি চিত্তপটে এঁকে এঁকে যায়,
লুপ্ত করি পরস্পরে বিস্মৃতির জাল দেয় বুনে।

সেদিনের ফাল্গুনের বাণী যদি আজি এ ফাল্গুনে
ভুলে থাকি, বেদনার দীপ হতে কখন নীরবে
অগ্নিশিখা নিবে গিয়ে থাকে যদি, ক্ষমা কোরো তবে।
তবু জানি, একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে বলে
গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফলে,
আজো নাই শেষ ; রবির আলোক হতে একদিন
ধ্বনিয়া তুলেছে তার মর্মবাণী, বাজায়েছে বীন
তোমার আঁখির আলো। তোমার পরশ নাহি আর,
কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার—
বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে, অকারণ-আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায় পান। ক্ষমা কোরো যদি ভুলে থাকি।
তবু জানি, একদিন তুমি মোরে নিয়েছিলে ডাকি
হৃদিমাঝে ; আমি তাই আমার ভাগ্যেরে ক্ষমা করি—
যত দুঃখে যত শোকে দিন মোর দিয়েছে সে ভরি
সব ভুলে গিয়ে। পিপাসার জলপাত্র নিয়েছে সে
মুখ হতে, কতবার ছলনা করেছে হেসে হেসে,
ভেঙেছে বিশ্বাস, অকস্মাৎ ডুবায়েছে ভরা তরী
তীরের সম্মুখে নিয়ে এসে— সব তার ক্ষমা করি।
আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দূরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রীহীন—
সব মানি— সবচেয়ে মানি, তুমি ছিলে একদিন।

আণ্ডেস জাহাজ ২ নভেম্বর ১৯২৪

## অন্তর্হিতা

প্রদীপ যখন নিবেছিল,
আঁধার যখন রাতি,
দুয়ার যখন বন্ধ ছিল,
ছিল না কেউ সাথি,
মনে হল, অন্ধকারে
কে এসেছে বাহিরদ্বারে—
মনে হল, শুনি যেন
পায়ের ধ্বনি কার—

রাতের হাওয়ায় বাজল বুঝি
কঙ্কণঝংকার।

বারেক শুধু মনে হল,
খুলি, দুয়ার খুলি।
ক্ষণেক পরে ঘুমের ঘোরে
কখন গেনু ভুলি।
'কোন্ অতিথি দ্বারের কাছে
একলা রাতে বসে আছে'
ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রা ভেঙে
মন শুধাল যবে,
বলেছিলেম, 'আর কিছু নয়,
স্বপ্ন আমার হবে।'

মাঝ-গগনে সপ্ত-ঋষি
স্তব্ধ গভীর রাতে
জানলা হতে আমায় যেন
ডাকল ইশারাতে।
মনে হল, শয়ন ফেলে
দিই-না কেন আলো জ্বেলে—
আলসভরে রইনু শুয়ে,
হল না দীপ জ্বালা।
প্রহর-পরে কাটল প্রহর,
বন্ধ রইল তালা।

জাগল কখন দখিন হাওয়া
কাঁপল বনের হিয়া,
স্বপ্নে-কথা-কওয়ার মতো
উঠল মর্মরিয়া।
যূথীর গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে
মূর্ছিল মোর বাতায়নে,
শিহর দিয়ে গেল আমার
সকল অঙ্গ চুমে।
জেগে উঠে আবার কখন
ভরল নয়ন ঘুমে।

ভোরের তারা পুবগগনে
যখন হল গত
বিদায়রাতির একটি ফোঁটা
চোখের জলের মতো,
হঠাৎ মনে হল তবে,
যেন কাহার করুণ রবে
শিরীষফুলের গন্ধে আকুল
বনের বীথি ব্যেপে
শিশিরভেজা তৃণগুলি
উঠল কেঁপে কেঁপে।

শয়ন ছেড়ে উঠে তখন
খুলে দিলেম দ্বার—
হায় রে, ধুলায় বিছিয়ে গেছে
যূথীর মালা কার।
ওই যে দূরে নয়ন নত,
বনের ছায়ায় ছায়ার মতো
মায়ার মতো মিলিয়ে গেল
অরুণ-আলোয় মিশে,
ওই বুঝি মোর বাহিরদ্বারের
রাতের অতিথি সে।

আজ হতে মোর ঘরের দুয়ার
রাখব খুলে রাতে।
প্রদীপখানি রইবে জ্বালা
বাহির-জানালাতে।
আজ হতে কার পরশ লাগি
পথ তাকিয়ে রইব জাগি ;
আর কোনোদিন আসবে না কি
আমার পরান ছেয়ে
যূথীর মালার গন্ধখানি
রাতের বাতাস বেয়ে।

বুয়েনোস এয়ারিস
১৬ নভেম্বর ১৯২৪

## শেষ বসন্ত

আজিকার দিন না ফুরাতে
হবে মোর এ আশা পুরাতে—
শুধু এবারের মতো
বসন্তের ফুল যত
যাব মোরা দুজনে কুড়াতে।
তোমার কাননতলে ফাল্গুন আসিবে বারংবার,
তাহারি একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার।

বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই
এতকাল ভুলে ছিনু তাই।
হঠাৎ তোমার চোখে
দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে
আমার সময় আর নাই।
তাই আমি একে একে গনিতেছি কৃপণের সম
ব্যাকুল সংকোচভরে বসন্তশেষের দিন মম।

ভয় রাখিয়ো না তুমি মনে ;
তোমার বিকচ ফুলবনে
দেরি করিব না মিছে,
ফিরে চাহিব না পিছে
দিনশেষে বিদায়ের ক্ষণে।
চাব না তোমার চোখে আঁখিজল পাব আশা করি
রাখিবারে চিরদিন স্মৃতিরে করুণারসে ভরি।

ফিরিয়া যেয়ো না, শোনো শোনো,
সূর্য অস্ত যায় নি এখনো।
সময় রয়েছে বাকি ;
সময়েরে দিতে ফাঁকি
ভাবনা রেখো না মনে কোনো।
পাতার আড়াল হতে বিকালের আলোটুকু এসে
আরো কিছুখন ধরে ঝলুক তোমার কালো কেশে।

হাসিয়ো মধুর উচ্চহাসে
অকারণ নির্মম উল্লাসে,

বনসরসীর তীরে
ভীরু কাঠবিড়ালিরে
সহসা চকিত কোরো ত্রাসে।
ভুলে-যাওয়া কথাগুলি কানে কানে করায়ে স্মরণ
দিব না মন্থর করি ওই তব চঞ্চল চরণ।

তার পরে যেয়ো তুমি চলে
ঝরা পাতা দ্রুতপদে দ'লে
নীড়ে-ফেরা পাখি যবে
অস্ফুট কাকলিরবে
দিনান্তেরে ক্ষুব্ধ করি তোলে।
বেণুবনচ্ছায়াঘন সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে
মিলাইবে গোধূলির বাঁশরির সর্বশেষ সুরে।

রাত্রি যবে হবে অন্ধকার
বাতায়নে বসিয়ো তোমার।
সব ছেড়ে যাব, প্রিয়ে,
সমুখের পথ দিয়ে,
ফিরে দেখা হবে না তো আর।
ফেলে দিয়ো ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি।
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।

বুয়েনোস এয়ারিস
২১ নভেম্বর ১৯২৪

## মিলন

জীবনমরণের স্রোতের ধারা
যেখানে এসে গেছে থামি
সেখানে মিলেছিনু সময়হারা
একদা তুমি আর আমি।
চলেছি আজ একা ভেসে
কোথা যে কত দূর দেশে,
তরণী দুলিতেছে ঝড়ে—
এখন কেন মনে পড়ে,
যেখানে ধরণীর সীমার শেষে

স্বর্গ আসিয়াছে নামি
সেখানে একদিন মিলেছি এসে
কেবল তুমি আর আমি।

সেখানে বসেছিনু আপনাভোলা
আমরা দোঁহে পাশে পাশে।
সেদিন বুঝেছিনু কিসের দোলা
দুলিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে।
কিসের খুশি উঠে কেঁপে
নিখিল চরাচর ব্যেপে,
কেমনে আলোকের জয়
আঁধারে হল তারাময়,
প্রাণের নিশ্বাস কী মহাবেগে
ছুটেছে দশদিক্‌গামী—
সেদিন বুঝেছিনু যেদিন জেগে
চাহিনু তুমি আর আমি।

বিজনে বসেছিনু আকাশে চাহি
তোমার হাত নিয়ে হাতে।
দোঁহার কারো মুখে কথাটি নাহি,
নিমেষ নাহি আঁখিপাতে।
সেদিন বুঝেছিনু প্রাণে
ভাষার সীমা কোন্‌খানে,
বিশ্বহৃদয়ের মাঝে
বাণীর বীণা কোথা বাজে,
কিসের বেদনা সে বনের বুকে
কুসুমে ফুটে দিনযামী—
বুঝিনু যবে দোঁহে ব্যাকুল সুখে
কাঁদিনু তুমি আর আমি।

বুঝিনু কী আগুনে ফাগুনহাওয়া
গোপনে আপনারে দাহে,
কেন-যে অরুণের করুণ চাওয়া
নিজেরে মিলাইতে চাহে,
অকূলে হারাইতে নদী
কেন যে ধায় নিরবধি.

বিজুলি আপনার বাণে
কেন যে আপনারে হানে,
রজনী কী খেলা যে প্রভাতসনে
খেলিছে পরাজয়কামী—
বুঝিনু যবে দোঁহে পরানপণে
খেলিনু তুমি আর আমি।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
৯ জানুয়ারি ১৯২৫

## বদল

হাসির কুসুম আনিল সে ডালি ভরি
আমি আনিলাম দুখবাদলের ফল।
শুধালেম তারে, 'যদি এ বদল করি,
হার হবে কার বল্।'
হাসি কৌতুকে কহিল সে সুন্দরী,
'এসো-না, বদল করি।
দিয়ে মোর হার লব ফলভার
অশ্রুর রসে ভরা।'
চাহিয়া দেখিনু মুখপানে তার—
নিদয়া সে মনোহরা।

সে লইল তুলে আমার ফলের ডালা,
করতালি দিল হাসিয়া সকৌতুকে
আমি লইলাম তাহার ফুলের মালা,
তুলিয়া ধরিনু বুকে।
'মোর হল জয়' হেসে হেসে কয়,
দূরে চলে গেল ত্বরা।
উঠিল তপন মধ্যগগনদেশে,
আসিল দারুণ খরা।
সন্ধ্যায় দেখি তপ্তদিনের শেষে
ফুলগুলি সব ঝরা।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
১৭ জানুয়ারি ১৯২৫

## স্বপ্ন আমার জোনাকি

স্বপ্ন আমার জোনাকি
দীপ্ত প্রাণের মণিকা,
স্তব্ধ আঁধার নিশীথে
উড়িছে আলোর কণিকা ॥

## স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল

স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল
ক্ষণকালের ছন্দ।
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল
সেই তারি আনন্দ ॥

## সুন্দরী ছায়ার পানে

সুন্দরী ছায়ার পানে তরু চেয়ে থাকে,
সে তার আপন, তবু পায় না তাহাকে ॥

## আকাশের নীল

আকাশের নীল
বনের শ্যামলে চায়।
মাঝখানে তার
হাওয়া করে হায় হায় ॥

## মাটির প্রদীপ

মাটির প্রদীপ সারাদিবসের অবহেলা লয় মেনে,
রাতের শিখার চুম্বন পাবে জেনে ॥

## পথে হল দেরি

পথে হল দেরি, ঝরে গেল চেরী।
দিন বৃথা গেল, প্রিয়া।
তবুও তোমার ক্ষমা-হাসি বহি।
দেখা দিল আজেলিয়া॥

## পর্বতমালা আকাশের পানে

পর্বতমালা আকাশের পানে চাহিয়া না কহে কথা,
অগমের লাগি ওরা ধরণীর স্তম্ভিত ব্যাকুলতা॥

## ফুলগুলি যেন কথা

ফুলগুলি যেন কথা,
পাতাগুলি যেন চারি দিকে তার
পুঞ্জিত নীরবতা॥

## যত বড়ো হোক

যত বড়ো হোক ইন্দ্রধনু সে
সুদূর আকাশে আঁকা,
আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর
প্রজাপতিটির পাখা॥

## বহু দিন ধরে

বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু॥

## দিনের আলো

দিনের আলো নামে যখন
ছায়ার অতলে
আমি আসি ঘট ভরিবার ছলে
একলা দিঘির জলে।
তাকিয়ে থাকি, দেখি, সঙ্গীহারা
একটি সন্ধ্যাতারা
ফেলেছে তার ছায়াটি এই
কমলসাগরে।

ডোবে না সে, নেবে না সে,
ঢেউ দিলে সে যায় না তবু স'রে
যেন আমার বিফল রাতের
চেয়ে থাকার স্মৃতি
কালের কালো পটের 'পরে
রইল আঁকা নিতি।
মোর জীবনের ব্যর্থ দীপের
অগ্নিরেখার বাণী
ওই যে ছায়াখানি।

## তুমি বাঁধছ নূতন বাসা

তুমি বাঁধছ নূতন বাসা,
আমার ভাঙছে ভিত।
তুমি খুঁজছ লড়াই, আমার
মিটেছে হারজিত॥
তুমি বাঁধছ সেতারে তার,
থামছি সমে এসে।
চক্ররেখা পূর্ণ হল
আরম্ভে আর শেষে॥

## তুমি যে তুমিই

তুমি যে তুমিই, ওগো
  সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে
  শুধি চিরদিন ॥

## দুই পারে দুই কূলের

দুই পারে দুই কূলের আকুল প্রাণ,
  মাঝে সমুদ্র অতল বেদনাগান ॥

## বৃক্ষবন্দনা

অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ ;
ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে ; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।

  সেদিন অম্বর-মাঝে
শ্যামে নীলে মিশ্রমন্ত্রে স্বর্গলোকে জ্যোতিষ্কসমাজে
মর্ত্যের মাহাত্ম্যগান করিলে ঘোষণা। যে জীবন
মরণতোরণদ্বার বারংবার করি উত্তরণ
যাত্রা করে যুগে যুগে অনন্তকালের তীর্থপথে
নব নব পান্থশালে বিচিত্র নূতন দেহরথে,
তাহারি বিজয়ধ্বজা উড়াইলে নিঃশঙ্ক গৌরবে
অজ্ঞাতের সম্মুখে দাঁড়ায়ে। তোমার নিঃশব্দ রবে
প্রথম ভেঙেছে স্বপ্ন ধরিত্রীর, চমকি উল্লসি
নিজেরে পড়েছে তার মনে— দেবকন্যা দুঃসাহসী
কবে যাত্রা করেছিল জ্যোতিঃস্বর্গ ছাড়ি দীনবেশে
পাংশুম্লান গৈরিকবসন-পরা, খণ্ড কালে দেশে
অমরার আনন্দেরে খণ্ড খণ্ড ভোগ করিবারে,
দুঃখের সংঘাতে তারে বিদীর্ণ করিয়া বারে বারে
নিবিড় করিয়া পেতে।

মৃত্তিকার হে বীর সন্তান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে ; যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে ;
সন্তরি সমুদ্র-ঊর্মি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে
শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়,
দুস্তর শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয়-আখ্যানলিপি লিখি দিলে পল্লব-অক্ষরে
ধূলিরে করিয়া মুগ্ধ, চিহ্নহীন প্রান্তরে প্রান্তরে
ব্যাপিলে আপন পন্থা।

বাণীশূন্য ছিল একদিন
জলস্থল শূন্যতল, ঋতুর- উৎসবমন্ত্র-হীন—
শাখায় রচিলে তব সংগীতের আদিম আশ্রয়,
যে গানে চঞ্চল বায়ু নিজের লভিল পরিচয়,
সুরের বিচিত্র বর্ণে আপনার দৃশ্যহীন তনু
রঞ্জিত করিয়া নিল, অঙ্কিল গানের ইন্দ্রধনু
উত্তরীর প্রান্তে প্রান্তে। সুন্দরের প্রাণমূর্তিখানি
মৃত্তিকার মর্তাপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি
টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্যলোক হতে,
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বর্ণিলে আলোতে।
ইন্দ্রের অপ্সরী আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি লীলানৃত্যে করেছে বর্ষণ
যৌবন-অমৃতরস, তুমি তাই নিলে ভরি ভরি
আপনার পত্রপুষ্পপুটে, অনন্তযৌবনা করি
সাজাইলে বসুন্ধরা।

হে নিস্তব্ধ, হে মহাগম্ভীর,
বীর্যেরে বাঁধিয়া ধৈর্যে শান্তিরূপ দেখালে শক্তির ;
তাই আসি তোমার আশ্রয়ে শান্তিদীক্ষা লভিবারে,
শুনিতে মৌনের মহাবাণী ; দুশ্চিন্তার গুরুভারে
নতশীর্ষ বিলুণ্ঠিতে শ্যামসৌম্যচ্ছায়াতলে তব—
প্রাণের উদার রূপ, রসরূপ নিত্য নব নব,
বিশ্বজয়ী বীররূপ ধরণীর, বাণীরূপ তার
লভিতে আপন প্রাণে। ধ্যানবলে তোমার মাঝার
গেছি আমি, জেনেছি, সূর্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিরূপে
সৃষ্টিযজ্ঞে যেই হোম, তোমার সত্তায় চুপে চুপে

ধরে তাই শ্যামস্নিগ্ধরূপ ; ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী,
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই
যে তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে তাই করি দান
করেছ জগৎজয়ী ; দিলে তারে পরম সম্মান ;
হয়েছে সে দেবতার প্রতিস্পর্ধী— সে অগ্নিচ্ছটায়
প্রদীপ্ত তাহার শক্তি বিশ্বতলে বিস্ময় ঘটায়
ভেদিয়া দুঃসাধ্য বিঘ্নবাধা। তব প্রাণে প্রাণবান,
তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীয়ান,
সজ্জিত তোমার মাল্যে যে মানব, তারি দূত হয়ে
ওগো মানবের বন্ধু, আজি এই কাব্য-অর্ঘ্য লয়ে
শ্যামের বাঁশির তানে মুগ্ধ কবি আমি
অর্পিলাম তোমায় প্রণামী।

[শান্তিনিকেতন]
৯ চৈত্র ১৩৩৩

## সাগরিকা

সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে
শিথিল পীতবাস
মাটির 'পরে কুটিলরেখা লুটিল চারি পাশ।
নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।
মকরচূড় মুকুটখানি পরি ললাট-'পরে
ধনুকবাণ ধরি দখিন করে
দাঁড়ানু রাজবেশী ;
কহিনু, 'আমি এসেছি পরদেশী।'

চমকি ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি শিলা-আসন ফেলে ;
শুধালে, 'কেন এলে।'
কহিনু আমি, 'রেখো না ভয় মনে,
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুলবনে।'
চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকূল ;
তুলিনু যূথী, তুলিনু জাতী, তুলিনু চাঁপা ফুল।

দুজনে মিলি সাজায়ে ডালি বসিনু একাসনে,
নটরাজেরে পূজিনু একমনে।
কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল-যে পরকাশি
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।

সন্ধ্যাতারা উঠিল যবে গিরিশিখর-'পরে
একেলা ছিলে ঘরে।
কটিতে ছিল নীল দুকূল, মালতীমালা মাথে,
কাঁকন-দুটি ছিল দুখানি হাতে।
চলিতে পথে বাজায়ে দিনু বাঁশি,
'অতিথি আমি' কহিনু দ্বারে আসি।
তরাসভরে চকিত-করে প্রদীপখানি জ্বেলে
চাহিলে মুখে ; কহিলে, 'কেন এলে।'
কহিনু আমি, 'রেখো না ভয় মনে,
তনু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে।'
চাহিলে হাসিমুখে,
আধো-চাঁদের কনকমালা দোলানু তব বুকে।
মকরচূড় মুকুটখানি কবরী তব ঘিরে
পরায়ে দিনু শিরে।
জ্বালায়ে বাতি মাতিল সখীদল,
তোমার দেহে রতনসাজ করিল ঝলমল্।
মধুর হল, বিধুর হল মাধবী নিশীথিনী,
আমার তালে তোমার নাচে মিলিল রিনিঝিনি।
পূর্ণ চাঁদ হাসে আকাশকোলে,
আলোকছায়া শিবশিবানী সাগরজলে দোলে।

ফুরাল দিন কখন নাহি জানি,
সন্ধ্যাবেলা ভাসিল জলে আবার তরীখানি।
সহসা বায়ু বহিল প্রতিকূলে,
প্রলয় এল সাগরতলে দারুণ ঢেউ তুলে।
লবণজলে ভরি
আঁধার রাতে ডুবাল মোর রতনভরা তরী।

আবার ভাঙা ভাগ্য নিয়ে দাঁড়ানু দ্বারে এসে
ভূষণহীন মলিনদীন বেশে।
দেখিনু আমি নটরাজের দেউলদ্বার খুলি
তেমনি করে রয়েছে ভরে ডালিতে ফুলগুলি।

হেরিনু রাতে উতল উৎসবে
তরল কলরবে
আলোর নাচ-নাচায় চাঁদ সাগরজলে যবে
নীরব তব নম্র নত মুখে
আমারই আঁকা পত্রলেখা, আমারই মালা বুকে।
দেখিনু চুপে চুপে,
আমারই বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিতগীতকলিত কল্লোলে।

মিনতি মম শুন হে সুন্দরী,
আরেক বার সমুখে এসো প্রদীপখানি ধরি।
এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুকবাণ নাহি আমার হাতে—
এবার আমি আনি নি ডালি দখিনসমীরণে
সাগরকূলে তোমার ফুলবনে।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কি না।

মায়ার জাহাজ
১ অক্টোবর। ১৯২৭

## বিচ্ছেদ

রাত্রি যবে সাঙ্গ হল, দূরে চলিবারে
দাঁড়াইলে দ্বারে।
আমার কণ্ঠের যত গান
করিলাম দান।
তুমি হাসি
মোর হাতে দিলে তব বিরহের বাঁশি।
তার পরদিন হতে
বসন্তে শরতে
আকাশে বাতাসে উঠে খেদ,
কেঁদে কেঁদে ফিরে বিশ্বে বাঁশি আর গানের বিচ্ছেদ।

[বাঙ্গালোর]
৯ আষাঢ় ১৩৩৫

## বিদায়

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও।
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন,
চক্রেপিষ্ট আঁধারের বক্ষফাটা তারার ক্রন্দন।

ওগো বন্ধু,
সেই ধাবমান কাল
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল—
তুলে নিল দ্রুতরথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে
তোমা হতে বহুদূরে।
মনে হয়, অজস্র মৃত্যুরে
পার হয়ে আসিলাম
আজি নবপ্রভাতের শিখরচূড়ায়—
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম।
ফিরিবার পথ নাহি;
দূর হতে যদি দেখ চাহি
পারিবে না চিনিতে আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে,
বসন্তবাতাসে
অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,
সেই ক্ষণে খুঁজে দেখো— কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে; বিস্মৃতিপ্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মুরতি।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়—
সবচেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে।

পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

তোমার হয় নি কোনো ক্ষতি—
মর্ত্যের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃতমুরতি
যদি সৃষ্টি করে থাক, তাহারি আরতি
হোক তব সন্ধ্যাবেলা,
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ লেগে ;
তৃষার্ত আবেগবেগে
ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে।
তোমার মানসভোজে সযত্নে সাজালে
যে ভাবরসের পাত্র বাণীর তৃষায়
তার সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে।
আজও তুমি নিজে
হয়তো-বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন—
ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই—
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।
উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সেই ধন্য করিবে আমাকে।
শুক্লপক্ষ হতে আনি
রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণপক্ষ-রাতে,
যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।

তোমারে যা দিয়েছিনু তার
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম।
ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান্,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান—
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

ব্যালাব্রুয়ি। বাঙ্গালোর
২৫ জুন। ১৯২৮

## অশ্রু

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া
এনেছ অশ্রুজল।
এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়া
দুঃসহ হোমানল।
দুঃখ যে তাই উজ্জ্বল হয়ে উঠে,
মুগ্ধ প্রাণের আবেশবন্ধ টুটে,
এ তাপে শ্বসিয়া উঠে বিকশিয়া
বিচ্ছেদশতদল।

[বাঙ্গালোর
আষাঢ়। ১৩৩৫]

## পথের বাঁধন

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চল্‌তি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য,

হঠাৎ-আলোর ঝল্‌কানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।

নাই আমাদের কনকচাঁপার কুঞ্জ,
বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।
হঠাৎ কখন্ সন্ধ্যাবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,
প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে
অরুণকিরণে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেনড্রন্-গুচ্ছ।

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
নাই রে ঘরের লালনললিত যত্ন,
পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তারে করি না খাঁচায়,
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের
কূজনে দুজনে তৃপ্ত।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের
ক্বচিৎ-কিরণে দীপ্ত।

[বাঙ্গালোর]
আষাঢ় ১৩৩৫

## নির্ভয়

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে,
ভাগ্যের পায়ে দুর্বলপ্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়—
তুমি আছ, আমি আছি।

উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথমাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব—
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি,
ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব—
তুমি আছ, আমি আছি।

দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ,
দোঁহারে দেখেছি দোঁহে—
মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
ছুটি নি মোহন মরীচিকা পিছে পিছে,
ভুলাই নি মন সত্যেরে করি মিছে—
এই গৌরবে চলিব এ ভবে
যতদিন দোঁহে বাঁচি।
এ বাণী প্রেয়সী, হোক মহীয়সী
তুমি আছ, আমি আছি।

৩১ শ্রাবণ ১৩৩৫

## সবলা

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা।
নত করি মাথা
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে।
শুধু শূন্যে চেয়ে রব ? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ।
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্গাপাশে।
দুর্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন

কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি পণ।

যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী—
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।
বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন,
সে লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে।
কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা।
বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার—
ফেলে দেব আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।

দেখা হবে ক্ষুব্ধসিন্ধুতীরে—
তরঙ্গগর্জনোচ্ছ্বাস মিলনের বিজয়ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে।
মাথার গুণ্ঠন খুলি কব তারে, মর্ত্যে বা ত্রিদিবে
একমাত্র তুমিই আমার।
সমুদ্রপাখির পক্ষে সেই ক্ষণে উঠিবে হুংকার
পশ্চিম পবন হানি,
সপ্তর্ষি-আলোকে যবে যাবে তারা পন্থা অনুমানি।

হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা,
রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।
উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের 'পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে
নির্বারিত স্রোতে।
যাহা মোর অনির্বচনীয়
তারে যেন চিত্তমাঝে পায় মোর প্রিয়।
সময় ফুরায় যদি, তবে তার পরে
শান্ত হোক সে নির্ঝর নৈঃশব্দ্যের নিস্তব্ধ সাগরে।

৭ ভাদ্র ১৩৩৫

## রাখিপূর্ণিমা

কাহারে পরাব রাখি যৌবনের রাখিপূর্ণিমায়
হে মোর ভাগ্যের দেব ! লগ্ন যেন বহে নাহি যায়।
মেঘে আজি আবিষ্ট অম্বর ; ঘনবৃষ্টি-আচ্ছাদনে
অস্পষ্ট আলোর মন্ত্র আকাশ নিবিষ্ট হয়ে শোনে,
বুঝিতে পারে না ভালো। আমি ভাবিতেছি একা বসে,
আমার বাঞ্ছিত কবে বাহিরিল প্রচ্ছন্ন প্রদোষে
চিহ্নহীন পথে। এসেছিল দ্বারের সম্মুখে মোর
ক্ষণতরে। তখনো রজনী মম হয় নাই ভোর,
হৃদয় অস্ফুট ছিল অর্ধজাগরণে। ডাকে নি সে
নাম ধরে, দুয়ারে করে নি করাঘাত, গেছে মিশে
সমুদ্রতরঙ্গরবে তাহার অশ্বের হ্রেষাধ্বনি।
হে বীর অপরিচিত, শেষ হল আমার রজনী—
জানা তো হল না কোন্ দুঃসাধ্যের সাধন লাগিয়া
অস্ত্র তব উঠিল ঝঞ্ঝনি। আমি রহিনু জাগিয়া।

১৫ ভাদ্র ১৩৩৫

## শিশুতীর্থ

রাত কত হল ?
উত্তর মেলে না।
কেননা, অন্ধ কাল যুগযুগান্তরের গোলকধাঁধায় ঘোরে,
পথ অজানা—
পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।
পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো,
স্তূপে স্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেছে ;
পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্তে সংলগ্ন,
মনে হয় নিশীথরাত্রের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ;
দিগন্তে একটা আগ্নেয় উগ্রতা
ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে আর নেভে—
ও কি কোনো অজানা দুষ্টগ্রহের চোখ-রাঙানি !
ও কি কোনো অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা !
বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো যেন বিকারের প্রলাপ,
অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিলীন উচ্ছিষ্ট—

তারা অমিতাচারী দৃপ্ত প্রতাপের ভগ্ন তোরণ,
লুপ্ত নদীর বিস্মৃতিবিলগ্ন জীর্ণ সেতু,
দেবতাহীন দেউলের সর্পবিবরছিদ্রিত বেদী,
অসমাপ্ত দীর্ণ সোপানপঙ্ক্তি শূন্যতায় অবসিত।
অকস্মাৎ উচ্চণ্ড কলরব আকাশে আবর্তিত
আলোড়িত হতে থাকে—
ও কি বন্দী বন্যাবারির গুহাবিদারণের রলরোল!
ও কি ঘূর্ণতাণ্ডবী উন্মাদ সাধকের রুদ্রমন্ত্র-উচ্চারণ!
ও কি দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের আত্মঘাতী প্রলয়নিনাদ!
এই ভীষণ কোলাহলের তলে তলে
একটা অস্ফুট ধ্বনিধারা বিসর্পিত—
যেন অগ্নিগিরিনিঃসৃত গদ্‌গদকলমুখর পঙ্কস্রোত;
তাতে একত্রে মিলেছে পরশ্রীকাতরের কানাকানি,
কুৎসিত জনশ্রুতি,
অবজ্ঞার কর্কশহাস্য।
সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে,
মশালের আলোয়-ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্কি পরানো।
কোনো-এক সময়ে অকারণ সন্দেহে কোনো-এক পাগল
তার প্রতিবেশীকে হঠাৎ মারে;
দেখতে দেখতে নির্বিচার বিবাদ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দিকে দিকে।
কোনো নারী আর্তস্বরে বিলাপ করে;
বলে, 'হায় হায়, আমাদের দিশাহারা সন্তান উচ্ছন্ন গেল!'
কোনো কামিনী যৌবনমদবিলসিত নগ্নদেহে অট্টহাস্য করে;
বলে— কিছুতে কিছু আসে যায় না।

২

ঊর্ধ্বে গিরিচূড়ায় বসে আছে ভক্ত, তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে;
আকাশে তার নিদ্রাহীন চক্ষু খোঁজে আলোকের ইঙ্গিত।
মেঘ যখন ঘনীভূত, নিশাচর পাখি চীৎকারশব্দে যখন উড়ে যায়,
সে বলে, 'ভয় নেই ভাই, মানবকে মহান বলে জেনো।'
ওরা শোনে না। বলে— পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি।
বলে— পশুই শাশ্বত।
বলে— সাধুতা তলে তলে আত্মপ্রবঞ্চক।
যখন ওরা আঘাত পায় বিলাপ ক'রে বলে, 'ভাই, তুমি কোথায়?'

উত্তরে শুনতে পায়, 'আমি তোমার পাশেই।'
অন্ধকারে দেখতে পায় না ; তর্ক করে,— এ বাণী ভয়ার্তের মায়াসৃষ্টি—
আত্মসান্ত্বনার বিড়ম্বনা।
বলে— মানুষ চিরদিন কেবল সংগ্রাম করবে
মরীচিকার অধিকার নিয়ে
হিংসাকন্টকিত অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে।

৩

মেঘ সরে গেল।
শুকতারা দেখা দিল পূর্বদিগন্তে,
পৃথিবীর বক্ষ থেকে উঠল আরামের দীর্ঘনিশ্বাস,
পল্লবমর্মর বনপথে-পথে হিল্লোলিত,
পাখি ডাক দিল শাখায় শাখায়।
ভক্ত বললে— সময় এসেছে।
কিসের সময় ?
যাত্রার।
ওরা বসে ভাবলে।
অর্থ বুঝলে না, আপন আপন মনের মতো অর্থ বানিয়ে নিলে।
ভোরের স্পর্শ নামল মাটির গভীরে,
বিশ্বসত্তার শিকড়ে শিকড়ে কেঁপে উঠল প্রাণের চাঞ্চল্য।
কে জানে কোথা হতে একটি অতিসূক্ষ্ম স্বর
সবার কানে কানে বললে, 'চলো সার্থকতার তীর্থে।'
এই বাণী জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে
একটি মহৎপ্রেরণায় বেগবান হয়ে উঠল।
পুরুষেরা উপরের দিকে চোখ তুললে।
জোড়হাত মাথায় ঠেকালে মেয়েরা।
শিশুরা করতালি দিয়ে হেসে উঠল।
প্রভাতের প্রথম আলো ভক্তের মাথায়
সোনার রঙের চন্দন পরালে—
সবাই বলে উঠল, 'ভাই, আমরা তোমার বন্দনা করি।'

৪

যাত্রীরা চারি দিক থেকে বেরিয়ে পড়ল
সমুদ্র পেরিয়ে, পর্বত ডিঙিয়ে, পথহীন প্রান্তর উত্তীর্ণ হয়ে—
এল নীলনদীর দেশ থেকে, গঙ্গার তীর থেকে,
তিব্বতের হিমমজ্জিত অধিত্যকা থেকে,

প্রাকাররক্ষিত নগরের সিংহদ্বার দিয়ে,
লতাজালজটিল অরণ্যে পথ কেটে।
কেউ আসে পায়ে হেঁটে, কেউ উটে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ হাতিতে,
কেউ রথে চীনাংশুকের পতাকা উড়িয়ে।
নানা ধর্মের পূজারী চলল ধূপ জ্বালিয়ে, মন্ত্র প'ড়ে।
রাজা চলল— অনুচরদের বর্শাফলক রৌদ্রে দীপ্যমান,
ভেরী বাজে গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।
ভিক্ষু আসে ছিন্ন কন্থা প'রে,
আর রাজ-অমাত্যের দল স্বর্ণলাঞ্ছনখচিত উজ্জ্বল বেশে।
জ্ঞানগরিমা ও বয়সের ভারে মন্থর অধ্যাপককে ঠেলে দিয়ে চলে
চটুলগতি বিদ্যার্থী যুবক।
মেয়েরা চলেছে কলহাস্যে— কত মাতা, কুমারী, কত বধূ—
থালায় তাদের শ্বেতচন্দন, ঝারিতে গন্ধসলিল।
বেশ্যাও চলেছে সেইসঙ্গে— তীক্ষ্ণ তাদের কণ্ঠস্বর,
অতিপ্রকট তাদের প্রসাধন।
চলেছে পঙ্গু খঞ্জ, অন্ধ আতুর,
আর সাধুবেশী ধর্মব্যবসায়ী
দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা।
সার্থকতা!
স্পষ্ট করে কিছু বলে না— কেবল নিজের লোভকে
মহৎ নাম ও বৃহৎ মূল্য দিয়ে ওই শব্দটার ব্যাখ্যা করে,
আর শাস্তিশঙ্কাহীন চৌর্যবৃত্তির অনন্ত সুযোগ ও আপন মলিন
ক্লিন্ন দেহমাংসের অক্লান্ত লোলুপতা দিয়ে কল্পস্বর্গ রচনা করে।

৫

দয়াহীন দুর্গম পথ উপলখণ্ডে আকীর্ণ।
ভক্ত চলেছে, তার পশ্চাতে বলিষ্ঠ এবং শীর্ণ,
তরুণ এবং জরাজর্জর, পৃথিবী শাসন করে যারা
আর যারা অর্ধাশনের মূল্যে মাটি চাষ করে।
কেউ বা ক্লান্ত বিক্ষতচরণ, কারও মনে ক্রোধ,
কারও মনে সন্দেহ।
তারা প্রতি পদক্ষেপ গণনা করে আর শুধায়— কত পথ বাকি?
তার উত্তরে ভক্ত শুধু গান গায়।
শুনে তাদের ভ্রূ কুটিল হয়, কিন্তু ফিরতে পারে না—
চলমান জনপিণ্ডের বেগ এবং অনতিব্যক্ত আশার তাড়না
তাদের ঠেলে নিয়ে যায়।

ঘুম তাদের কমে এল, বিশ্রাম তারা সংক্ষিপ্ত করলে ;
পবস্পরকে ছাড়িয়ে চলবার প্রতিযোগিতায় তারা ব্যগ্র ;
ভয়— পাছে বিলম্ব ক'রে বঞ্চিত হয়।
দিনের পর দিন গেল।
দিগন্তের পর দিগন্ত আসে,
অজ্ঞাতের আমন্ত্রণ অদৃশ্য সংকেতে ইঙ্গিত করে।
ওদের মুখের ভাব ক্রমেই কঠিন
আর ওদের গঞ্জনা উগ্রতর হতে থাকে।

৬

রাত হয়েছে।
পথিকেরা বটতলায় আসন বিছিয়ে বসল।
একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপ গেল নিবে, অন্ধকার নিবিড় ;
যেন নিদ্রা ঘনিয়ে উঠল মূর্ছায়।
জনতার মধ্য থেকে কে-একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
অধিনেতার দিকে আঙুল তুলে বললে—
'মিথ্যাবাদী, আমাদের প্রবঞ্চনা করেছ !'
ভর্ৎসনা এক কণ্ঠ থেকে আর-এক কণ্ঠে উদগ্র হতে থাকল।
তীব্র হল মেয়েদের বিদ্বেষ, প্রবল হল পুরুষদের তর্জন।
অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে
হঠাৎ তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে।
অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না।
একজনের পর একজন উঠল, আঘাতের পর আঘাত করলে,
তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
রাত্রি নিস্তব্ধ।
ঝর্নার কলশব্দ দূর থেকে ক্ষীণ হয়ে আসছে।
বাতাসে যূথীর মৃদুগন্ধ।

৭

যাত্রীদের মন শঙ্কায় অভিভূত।
মেয়েরা কাঁদছে ;
পুরুষেরা উত্ত্যক্ত হয়ে ভর্ৎসনা করছে, 'চুপ করো !'
কুকুর ডেকে ওঠে ;
চাবুক খেয়ে আর্ত কাকুতিতে তার ডাক থেমে যায়।
রাত্রি পোহাতে চায় না।
অপরাধের অভিযোগ নিয়ে মেয়ে পুরুষে তর্ক তীব্র হতে থাকে।

সবাই চীৎকার করে, গর্জন করে ;
শেষে যখন খাপ থেকে ছুরি বেরোতে চায়
এমন সময় অন্ধকার ক্ষীণ হল,
প্রভাতের আলো গিরিশৃঙ্গ ছাপিয়ে আকাশ ভরে দিলে।
হঠাৎ সকলে স্তব্ধ।
সূর্যরশ্মির তর্জনী এসে স্পর্শ করল
রক্তাক্ত মৃত মানুষের শান্ত ললাট।
মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, পুরুষেরা মুখ ঢাকল দুই হাতে।
কেউ বা অলক্ষিতে পালিয়ে যেতে চায়, পারে না—
অপরাধের শৃঙ্খলে আপন বলির কাছে তারা বাঁধা।
পরস্পরকে তারা শুধায়, 'কে আমাদের পথ দেখাবে !'
পূর্বদেশের বৃদ্ধ বললে, 'আমরা যাকে মেরেছি সেই দেখাবে !'
সবাই নিরুত্তর ও নতশির।
বৃদ্ধ আবার বললে, 'সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি,
ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি,
প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব—
কেননা, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত,
সেই মহামৃত্যুঞ্জয়।'
সকলে দাঁড়িয়ে উঠল ; কণ্ঠ মিলিয়ে গান করলে—
'জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয় !'

৮

তরুণের দল ডাক দিল,
'চলো যাত্রা করি প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে !'
হাজার কণ্ঠের ধ্বনিনির্ঝরে ঘোষিত হল—
'আমরা ইহলোক জয় করব এবং লোকান্তর !'
উদ্দেশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট নয়, কেবল আগ্রহে সকলে এক ;
মৃত্যুবিপদকে তুচ্ছ করেছে
সকলের সম্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ।
তারা আর পথ শুধায় না ;
তাদের মনে নেই সংশয়, চরণে নেই ক্লান্তি।
মৃত অধিনেতার সত্তা তাদের অন্তরে বাহিরে ;
সে যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়েছে
এবং জীবনের সীমাকে করেছে অতিক্রম।
তারা সেই ক্ষেত্র দিয়ে চলেছে যেখানে বীজ বোনা হল,
সেই ভাণ্ডারের পাশ দিয়ে যেখানে শস্য হয়েছে সঞ্চিত,

সেই অনুর্বর ভূমির উপর দিয়ে
যেখানে কঙ্কালসার দেহ বসে আছে প্রাণের কাঙাল।
তারা চলেছে প্রজাবহুল নগরের পথ দিয়ে,
চলেছে জনশূন্যতার মধ্যে দিয়ে
যেখানে বোবা অতীত তার ভাঙা কীর্তি কোলে নিয়ে নিস্তব্ধ,
চলেছে লক্ষ্মীছাড়াদের জীর্ণ বসতি বেয়ে
আশ্রয় যেখানে আশ্রিতকে বিদ্রূপ করে।
রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখের দীর্ঘ প্রহর কাটল পথে পথে।
সন্ধ্যাবেলায় আলোক যখন ম্লান তখন তারা কালজ্ঞকে শুধায়—
'ওই কি দেখা যায় আমাদের চরম আশার তোরণচূড়া?'
সে বলে, 'না, ও যে সন্ধ্যাভ্রশিখরে
অস্তগামী সূর্যের বিলীয়মান আভা।'
তরুণ বলে, 'থেমো না, বন্ধু, অন্ধ তমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে
আমাদের পৌঁছতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে।'
অন্ধকারে তারা চলে।
পথ যেন নিজের অর্থ নিজে জানে,
পায়ের তলার ধূলিও যেন নীরব স্পর্শে দিক চিনিয়ে দেয়।
স্বর্গপথযাত্রী নক্ষত্রের দল মূক সংগীতে বলে, 'সাথি, অগ্রসর হও।'
অধিনেতার আকাশবাণী কানে আসে, 'আর বিলম্ব নেই।'

৯

প্রত্যূষের প্রথম আভা
অরণ্যের শিশিরবর্ষী পল্লবে পল্লবে ঝলমল করে উঠল।
নক্ষত্রসংকেতবিদ্ জ্যোতিষী বললে, 'বন্ধু, আমরা এসেছি।'
পথের দুই ধারে দিক্প্রান্ত অবধি
পরিণত শস্যশীর্ষ স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে দোলায়মান—
আকাশের স্বর্ণলিপির উত্তরে ধরণীর আনন্দবাণী।
গিরিপদবর্তী গ্রাম থেকে নদীতলবর্তী গ্রাম পর্যন্ত
প্রতিদিনের লোকযাত্রা শান্ত গতিতে প্রবহমান।
কুমোরের চাকা ঘুরছে গুঞ্জনস্বরে,
কাঠুরিয়া হাটে আনছে কাঠের ভার,
রাখাল ধেনু নিয়ে চলেছে মাঠে,
বধূরা নদী থেকে ঘট ভরে যায় ছায়াপথ দিয়ে।
কিন্তু কোথায় রাজার দুর্গ, সোনার খনি,
মারণ-উচাটন মন্ত্রের পুরাতন পুঁথি?
জ্যোতিষী বললে, 'নক্ষত্রের ইঙ্গিতে ভুল হতে পারে না,

তাদের সংকেত এইখানেই এসে থেমেছে।'
এই ব'লে ভক্তিনম্রশিরে
পথপ্রান্তে একটি উৎসের কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল।
সেই উৎস থেকে জলস্রোত উঠছে যেন তরল আলোক,
প্রভাত যেন হাসি-অশ্রুর গলিত মিলিত গীতধারায় সমুচ্ছল।
নিকটে তালীকুঞ্জতলে একটি পর্ণকুটির
অনির্বচনীয় স্তব্ধতায় পরিবেষ্টিত।
দ্বারে অপরিচিত সিন্ধুতীরের কবি গান গেয়ে বলছে—
'মাতা, দ্বার খোলো!'

১০

প্রভাতের একটি রবিরশ্মি
রুদ্ধ দ্বারের নিম্নপ্রান্তে তির্যক্ হয়ে পড়েছে।
সম্মিলিত জনসংঘ আপন নাড়ীতে নাড়ীতে যেন শুনতে পেলে
সৃষ্টির সেই প্রথম পরমবাণী, 'মাতা, দ্বার খোলো!'
দ্বার খুলে গেল।
মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
উষার কোলে যেন শুকতারা।
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
কবি দিল আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে—
'জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের. ওই চিরজীবিতের!'
সকলে জানু পেতে বসল—
রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী, জ্ঞানী এবং মূঢ়—
উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে—
'জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের!'

শ্রাবণ ১৩৩৮

## অপূর্ণ

যে ক্ষুধা চক্ষের মাঝে, যেই ক্ষুধা কানে,
স্পর্শের যে ক্ষুধা ফিরে দিকে দিকে বিশ্বের আহ্বানে,
উপকরণের ক্ষুধা কাঙাল প্রাণের—
ব্রত তার বস্তুসন্ধানের,
মনের যে ক্ষুধা চাহে ভাষা,
সঙ্গের যে ক্ষুধা নিত্য পথ চেয়ে করে কার আশা,

যে ক্ষুধা উদ্দেশহীন অজানার লাগি
অন্তরে গোপনে রয় জাগি—
সবে তারা মিলি নিতি নিতি
নানা আকর্ষণবেগে গড়ি তোলে মানস-আকৃতি
কত সত্য, কত মিথ্যা, কত আশা, কত অভিলাষ,
কত-না সংশয় তর্ক, কত-না বিশ্বাস,
আপন রচিত ভয়ে আপনারে পীড়ন কত-না,
কত রূপে কল্পিত সান্ত্বনা—
মনগড়া দেবতারে নিয়ে কাটে বেলা,
পরদিনে ভেঙে করে ঢেলা,
অতীতের বোঝা হতে আবর্জনা কত
জটিল অভ্যাসে পরিণত,
বাতাসে বাতাসে ভাসা বাক্যহীন কত-না আদেশ,
দেহহীন তর্জনীনির্দেশ,
হৃদয়ের গূঢ় অভিরুচি
কত স্বপ্নমূর্তি আঁকে, দেয় পুন মুছি,
কত প্রেম, কত ত্যাগ, অসম্ভব-তরে
কত-না আকাশযাত্রা কল্পপক্ষভরে,
কত মহিমার পূজা, অযোগ্যের কত আরাধনা,
সার্থক সাধনা কত, কত ব্যর্থ আত্মবিড়ম্বনা,
কত জয়, কত পরাভব—
ঐক্যবন্ধে বাঁধি এইসব
ভালো মন্দ সাদায় কালোয়
বস্তু ও ছায়ায় গড়া মূর্তি তুমি দাঁড়ালে আলোয়।

জন্মদিনে জন্মদিনে গাঁথনির কর্ম হবে শেষ,
সুখ দুঃখ ভয় লজ্জা ক্লেশ,
আরব্ধ ও অনারব্ধ, সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ,
তৃপ্ত ইচ্ছা, ভগ্ন জীর্ণ সাজ—
তুমি-রূপে পুঞ্জ হয়ে শেষে
কয়দিন পূর্ণ করি কোথা গিয়ে মেশে।
যে চৈতন্যধারা
সহসা উদ্ভূত হয়ে অকস্মাৎ হবে গতিহারা,
সে কিসের লাগি—
নিদ্রায় আবিল কভু, কখনো বা জাগি
বাস্তবে ও কল্পনায় আপনার রচি দিল সীমা,

গড়িল প্রতিমা।
অসংখ্য এ রচনায় উদ্‌ঘাটিছে মহা-ইতিহাস—
যুগান্তে ও যুগান্তরে এ কার বিলাস।

জন্মদিন, মৃত্যুদিন, মাঝে তারই ভরি প্রাণভূমি
কে গো তুমি।
কোথা আছে তোমার ঠিকানা,
কার কাছে তুমি আছ অন্তরঙ্গ সত্য করে জানা।
আছ আর নাই মিলে অসম্পূর্ণ তব সত্তাখানি
আপন গদ্‌গদ বাণী
পারে না করিতে ব্যক্ত, অশক্তির নিষ্ঠুর বিদ্রোহে
বাধা পায় প্রকাশ-আগ্রহে,
মাঝখানে থেমে যায় মৃত্যুর শাসনে।
তোমার যে সম্ভাষণে
জানাইতে চেয়েছিলে নিখিলেরে নিজ পরিচয়
হঠাৎ কি তাহার বিলয়,
কোথাও কি নাই তার শেষ সার্থকতা।
তবে কেন পঙ্গু সৃষ্টি, খণ্ডিত এ অস্তিত্বের ব্যথা।
অপূর্ণতা আপনার বেদনায়
পূর্ণের আশ্বাস যদি নাহি পায়,
তবে রাত্রিদিন হেন
আপনার সাথে তার এত দ্বন্দ্ব কেন।
ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকার সাথে যুঝি
অঙ্কুরি উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মুক্তি খুঁজি।
সে মুক্তি না যদি সত্য হয়
অন্ধ মূক দুঃখে তার হবে কি অনন্ত পরাজয়।

দার্জিলিং
২৪ কার্তিক ? ১৩৩৮

## প্রশ্ন

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'।

বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহিরদ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।

আমি-যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,
আমি-যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি-যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো

পৌষ ১৩৩৮

## কালো ঘোড়া

কালো অশ্ব অন্তরে যে সারারাত্রি ফেলেছে নিশ্বাস
সে আমার অন্ধ অভিলাষ।
অসাধ্যের সাধনায় ছুটে যাবে ব'লে
দুর্গমেরে দ্রুত পায়ে দ'লে
খুরে খুরে খুঁড়েছে ধরণী,
করেছে অধীর হ্রেষাধ্বনি।
ও যেন রে যুগান্তের কালো অগ্নিশিখা,
কালো কুজ্ঝটিকা।
অকস্মাৎ নৈরাশ্য-আঘাতে
দ্বার মুক্ত পেয়ে রাতে
দুর্দাম এসেছে বাহিরিয়া।
যারে নিয়ে এল সে-যে ব্যথায় মূর্তিত মোর প্রিয়া,
বাহিরে না স্থান পেয়ে
ধ্যানের আসন ছিল ছেয়ে।

এ-অমাবস্যায়
বল্গাহারা কালো অশ্ব ঊর্ধ্বশ্বাসে ধায়।
কালো চিন্তা মম
আত্মঘাতী ঝঞ্ঝাসম
বিস্মৃতির চিরবিলুপ্তিতে
চলে ঝাঁপ দিতে
নিরঙ্কিত পথ বেয়ে।
যাক ধেয়ে।
সৃষ্টিহীন দৃষ্টিহীন রাত্রিপারে
ব্যর্থ দুরাশারে
নিয়ে যাক—
অন্তিম শূন্যের মাঝে নিশ্চল নির্বাক।
তার পরে বিরহের অগ্নিস্নানে শুভ্র মন
রৌদ্রস্নাত আশ্বিনের বৃষ্টিশূন্য মেঘের মতন
উন্মুক্ত আলোকে
দীপ্তি পাক সুনির্মল শোকে।

৪ মাঘ ১৩৩৮

## অনাগতা

এসেছিল বহু আগে যারা মোর দ্বারে,
যারা চলে গেছে একেবারে,
ফাগুন-মধ্যাহ্নবেলা শিরীষছায়ায় চুপে চুপে
তারা ছায়ারূপে
আসে যায় হিল্লোলিত শ্যাম দূর্বাদলে।
ঘন কালো দিঘিজলে
পিছনে-ফিরিয়া-চাওয়া আঁখি জ্বলোজ্বলো
করে ছলোছলো।
মরণের অমরতালোকে
ধূসর আঁচল মেলি ফিরে তারা গেরুয়া আলোকে।

যে এখনো আসে নাই মোর পথে,
কখনো যে আসিবে না আমার জগতে,
তার ছবি আঁকিয়াছি মনে—
একেলা সে বাতায়নে

বিদেশিনী জন্মকাল হতে।
সে যেন শেঁউলি ভাসে ক্ষীণ মৃদু স্রোতে,
কোথায় তাহার দেশ
নাই সে উদ্দেশ।
চেয়ে আছে দূরপানে
কার লাগি আপনি সে নাহি জানে।
সেই দূরে ছায়ারূপে রয়েছে সে
বিশ্বের সকল-শেষে
যে আসিতে পারিত তবুও
এল না কভুও।
জীবনের মরীচিকাদেশে
মরুকন্যাটির আঁখি ফিরে ভেসে ভেসে।

[মাঘ ১৩৩৮ ?]

## ধ্যান

কাল চলে আসিয়াছি, কোনো কথা বলি নি তোমারে।
শেষ করে দিনু একেবারে
আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, ক্ষুব্ধ কামনার
দুঃসহ ধিক্কার।
বিরহের বিষণ্ণ আকাশে
সন্ধ্যা হয়ে আসে।
তোমারে নিরখি ধ্যানে সব হতে স্বতন্ত্র করিয়া
অনন্তে ধরিয়া।
নাই সৃষ্টিধারা,
নাই রবি শশী গ্রহ তারা;
বায়ু স্তব্ধ আছে,
দিগন্তে একটি রেখা আঁকে নাই গাছে।
নাইকো জনতা,
নাই কানাকানি কথা।

নাই সময়ের পদধ্বনি,
নিরস্ত মুহূর্ত স্থির, দণ্ড পল কিছুই না গনি।
নাই আলো, নাই অন্ধকার,
আমি নাই, গ্রন্থি নাই তোমার আমার।

নাই সুখ দুঃখ ভয়, আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হল সব,
আকাশে নিস্তব্ধ এক শান্ত অনুভব।
তোমাতে সমস্ত লীন, তুমি আছ একা,
আমি-হীন চিত্ত-মাঝে একান্ত তোমারে শুধু দেখা।

৩ জুলাই ১৯৩২

## মৃত্যুঞ্জয়

দূর হতে ভেবেছিনু মনে
দুর্জয় নির্দয় তুমি, কাঁপে পৃথ্বী তোমার শাসনে।
তুমি বিভীষিকা,
দুঃখীর বিদীর্ণ বক্ষে জ্বলে তব লেলিহান শিখা।
দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের মেঘপানে,
সেথা হতে বজ্র টেনে আনে।
ভয়ে ভয়ে এসেছিনু দুরুদুরু বুকে
তোমার সম্মুখে।
তোমার ভ্রূকুটিভঙ্গে তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত,
নামিল আঘাত।
পাঁজর উঠিল কেঁপে,
বক্ষে হাত চেপে
শুধালেম, 'আরো কিছু আছে না কি,
আছে বাকি
শেষ বজ্রপাত?'
নামিল আঘাত।
এই মাত্র? আর কিছু নয়?
ভেঙে গেল ভয়।
যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি
তোমারে আমার চেয়ে বড়ো বলে নিয়েছিনু গনি।

তোমার আঘাতসাথে নেমে এলে তুমি
যেথা মোর আপনার ভূমি।
ছোটো হয়ে গেছ আজ।
আমার টুটিল সব লাজ।
যত বড়ো হও,
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।

আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো, এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চলে।

১৭ আষাঢ় ১৩৩৯

## বাঁশি

কিনু গোয়ালার গলি।
দোতলা বাড়ির
লোহার-গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই।
লোনাধরা দেয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি,
মাঝে মাঝে স্যাঁতাপড়া দাগ।
মার্কিন থানের মার্কা একখানা ছবি
সিদ্ধিদাতা গণেশের
দরজার 'পরে আঁটা।
আমি ছাড়া ঘরে থাকে আর-একটা জীব
এক ভাড়াতেই,
সেটা টিকটিকি।
তফাত আমার সঙ্গে এই শুধু—
নেই তার অন্নের অভাব।

বেতন পঁচিশ টাকা,
সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি।
খেতে পাই দত্তদের বাড়ি
ছেলেকে পড়িয়ে।
শেয়ালদা ইস্‌টিশনে যাই,
সন্ধেটা কাটিয়ে আসি;
আলো জ্বালাবার দায় বাঁচে।
এঞ্জিনের ধস্‌ ধস্‌,
বাঁশির আওয়াজ,
যাত্রীর ব্যস্ততা,
কুলি-হাঁকাহাঁকি।
সাড়ে দশ বেজে যায়,
তার পরে ঘরে এসে নিরালা নিঃঝুম অন্ধকার।

ধলেশ্বরীনদীতীরে পিসিদের গ্রাম।
তাঁর দেওরের মেয়ে,
অভাগার সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিকঠাক।
লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল—
সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে।
মেয়েটা তো রক্ষে পেলে,
আমি তথৈবচ।
ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসাযাওয়া-
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

বর্ষা ঘনঘোর।
ট্রামের খরচা বাড়ে,
মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়।
গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে, পচে ওঠে—
আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভুতি,
মাছের কান্‌কা,
মরা বেড়ালের ছানা,
ছাইপাঁশ আরো কত কী যে।

ছাতার অবস্থাখানা জরিমানা-দেওয়া
মাইনের মতো,
বহু ছিদ্র তার।
আপিসের সাজ
গোপীকান্ত গোঁসাইয়ের মনটা যেমন,
সর্বদাই রসসিক্ত থাকে।
বাদলের কালো ছায়া
স্যাঁৎসেঁতে ঘরটাতে ঢুকে
কলেপড়া জন্তুর মতন
মূর্ছায় অসাড়।
দিনরাত মনে হয়, কোন্‌ আধমরা
জগতের সঙ্গে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি।

গলির মোড়েই থাকে কান্তবাবু—
যত্নে-পাট-করা লম্বা চুল,
বড়ো বড়ো চোখ,

শৌখিন মেজাজ।
কর্নেট বাজানো তার শখ।

মাঝে মাঝে সুর জেগে ওঠে
এ গলির বীভৎস বাতাসে—
কখনো গভীর রাতে,
ভোরবেলা আধো অন্ধকারে,
কখনো বৈকালে
ঝিকিমিকি আলোয় ছায়ায়।
হঠাৎ সন্ধ্যায়
সিন্ধুবারোয়াঁয় লাগে তান,
সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহবেদনা।

তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে—
এ গলিটা ঘোর মিছে
দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো।
হঠাৎ খবর পাই মনে
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া-ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।

এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলিলগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী।
তীরে তমালের ঘন ছায়া।
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা ক'রে, তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

২৫ আষাঢ় ১৩৩৯

## জলপাত্র

প্রভু, তুমি পূজনীয়। আমার কী জাত
জান তাহা হে জীবননাথ।
তবুও সবার দ্বার ঠেলে
কেন এলে
কোন্ দুখে
আমার সম্মুখে।
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে
মাঠের পথের বাঁকে বাঁকে
তীব্র দ্বিপ্রহরে
আসিতেছিলাম ধেয়ে আপনার ঘরে—
চাহিলে তৃষ্ণার বারি।
আমি হীন নারী
তোমারে করিব হেয়
সে কি মোর শ্রেয়।
ঘটখানি নামাইয়া চরণে প্রণাম ক'রে
কহিলাম, 'অপরাধী করিয়ো না মোরে।'

শুনিয়া আমার মুখে তুলিলে নয়ন বিশ্বজয়ী,
হাসিয়া কহিলে, 'হে মৃন্ময়ী,
পুণ্য যথা মৃত্তিকার এই বসুন্ধরা
শ্যামল কান্তিতে ভরা
সেইমতো তুমি
লক্ষ্মীর আসন, তাঁর কমলচরণ আছ চুমি।
সুন্দরের কোনো জাত নাই,
মুক্ত সে সদাই।
তাহারে অরুণরাঙা উষা
পরায় আপন ভূষা;
তারাময়ী রাতি
দেয় তার বরমাল্য গাঁথি।
মোর কথা শোনো,
শতদল পঙ্কজের জাতি নেই কোনো।
যার মাঝে প্রকাশিল স্বর্গের নির্মল অভিরুচি
সেও কি অশুচি।

বিধাতা প্রসন্ন যেথা আপনার হাতের সৃষ্টিতে
নিত্য তার অভিষেক নিখিলের আশিস্‌বৃষ্টিতে।'
জলভরা মেঘস্বরে এই কথা ব'লে
তুমি গেলে চলে।

তারপর হতে
এ ভঙ্গুর পাত্রখানি প্রতিদিন উষার আলোতে
নানা বর্ণে আঁকি,
নানা চিত্ররেখা দিয়ে মাটি তার ঢাকি।
হে মহান্‌, নেমে এসে তুমি যারে করেছ গ্রহণ
সৌন্দর্যের অর্ঘ্য তার তোমাপানে করুক বহন।

৮ শ্রাবণ ১৩৩৯

## সাধারণ মেয়ে

আমি অন্তঃপুরের মেয়ে,
চিনবে না আমাকে।
তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি, শরৎবাবু,
'বাসি ফুলের মালা'।
তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণদশা ধরেছিল
পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।
পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেষারেষি—
দেখলেম তুমি মহদাশয় বটে, জিতিয়ে দিলে তাকে।

নিজের কথা বলি।
বয়স আমার অল্প।
একজনের মন ছুঁয়েছিল
আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া।
তাই জেনে পুলক লাগত আমার দেহে,
ভুলে গিয়েছিলেম অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি।
আমার মতো এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে
অল্পবয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে।

তোমাকে দোহাই দিই,
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।

বড়ো দুঃখ তার।
তারও স্বভাবের গভীরে
অসাধারণ যদি কিছু তলিয়ে থাকে কোথাও
কেমন করে প্রমাণ করবে সে!
এমন কজন মেলে যারা তা ধরতে পারে!
কাঁচাবয়সের জাদু লাগে ওদের চোখে,
মন যায় না সত্যের খোঁজে—
আমরা বিকিয়ে যাই মরীচিকার দামে।

কথাটা কেন উঠল তা বলি।
মনে করো তার নাম নরেশ।
সে বলেছিল কেউ তার চোখে পড়ে নি আমার মতো।
এতবড়ো কথাটা বিশ্বাস করব যে সাহস হয় না,
না করব যে এমন জোর কই।

একদিন সে গেল বিলেতে।
চিঠিপত্র পাই কখনো বা।
মনে মনে ভাবি, রাম রাম, এত মেয়েও আছে সে দেশে,
এত তাদের ঠেলাঠেলি ভিড়!
আর, তারা কি সবাই অসামান্য—
এত বুদ্ধি, এত উজ্জ্বলতা!
আর, তারা সবাই কি আবিষ্কার করেছে এক নরেশ সেনকে
স্বদেশে যার পরিচয় চাপা ছিল দশের মধ্যে!

গেল মেল'এর চিঠিতে লিখেছে
লিজির সঙ্গে গিয়েছিল সমুদ্রে নাইতে।
(বাঙালি কবির কবিতা ক' লাইন দিয়েছে তুলে,
সেই যেখানে উর্বশী উঠছে সমুদ্র থেকে।)
তার পরে বালির 'পরে বসল পাশাপাশি;
সামনে দুলছে নীল সমুদ্রের ঢেউ,
আকাশে ছড়ানো নির্মল সূর্যালোক।
লিজি তাকে খুব আস্তে আস্তে বললে—
'এই সেদিন তুমি এসেছ, দুদিন পরে যাবে চলে;
ঝিনুকের দুটি খোলা,
মাঝখানটুকু ভরা থাক্
একটি নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে—

দুর্লভ, মূল্যহীন।'
কথা বলবার কী অসামান্য ভঙ্গি!
সেইসঙ্গে নরেশ লিখেছে—
'কথাগুলি যদি বানানো হয় দোষ কী,
কিন্তু চমৎকার—
হীরে-বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয়?'
বুঝতেই পারছ,
একটা তুলনার সংকেত ওর চিঠিতে অদৃশ্য কাঁটার মতো
আমার বুকের কাছে বিঁধিয়ে দিয়ে জানায়—
আমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে।
মূল্যবানকে পুরো মূল্য চুকিয়ে দিই
এমন ধন নেই আমার হাতে।
ওগো, নাহয় তাই হল,
নাহয় ঋণীই রইলেম চিরজীবন।

পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎবাবু,
নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্প—
যে দুর্ভাগিনীকে দূরেব থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্তত পাঁচ-সাতজন অসামান্যার সঙ্গে—
অর্থাৎ, সপ্তরথিনীর মার।
বুঝে নিয়েছি, আমার কপাল ভেঙেছে,
হার হয়েছে আমার।
কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে,
পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে।
ফুলচন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে।

তাকে নাম দিয়ো মালতী।
ওই নামটা আমার।
ধরা পড়বার ভয় নেই :
এমন অনেক মালতী আছে বাংলাদেশে,
তারা সবাই সামান্য মেয়ে,
তারা ফরাসি জর্মান জানে না,
কাঁদতে জানে।

কী করে জিতিয়ে দেবে?

উচ্চ তোমার মন, তোমার লেখনী মহীয়সী।
তুমি হয়তো ওকে নিয়ে যাবে ত্যাগের পথে,
দুঃখের চরমে, শকুন্তলার মতো।
দয়া কোরো আমাকে।
নেমে এসো আমার সমতলে।
বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রির অন্ধকারে
দেবতার কাছে যে অসম্ভব বর মাগি
সে বর আমি পাব না,
কিন্তু পায় যেন তোমার নায়িকা।
রাখো-না কেন নরেশকে সাত বছর লন্ডনে,
বারে বারে ফেল করুক তার পরীক্ষায়,
আদরে থাক্ আপন উপাসিকামণ্ডলীতে।
ইতিমধ্যে মালতী পাস করুক এম. এ.
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে,
গণিতে হোক প্রথম তোমার কলমের এক আঁচড়ে।
কিন্তু ওইখানেই যদি থাম
তোমার সাহিত্যসম্রাট্ নামে পড়বে কলঙ্ক।
আমার দশা যাই হোক,
খাটো কোরো না তোমার কল্পনা।
তুমি তো কৃপণ নও বিধাতার মতো।
মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে য়ুরোপে।
সেখানে যারা জ্ঞানী, যারা বিদ্বান, যারা বীর,
যারা কবি, যারা শিল্পী, যারা রাজা,
দল বেঁধে আসুক ওর চার দিকে।
জ্যোতির্বিদের মতো আবিষ্কার করুক ওকে—
শুধু বিদুষী ব'লে নয়, নারী ব'লে।
ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে
ধরা পড়ুক তার রহস্য— মূঢ়ের দেশে নয়—
যে দেশে আছে সমজদার, আছে দরদি,
আছে ইংরেজ জর্মান ফরাসি।
মালতীর সম্মানের জন্যে সভা ডাকা হোক-না—
বড়ো বড়ো নামজাদার সভা।
মনে করা যাক সেখানে বর্ষণ হচ্ছে মুষলধারে চাটুবাক্য ;
মাঝখান দিয়ে সে চলেছে অবহেলায়
ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন পালের নৌকো।
ওর চোখ দেখে ওরা করছে কানাকানি ;

সবাই বলছে ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।
(এইখানে জনান্তিকে বলে রাখি,
সৃষ্টিকর্তার প্রসাদ সত্যই আছে আমার চোখে।
বলতে হল নিজের মুখেই,
এখনো কোনো য়ুরোপীয় রসজ্ঞের
সাক্ষাৎ ঘটে নি কপালে।)
নরেশ এসে দাঁড়াক সেই কোণে,
আর তার সেই অসামান্য মেয়ের দল।

আর তার পরে ?
তার পরে আমার নটেশাকটি মুড়োল,
স্বপ্ন আমার ফুরোল!
হায় রে সামান্য মেয়ে!
হায় রে বিধাতার শক্তির অপব্যয়!

২৯ শ্রাবণ ১৩৩৯

## সুন্দর

প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে।
আকাশের সীমা ঘিরে মেঘ,
মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর আসছে মাঠের উপর।
হুহু করে বইছে হাওয়া,
পেঁপে গাছগুলোর যেন আতঙ্ক লেগেছে,
উত্তরের মাঠে নিমগাছে বেধেছে বিদ্রোহ,
তালগাছগুলোর মাথায় বিস্তর বকুনি।
বেলা এখন আড়াইটা।
ভিজে বনের ঝলমলে মধ্যাহ্ন
উত্তর দক্ষিণের জানলা দিয়ে এসে
জুড়ে বসেছে আমার সমস্ত মন।

জানি নে কেন মনে হয়
এই দিন দূরকালের আর-কোনো একটা দিনের মতো।
এরকম দিন মানে না কোনো দায়কে,
এর কাছে কিছুই নেই জরুরি,

বর্তমানের-নোঙর-ছেঁড়া ভেসে-যাওয়া এই দিন।
একে দেখছি যে অতীতের মরীচিকা ব'লে
সে অতীত কি ছিল কোনোকালে কোনোখানে,
সে কি চিরযুগেরই অতীত নয়!
প্রেয়সীকে মনে হয় সে আমার জন্মান্তরের জানা,
যে কালে স্বর্গ, যে কালে সত্যযুগ,
যে কাল সকল কালেরই ধরাছোঁয়ার বাইরে।

তেমনি এই-যে সোনায়-পান্নায় ছায়ায়-আলোয় গাঁথা
অবকাশের নেশায় মন্থর আষাঢ়ের দিন
বিহ্বল হয়ে আছে মাঠের উপর ওড়না ছড়িয়ে দিয়ে,
এর মাধুরীকেও মনে হয় আছে তবু নেই—
এ আকাশবীণায় গৌড়সারঙের আলাপ,
সে আলাপ আসছে সর্বকালের নেপথ্য থেকে।

৭ ভাদ্র ১৩৩৯

## বিশ্বশোক

দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি—
লজ্জা দিয়ো না।
সকলের নয় যে আঘাত
ধোরো না সবার চোখে।
ঢেকো না মুখ অন্ধকারে,
রেখো না দ্বারে আগল দিয়ে।
জ্বালো সকল রঙের উজ্জ্বল বাতি,
কৃপণ হোয়ো না।

অতি বৃহৎ বিশ্ব—
অম্লান তার মহিমা,
অক্ষুব্ধ তার প্রকৃতি;
মাথা তুলেছে দুর্দর্শ সূর্যলোকে,
অবিচলিত অকরুণ দৃষ্টি তার অনিমেষ;
অকম্পিত বক্ষ প্রসারিত
গিরি নদী প্রান্তরে।
আমার সে নয়,
সে অসংখ্যের।

বাজে তার ভেরী সকল দিকে,
জ্বলে অনিভৃত আলো,
দোলে পতাকা মহাকাশে।
তার সমুখে লজ্জা দিয়ো না—
আমার ক্ষতি, আমার ব্যথা
তার সমুখে কণার কণা।

এই ব্যথাকে আমার বলে ভুলব যখনই
তখনই সে প্রকাশ পাবে বিশ্বরূপে।
দেখতে পাব বেদনার বন্যা নামে কালের বুকে
শাখাপ্রশাখায় ;
ধায় হৃদয়ের মহানদী
সব মানুষের জীবনস্রোতে ঘরে ঘরে।
অশ্রুধারার ব্রহ্মপুত্র
উঠছে ফুলে ফুলে
তরঙ্গে তরঙ্গে ;
সংসারের কূলে কূলে
চলে তার বিপুল ভাঙাগড়া
দেশে দেশান্তরে।
চিরকালের সেই বিরহতাপ,
চিরকালের সেই মানুষের শোক,
নামল হঠাৎ আমার বুকে ;
এক প্লাবনে থর্থরিয়ে কাঁপিয়ে দিল
পাঁজরগুলো ;
সব ধরণীর কান্নার গর্জনে
মিলে গিয়ে চলে গেল অনন্তে,
কী উদ্দেশে কে তা জানে।

আজকে আমি ডেকে বলি লেখনীকে—
লজ্জা দিয়ো না।
কূল ছাপিয়ে উঠুক তোমার দান।
দাক্ষিণ্যে তোমার
ঢাকা পড়ুক অন্তরালে
আমার আপন ব্যথা।
ক্রন্দন তার হাজার তানে মিলিয়ে দিয়ো
বিশাল বিশ্বসুরে।

১১ ভাদ্র ১৩৩৯

## কোমলগান্ধার

নাম রেখেছি কোমলগান্ধার
মনে মনে।
যদি তার কানে যেত অবাক হয়ে থাকত বসে,
বলত হেসে— মানে কী!
মানে কিছুই যায় না বোঝা, সেই মানেটাই খাঁটি।
কাজ আছে, কর্ম আছে সংসারে,
ভালো মন্দ অনেক রকম আছে—
তাই নিয়ে তার মোটামুটি সবার সঙ্গে চেনাশোনা।
পাশের থেকে আমি দেখি বসে বসে
কেমন একটি সুর দিয়েছে চার দিকে।
আপনাকে ও আপনি জানে না।
যেখানে ওর অন্তর্যামীর আসন পাতা,
সেইখানে তাঁর পায়ের কাছে
রয়েছে কোন্ ব্যথাধূপের পাত্রখানি।
সেখান থেকে ধোঁয়ার আভাস চোখের উপর পড়ে,
চাঁদের উপর মেঘের মতো
হাসিকে দেয় একটুখানি ঢেকে।
গলার সুরে কী করুণা লাগে ঝাপসা হয়ে।
ওর জীবনের তানপুরা যে ওই সুরেতেই বাঁধা,
সেই কথাটি ও জানে না।
চলায় বলায় সব কাজেতেই ভৈরবী দেয় তান—
কেন যে তার পাই নে কিনারা।
তাই তো আমি নাম দিয়েছি কোমলগান্ধার—
যায় না বোঝা যখন চক্ষু তোলে
বুকের মধ্যে অমন করে
কেন লাগায় চোখের জলের মিড়।

১৩ ভাদ্র ১৩৩৯

## মনে হয়েছিল, আজ

মনে হয়েছিল, আজ সব কটা দুর্গ্রহ
চক্র করে বসেছে দুর্মন্ত্রণায়।
অদৃষ্ট জাল ফেলে অন্তরের শেষ তলা থেকে
টেনে টেনে তুলছে নাড়ীছেঁড়া যন্ত্রণাকে;
মনে হয়েছিল, অন্তহীন এই দুঃখ;
মনে হয়েছিল, পন্থহীন নৈরাশ্যের বাধায়
শেষ পর্যন্ত এমনি করে
অন্ধকার হাৎড়িয়ে বেড়ানো।
ভিতসুদ্ধ বাসা গেছে ডুবে,
ভাগ্যের ভাঙনের অপঘাতে।

এমন সময়ে সদ্যবর্তমানের
প্রাকার ডিঙিয়ে দৃষ্টি গেল
দূর অতীতের দিগন্তলীন
বাগ্‌বাদিনীর বাণীসভায়।
যুগান্তরের ভগ্নশেষের ভিত্তিচ্ছায়ায়
ছায়ামূর্তি বাজিয়ে তুলেছে রুদ্রবীণায়
পুরাণখ্যাত কালের কোন্ নিষ্ঠুর আখ্যায়িকা।
দুঃসহ দুঃখের স্মরণতন্তু দিয়ে গাঁথা
সেই দারুণ কাহিনী।
কোন্ দুর্দাম সর্বনাশের
বজ্র-ঝঞ্ঝনিত মৃত্যুমাতাল দিনের
হুহুংকার,
যার আতঙ্কের কম্পনে
ঝংকৃত করছে বীণাপাণি
আপন বীণার তীব্রতম তার।

দেখতে পেলেম
কত কালের দুঃখ লজ্জা গ্লানি
কত যুগের জ্বলৎ-ধারা মর্মনিঃস্রাব
সংহত হয়েছে,
ধরেছে দহনহীন বাণীমূর্তি
অতীতের সৃষ্টিশালায়।

আর, তার বাইরে পড়ে আছে
নির্বাপিত বেদনার পর্বতপ্রমাণ ভস্মরাশি—
জ্যোতির্হীন, বাক্যহীন, অর্থশূন্য।

## উদাসীন

তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে
তখনো আমের বনে গন্ধ ছিল।
জানি না কী লাগি ছিলে অন্যমনে,
তোমার দুয়ার কেন বন্ধ ছিল।
একদিন শাখা ভরি এল ফলগুচ্ছ,
ভরা অঞ্জলি মোর করি গেলে তুচ্ছ,
পূর্ণতাপানে আঁখি অন্ধ ছিল।

বৈশাখে অকরুণ দারুণ ঝড়ে
সোনার বরন ফল খসিয়া পড়ে।
কহিনু 'ধুলায় লোটে মোর যত অর্ঘ্য,
তব করতলে যেন পায় তার স্বর্গ'।
হায় রে, তখনো মনে দ্বন্দ্ব ছিল।

তোমার সন্ধ্যা ছিল প্রদীপহীনা,
আঁধারে দুয়ারে তব বাজানু বীণা।
তারার আলোকসাথে মিলি মোর চিত্ত
ঝংকৃত তারে তারে করেছিল নৃত্য,
তোমার হৃদয় নিস্পন্দ ছিল।

তন্দ্রাবিহীন নীড়ে ব্যাকুল পাখি
হারায়ে কাহারে বৃথা মরিল ডাকি।
প্রহর অতীত হল, কেটে গেল লগ্ন,
একা ঘরে তুমি ঔদাস্যে নিমগ্ন,
তখনো দিগঞ্চলে চন্দ্র ছিল।

কে বোঝে কাহার মন! অবোধ হিয়া
দিতে চেয়েছিল বাণী নিঃশেষিয়া।
আশা ছিল, কিছু বুঝি আছে অতিরিক্ত

অতীতের স্মৃতিখানি অশ্রুতে সিক্ত—
বুঝিবা নূপুরে কিছু ছন্দ ছিল।

উষার চরণতলে মলিন শশী
রজনীর হার হতে পড়িল খসি।
বীণার বিলাপ কিছু দিয়েছে কি সঙ্গ,
নিদ্রার তটতলে তুলেছে তরঙ্গ,
স্বপ্নেও কিছু কি আনন্দ ছিল।

শান্তিনিকেতন। ৯ শ্রাবণ ১৩৪১

## আধুনিকা

চিঠি তব পড়িলাম, বলিবার নাই মোর,
তাপ কিছু আছে তাহে, সন্তাপ তাই মোর।
কবিগিরি ফলাবার উৎসাহ-বন্যায়
আধুনিকাদের 'পরে করিয়াছি অন্যায়
যদি সন্দেহ কর এত বড়ো অবিনয়,
চুপ করে যে সহিবে সে কখনো কবি নয়।
বলিব দু-চার কথা, ভালো মনে শুনো তা ;
পূরণ করিয়া নিয়ো প্রকাশের ন্যূনতা।

পাঁজিতে যে আঁক টানে গ্রহ-নক্ষত্তর
আমি তো তদনুসারে পেরিয়েছি সত্তর।
আয়ুর তবিল মোর কুষ্ঠির হিসাবে
অতি অল্প দিনেই শূন্যেতে মিশাবে।
চলিতে চলিতে পথে আজকাল হরদম
বুকে লাগে যমরথচক্রের কর্দম।
তবু মোর নাম আজো পারিবে না ওঠাতে
প্রাত্নিক তত্ত্বের গবেষণা-কোঠাতে।
জীর্ণ জীবনে আজ রঙ নাই, মধু নাই—
মনে রেখো, তবু আমি জন্মেছি অধুনাই।
সাড়ে আঠারো-শতক এ. ডি., সে যে বি. সি. নয় ;
মোর যারা মেয়ে-বোন নারদের পিসি নয়।
আধুনিকা যারে বল তারে আমি চিনি যে,
কবিযশে তারি কাছে বারো আনা ঋণী যে।

তারি হাতে চিরদিন যৎপরোনাস্তি
পেয়েছি পুরস্কার, পেয়েছিও শাস্তি।
প্রমাণ গিয়েছি রেখে, এ-কালিনী রমণীর
রমণীয় তালে বাঁধা ছন্দ এ ধমনীর।
কাছে পাই হারাই-বা তবু তারি স্মৃতিতে
সুরসৌরভ জাগে আজো মোর গীতিতে।
মনোলোকে দূতী যারা মাধুরীনিকুঞ্জে
গুঞ্জন করিয়াছি তাহাদেরি গুণ-যে।

সেকালেও কালিদাস-বররুচি-আদিরা
পুরসুন্দরীদের প্রশস্তিবাদীরা
যাদের মহিমাগানে জাগালেন বীণারে
তারাও সবাই ছিল অধুনার কিনারে।
আধুনিকা ছিল নাকো হেন কাল ছিল না,
তাহাদেরি কল্যাণে কাব্যানুশীলনা।
পুরুষ কবির ভালে আছে কোনো সুগ্রহ,
চিরকাল তাই তারে এত মহানুগ্রহ।
জুতা-পায়ে খালি-পায়ে স্লিপারে বা নূপুরে
নবীনারা যুগে যুগে এল দিনে দুপুরে,
যেথা স্বপনের পাড়া সেথা যায় আগিয়ে,
প্রাণটাকে নাড়া দিয়ে গান যায় জাগিয়ে।
তবু কবি-রচনায় যদি কোনো ললনা
দেখো অকৃতজ্ঞতা, জেনো সেটা ছলনা।
মিঠে আর কটু মিলে, মিছে আর সত্যি,
ঠোকাঠুকি করে হয় রস-উৎপত্তি।
মিষ্ট-কটুর মাঝে কোন্‌টা যে মিথ্যে
সে কথাটা চাপা থাক্‌ কবির সাহিত্যে।
ওই দেখো, ওটা বুঝি হল শ্লেষবাক্য।
এরকম বাঁকা কথা ঢাকা দিয়ে রাখ্য।
প্রলোভনরূপে আসে পরিহাসপটুতা,
সামলানো নাহি যায় অকারণ কটুতা।
বারে বারে এইমতো করি অত্যুক্তি,
ক্ষমা করে কোরো সেই অপরাধমুক্তি।

আর যা-ই বলি নাকো এ কথাটা বলিবই,
তোমাদের দ্বারে মোরা ভিক্ষার থলি বই।

অন্ন ভরিয়া দাও সুধা তাহে লুকিয়ে,
মূল্য তাহারি আমি কিছু যাই চুকিয়ে।
অনেক গেয়েছি গান মুগ্ধ এ প্রাণ দিয়ে—
তোমরা তো শুনেছ তা, অন্তত কান দিয়ে।
পুরুষ পরুষ ভাষে করে সমালোচনা,
সে অকালে তোমাদেরি বাণী হয় রোচনা।
করুণায় বলে থাকো, 'আহা, মন্দ বা কী।'
খুঁটে বের কর না তো কোনো ছন্দ-ফাঁকি।
এইটুকু যা মিলেছে তাই পায় কজনা,
এত লোক করেছে তো ভারতীর ভজনা।
এর পরে বাঁশি যবে ফেলে যাব ধূলিতে
তখন আমারে ভুলো পার যদি ভুলিতে।
সেদিন নূতন কবি দক্ষিণপবনে
মধুঋতু মুখরিবে তোমাদের স্তবনে—
তখন আমার কোনো কীটে-কাটা পাতাতে
একটা লাইনও যদি পারে মন মাতাতে
তা হলে হঠাৎ বুক উঠিবে যে কাঁপিয়া
বৈতরণীতে যবে যাব খেয়া চাপিয়া।

এ কী গেরো। কাজ কী এ কল্পনাবিহারে,
সেন্টিমেন্টালিটি বলে লোকে ইহারে।
ম'রে তবু বাঁচিবার আবদার খোকামি,
সংসারে এর চেয়ে নেই ঘোর বোকামি।
এটা তো আধুনিকার সহিবে না কিছুতেই;
এস্‌টিমেশনে তার পড়ে যাব নিচুতেই।
অতএব, মন, তোর কলসি ও দড়ি আন্,
অতলে মারিস ডুব মিড্-ভিক্টোরিয়ান।
কোনো ফল ফলিবে না আঁখিজল-সিচনে;
শুকনো হাসিটা তবে রেখে যাই পিছনে।
গদ্‌গদ সুর কেন বিদায়ের পাঠটায়,
শেষ বেলা কেটে যাক ঠাট্টায় ঠাট্টায়।

তোমাদের মুখে থাক্ হাস্যের রোশনাই—
কিছু সীরিয়াস কথা বলি তবু, দোষ নাই।
কখনো দিয়েছে দেখা হেন প্রভাশালিনী।
শুধু এ-কালিনী নয়, যারা চিরকালিনী।

এ কথাটা বলে যাব মোর কন্‌ফেশানেই
তাদের মিলনে কোনো ক্ষণিকের নেশা নেই।
জীবনের সন্ধ্যায় তাহাদেরি বরণে
শেষ রবিরেখা রবে সোনা-আঁকা স্মরণে।
সুর-সুরধুনীধারে যে অমৃত উথলে
মাঝে মাঝে কিছু তার ঝরে পড়ে ভূতলে,
এ জনমে সে কথা জানার সম্ভাবনা
কেমনে ঘটিবে যদি সাক্ষাৎ পাব না।
আমাদের কত ত্রুটি আসনে ও শয়নে,
ক্ষমা ছিল চিরদিন তাহাদের নয়নে।
প্রেমদীপ জ্বেলেছিল পুণ্যের আলোকে,
মধুর করেছে তারা যত কিছু ভালোকে।
নানারূপে ভোগসুধা যা করেছে বরষন
তারে শুচি করেছিল সুকুমার পরশন।
দামি যাহা মিলিয়াছে জীবনের এ পারে
মরণের তীরে তারে নিয়ে যেতে কে পারে।
তবু মনে আশা করি, মৃত্যুর রাতেও
তাহাদেরি প্রেম যেন নিতে পারি পাথেয়।
আর বেশি কাজ নেই, গেছে কেটে তিনকাল,
যে কালে এসেছি আজ সে কালটা সিনিকাল।
কিছু আছে যার লাগি সুগভীর নিশ্বাস
জেগে ওঠে— ঢাকা থাক্ তার প্রতি বিশ্বাস।

একটু সবুর করো, আরো কিছু বলে যাই,
কথার চরম পারে তার পরে চলে যাই।
যে গিয়েছে তার লাগি খুঁচিয়ো না চেতনা,
ছায়ারে অতিথি করে আসনটা পেতো না।
বৎসরে বৎসরে শোক করা রীতিটার
মিথ্যার ধাক্কায় ভিত ভাঙে স্মৃতিটার।
ভিড় ক'রে ঘটা-করা ধরা-বাঁধা বিলাপে,
পাছে কোনো অপরাধ ঘটে প্রথা-খিলাপে,
ভারতে ছিল না লেশ এইসব খেয়ালের—
কবি-'পরে ভার ছিল নিজ মেমোরিয়ালের।
'ভুলিব না, ভুলিব না' এই বলে চীৎকার
বিধি না শোনেন কভু, বলো তাহে হিত কার।

যে- ভোলা সহজ ভোলা নিজের অলক্ষ্যে
সে-ই ভালো হৃদয়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে।
শুষ্ক উৎস খুঁজে মরুমাটি খোঁড়াটা,
তেলহীন দীপ লাগি দেশালাই পোড়াটা,
যে-মোষ কোথাও নেই সেই মোষ তাড়ানো,
কাজে লাগিবে না যাহা সেই কাজ বাড়ানো—
শক্তির বাজে ব্যয় এরে কয় জেনো হে,
উৎসাহ দেখাবার সদুপায় এ নহে।
মনে জেনো জীবনটা মরণেরই যজ্ঞ—
স্থায়ী যাহা, আর যাহা থাকার অযোগ্য,
সকলি আহুতিরূপে পড়ে তারি শিখাতে,
টিঁকে না যা কথা দিয়ে কে পারিবে টিঁকাতে।
ছাই হয়ে গিয়ে তবু বাকি যাহা রহিবে
আপনার কথা সে তো আপনিই কহিবে।

লাহোর
১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫

## পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী
কল্যাণীয়েষু

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন করে
মৃত্যুদিনের দিকে।
সেই চলতি আসনের উপর বসে
কোন্ কারিগর গাঁথছে
ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা।

রথে চড়ে চলেছে কাল—
পদাতিক পথিক চলতে চলতে
পাত্র তুলে ধরে,
পায় কিছু পানীয়;
পান সারা হলে

পিছিয়ে পড়ে অন্ধকারে ;
চাকার তলায়
ভাঙা পাত্র ধুলায় যায় গুঁড়িয়ে।'
তার পিছনে পিছনে
নতুন পাত্র নিয়ে যে আসে ছুটে
পায় নতুন রস,
একই তার নাম
কিন্তু সে বুঝি আর-একজন।

একদিন ছিলেম বালক।
কয়েকটি জন্মদিনের ছাঁদের মধ্যে
সেই যে লোকটার মূর্তি হয়েছিল গড়া
তোমরা তাকে কেউ জান না।
সে সত্য ছিল যাদের জানার মধ্যে
কেউ নেই তারা।
সেই বালক না আছে আপন স্বরূপে,
না আছে কারো স্মৃতিতে।
সে গেছে চলে তার ছোটো সংসারটাকে নিয়ে ;
তার সেদিনকার কান্নাহাসির
প্রতিধ্বনি আসে না কোনো হাওয়ায়।
তার ভাঙা খেলনার টুকরোগুলোও
দেখি নে ধুলোর 'পরে।

সেদিন জীবনের ছোটো গবাক্ষের কাছে
সে বসে থাকত বাইরের দিকে চেয়ে।
তার বিশ্ব ছিল
সেইটুকু ফাঁকের বেষ্টনীর মধ্যে।
তার অবোধ চোখ মেলে চাওয়া
ঠেকে যেত বাগানের পাঁচিলটাতে
সারি সারি নারকেল গাছে।
সন্ধেবেলাটা রূপকথার রসে নিবিড় ;
বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে
বেড়া ছিল না উঁচু,
মনটা এ দিক থেকে ও দিকে
ডিঙিয়ে যেত অনায়াসেই।

প্রদোষের আলো-আঁধারে
বস্তুর সঙ্গে ছায়াগুলো ছিল জড়িয়ে,
দুইই ছিল এক গোত্রের।

সে কয়দিনের জন্মদিন
একটা দ্বীপ,
কিছুকাল ছিল আলোতে,
কালসমুদ্রের তলায় গেছে ডুবে।
ভাঁটার সময় কখনো কখনো
দেখা যায় তার পাহাড়ের চূড়া,
দেখা যায় প্রবালের রক্তিম তটরেখা।

পঁচিশে বৈশাখ তার পরে দেখা দিল
আর-এক কালান্তরে,
ফাল্গুনের প্রত্যুষে
রঙিন আভার অস্পষ্টতায়।
তরুণ যৌবনের বাউল
সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে,
ডেকে বেড়ালো
নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
অনির্দেশ্য বেদনার খেপা সুরে।

সেই শুনে কোনো কোনো দিন বা
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর আসন টলেছিল,
তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন
তাঁর কোনো কোনো দূতীকে
পলাশবনের রঙমাতাল ছায়াপথে
কাজভোলানো সকালবিকালে।
তখন কানে কানে মৃদু গলায় তাদের কথা শুনেছি;
কিছু বুঝেছি, কিছু বুঝি নি।
দেখেছি কালো চোখের পক্ষ্মরেখায়
জলের আভাস;
দেখেছি কম্পিত অধরে নিমীলিত বাণীর
বেদনা;
শুনেছি ক্বণিত কঙ্কণে
চঞ্চল আগ্রহের চকিত ঝংকার।

তারা রেখে গেছে আমার অজানিতে
পঁচিশে বৈশাখের
প্রথম ঘুমভাঙা প্রভাতে
নতুনফোটা বেলফুলের মালা ;
ভোরের স্বপ্ন
তারই গন্ধে ছিল বিহ্বল।

সেদিনকার জন্মদিনের কিশোর জগৎ
ছিল রূপকথার পাড়ার গায়ে-গায়েই,
জানা না-জানার সংশয়ে।
সেখানে রাজকন্যা আপন এলোচুলের আবরণে
কখনো বা ছিল ঘুমিয়ে,
কখনো বা জেগেছিল চমকে উঠে
সোনার কাঠির পরশ লেগে।

দিন গেল।
সেই বসন্তীরঙের পঁচিশে বৈশাখের
রঙকরা প্রাচীরগুলো
পড়ল ভেঙে।
যে পথে বকুলবনের পাতার দোলনে
ছায়ায় লাগত কাঁপন,
হাওয়ায় জাগত মর্মর,
বিরহী কোকিলের
কুহুরবের মিনতিতে
আতুর হত মধ্যাহ্ন,
মৌমাছির ডানায় লাগত গুঞ্জন
ফুলগন্ধের অদৃশ্য ইশারা বেয়ে,
সেই তৃণবিছানো বীথিকা
পৌঁছল এসে পাথরে-বাঁধানো রাজপথে।

সেদিনকার কিশোরক
সুর সেধেছিল যে একতারায়
একে একে তাতে চড়িয়ে দিল
তারের পর নতুন তার।
সেদিন পঁচিশে বৈশাখ
আমাকে আনল ডেকে

বন্ধুর পথ দিয়ে
তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে।
বেলা-অবেলায়
ধ্বনিতে ধ্বনিতে গেঁথে
জাল ফেলেছি মাঝ-দরিয়ায় ;
কোনো মন দিয়েছে ধরা,
ছিন্ন জালের ভিতর থেকে
কেউ বা গেছে পালিয়ে।

কখনো দিন এসেছে ম্লান হয়ে,
সাধনায় এসেছে নৈরাশ্য,
গ্লানিভারে নত হয়েছে মন।
এমন সময়ে অবসাদের অপরাহ্ণে
অপ্রত্যাশিত পথে এসেছে
অমরাবতীর মর্ত্যপ্রতিমা ;
সেবাকে তারা সুন্দর করে,
তপঃক্লান্তের জন্যে তারা
আনে সুধার পাত্র ;
ভয়কে তারা অপমানিত করে
উল্লোল হাস্যের কলোচ্ছ্বাসে ;
তারা জাগিয়ে তোলে দুঃসাহসের শিখা
ভস্মে-ঢাকা অঙ্গারের থেকে ;
তারা আকাশবাণীকে ডেকে আনে
প্রকাশের তপস্যায়।
তারা আমার নিবে-আসা দীপে
জ্বালিয়ে গেছে শিখা,
শিথিল-হওয়া তারে
বেঁধে দিয়েছে সুর,
পঁচিশে বৈশাখকে
বরণমাল্য পরিয়েছে
আপন হাতে গেঁথে

তাদের পরশমণির ছোঁওয়া
আজও আছে
আমার গানে, আমার বাণীতে।

সেদিন জীবনের রণক্ষেত্রে
দিকে দিকে জেগে উঠল সংগ্রামের সংঘাত
গুরুগুরু মেঘমন্দ্রে।
একতারা ফেলে দিয়ে
কখনো বা নিতে হল ভেরী।
খর মধ্যাহ্নের তাপে
ছুটতে হল
জয়-পরাজয়ের আবর্তনের মধ্যে।
পায়ে বিঁধেছে কাঁটা,
ক্ষত বক্ষে পড়েছে রক্তধারা।
নির্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ
আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে—
জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে
নিন্দার তলায়, পঙ্কের মধ্যে।
বিদ্বেষে অনুরাগে,
ঈর্ষায় মৈত্রীতে,
সংগীতে পরুষ-কোলাহলে
আলোড়িত তপ্ত বাষ্পনিশ্বাসের মধ্য দিয়ে
আমার জগৎ গিয়েছে তার কক্ষপথে।
এই দুর্গমে, এই বিরোধ-সংক্ষোভের মধ্যে
পঁচিশে বৈশাখের প্রৌঢ় প্রহরে
তোমরা এসেছ আমার কাছে।

জেনেছ কি—
আমার প্রকাশে
অনেক আছে অসমাপ্ত,
অনেক ছিন্নবিচ্ছিন্ন,
অনেক উপেক্ষিত।
অন্তরে বাহিরে
সেই ভালো মন্দ,
স্পষ্ট অস্পষ্ট,
খ্যাত অখ্যাত,
ব্যর্থ চরিতার্থের জটিল সম্মিশ্রণের মধ্য থেকে
যে আমার মূর্তি
তোমাদের শ্রদ্ধায়, তোমাদের ভালোবাসায়,
তোমাদের ক্ষমায়

আজ প্রতিফলিত—
আজ যার সামনে এনেছ তোমাদের মালা—
তাকেই আমার পঁচিশে বৈশাখের
শেষ বেলাকার পরিচয় ব'লে
নিলেম স্বীকার করে,
আর রেখে গেলেম তোমাদের জন্যে
আমার আশীর্বাদ।
যাবার সময় এই মানসী মূর্তি
রইল তোমাদের চিত্তে,
কালের হাতে রইল বলে
করব না অহংকার।

তার পরে দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো-সাদা-সূত্রে-গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে,
নির্জন নামহীন নিভৃতে,
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সংগীতের গভীরতায়।

## নিমন্ত্রণ

মনে পড়ে, যেন এক কালে লিখিতাম
চিঠিতে তোমারে প্রেয়সী অথবা প্রিয়ে—
একালের দিনে শুধু বুঝি লেখে নাম—
থাক্ সে কথায়, লিখি বিনা নাম দিয়ে।
তুমি দাবি করো কবিতা আমার কাছে
মিল মিলাইয়া দুরূহ ছন্দে লেখা,
আমার কাব্য তোমার দুয়ারে যাচে
নম্র চোখের কম্প্র কাজলরেখা।
সহজ ভাষায় কথাটা বলাই শ্রেয়—
যে-কোনো ছুতায় চলে এসো মোর ডাকে,
সময় ফুরোলে আবার ফিরিয়া যেয়ো,
বোসো মুখোমুখি যদি অবসর থাকে।
গৌরবরন তোমার চরণমূলে
ফল্‌সাবরন শাড়িটি ঘেরিবে ভালো ;
বসনপ্রান্ত সীমন্তে রেখো তুলে,

কপোলপ্রান্তে সরু পাড় ঘন কালো।
একগুছি চুল বায়ু-উচ্ছ্বাসে কাঁপা
ললাটের ধারে থাকে যেন অশাসনে।
ডাহিন অলকে একটি দোলনচাঁপা
দুলিয়া উঠুক গ্রীবাভঙ্গির সনে।
বৈকালে গাঁথা যূথীমুকুলের মালা
কণ্ঠের তাপে ফুটিয়া উঠিবে সাঁঝে;
দূরে থাকিতেই গোপনগন্ধ-ঢালা
সুখসংবাদ মেলিবে হৃদয়মাঝে।
এই সুযোগেতে একটুকু দিই খোঁটা—
আমারি দেওয়া সে ছোট্ট চুনির দুল,
রক্তে জমানো যেন অশ্রুর ফোঁটা,
কতদিন সেটা পরিতে করেছ ভুল।

আরেকটা কথা বলে রাখি এইখানে
কাব্যে সে কথা হবে না মানানসই,
সুর দিয়ে সেটা গাহিব না কোনো গানে—
তুচ্ছ শোনাবে, তবু সে তুচ্ছ কই।
একালে চলে না সোনার প্রদীপ আনা,
সোনার বীণাও নহে আয়ত্তগত—
বেতের ডালায় রেশমি-রুমাল-টানা
অরুণবরন আম এনো গোটাকত।
গদ্যজাতীয় ভোজ্যও কিছু দিয়ো,
পদ্যে তাদের মিল খুঁজে পাওয়া দায়।
তা হোক, তবুও লেখকের তারা প্রিয়—
জেনো, বাসনার সেরা বাসা রসনায়।
ওই দেখো, ওটা আধুনিকতার ভূত
মুখেতে জোগায় স্থূলতার জয়ভাষা—
জানি, অমরার পথহারা কোনো দূত
জঠরগুহায় নাহি করে যাওয়া-আসা।
তথাপি পষ্ট বলিতে নাহি তো দোষ
যে কথা কবির গভীর মনের কথা—
উদরবিভাগে দৈহিক পরিতোষ
সঙ্গী জোটায় মানসিক মধুরতা।
শোভন হাতের সন্দেশ পান্‌তোয়া,
মাছমাংসের পোলাও ইত্যাদিও

যবে দেখা দেয় সেবামাধুর্যে-ছোঁয়া
তখন সে হয় কী অনির্বচনীয় !
বুঝি অনুমানে, চোখে কৌতুক ঝলে—
ভাবিছ বসিয়া সহাস-ওষ্ঠাধরা
এ সমস্তই কবিতার কৌশলে
মৃদুসংকেতে মোটা ফরমাশ করা।
আচ্ছা, নাহয় ইঙ্গিত শুনে হেসো ;
বরদানে, দেবী, নাহয় হইবে বাম ;
খালি হাতে যদি আস তবে তাই এসো,
সে দুটি হাতেরও কিছু কম নহে দাম !

সেই কথা ভালো, তুমি চলে এসো একা,
বাতাসে তোমার আভাস যেন গো থাকে ;
স্তব্ধ প্রহরে দুজনে বিজনে দেখা,
সন্ধ্যাতারাটি শিরীষডালের ফাঁকে।
তার পরে যদি ফিরে যাও ধীরে ধীরে
ভুলে ফেলে যেয়ো তোমার যূথীর মালা ;
ইমন বাজিবে বক্ষের শিরে শিরে,
তার পরে হবে কাব্য লেখার পালা।
যত লিখে যাই ততই ভাবনা আসে,
লেফাফার 'পরে কার নাম দিতে হবে ;
মনে মনে ভাবি গভীর দীর্ঘশ্বাসে,
কোন্ দূর যুগে তারিখ ইহার কবে।

মনে ছবি আসে— ঝিকিমিকি বেলা হল,
বাগানের ঘাটে গা ধুয়েছ তাড়াতাড়ি ;
কচি মুখখানি, বয়স তখন ষোলো ;
তনু দেহখানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ি।
কুঙ্কুমফোঁটা ভুরুসঙ্গমে কিবা,
শ্বেতকরবীর গুচ্ছ কর্ণমূলে ;
পিছন হইতে দেখিনু কোমল গ্রীবা
লোভন হয়েছে রেশমচিকন চুলে।
তাম্রথালায় গোড়ে মালাখানি গেঁথে
সিক্ত রুমালে যত্নে রেখেছ ঢাকি,
ছায়া-হেলা ছাদে মাদুর দিয়েছ পেতে—
কার কথা ভেবে বসে আছ জানি না কি !

আজি এই চিঠি লিখিছে তো সেই কবি—
গোধূলির ছায়া ঘনায় বিজন ঘরে,
দেয়ালে ঝুলিছে সেদিনের ছায়াছবি—
শব্দটি নেই, ঘড়ি টিক্‌টিক্ করে।
ওই তো তোমার হিসাবের ছেঁড়া পাতা,
দেরাজের কোণে পড়ে আছে আধুলিটি।
কতদিন হল গিয়েছ ভাবিব না তা,
শুধু রচি বসে নিমন্ত্রণের চিঠি।
মনে আসে, তুমি পুব জানালার ধারে
পশমের গুটি কোলে নিয়ে আছ বসে ;
উৎসুক চোখে বুঝি আশা করো কারে,
আলগা আঁচল মাটিতে পড়েছে খসে।
অর্ধেক ছাদে রৌদ্র নেমেছে বেঁকে,
বাকি অর্ধেক ছায়াখানি দিয়ে ছাওয়া ;
পাঁচিলের গায়ে চীনের টবের থেকে
চামেলি ফুলের গন্ধ আনিছে হাওয়া।

এ চিঠির নেই জবাব দেবার দায়,
আপাতত এটা দেরাজে দিলেম রেখে।
পারো যদি এসো শব্দবিহীন পায়,
চোখ টিপে ধোরো হঠাৎ পিছন থেকে।
আকাশে চুলের গন্ধটি দিয়ো পাতি,
এনো সচকিত কাঁকনের রিনিরিন,
আনিয়ো মধুর স্বপ্নসঘন রাতি,
আনিয়ো গভীর আলস্যঘন দিন।
তোমাতে আমাতে মিলিত নিবিড় একা—
স্থির আনন্দ, মৌন মাধুরীধারা,
মুগ্ধ প্রহর ভরিয়া তোমারে দেখা,
তব করতল মোর করতলে হারা।

চন্দননগর
১৪ জুন ১৯৩৫

## জয়ী

রূপহীন, বর্ণহীন, চিরস্তব্ধ, নাই শব্দ সুর,
মহাতৃষ্ণা মরুতলে মেলিয়াছে আসন মৃত্যুর ;
সে মহানৈঃশব্দ্য-মাঝে বেজে ওঠে মানবের বাণী
'বাধা নাহি মানি'।

আস্ফালিছে লক্ষ লোল ফেনজিহ্বা নিষ্ঠুর নীলিমা—
তরঙ্গতাণ্ডবী মৃত্যু, কোথা তার নাহি হেরি সীমা ;
সে রুদ্র সমুদ্রতটে ধ্বনিতেছে মানবের বাণী
'বাধা নাহি মানি'।

আদিতম যুগ হতে অন্তহীন অন্ধকারপথে
আবর্তিছে বহ্নিচক্র কোটি কোটি নক্ষত্রের রথে ;
দুর্গম রহস্য ভেদি সেথা উঠে মানবের বাণী
'বাধা নাহি মানি'।

অণুতম অণুকণা আকাশে আকাশে নিত্যকাল
বর্ষিয়া বিদ্যুৎবিন্দু রচিছে রূপের ইন্দ্রজাল ;
নিরুদ্ধ প্রবেশদ্বারে উঠে সেথা মানবের বাণী
'বাধা নাহি মানি'।

চিত্তের গহনে যেথা দুরন্ত কামনা লোভ ক্রোধ
আত্মঘাতী মত্ততায় করিছে মুক্তির দ্বার রোধ
অন্ধতার অন্ধকারে উঠে সেথা মানবের বাণী
'বাধা নাহি মানি'।

## শেষ

বহি লয়ে অতীতের সকল বেদনা,
ক্লান্তি লয়ে, গ্লানি লয়ে, লয়ে মুহূর্তের আবর্জনা,
লয়ে প্রীতি,
লয়ে সুখস্মৃতি,
আলিঙ্গন ধীরে ধীরে শিথিল করিয়া

এই দেহ যেতেছে সরিয়া
মোর কাছ হতে।
সেই রিক্ত অবকাশ যে আলোতে
পূর্ণ হয়ে আসে
অনাসক্ত আনন্দ-উদ্ভাসে
নির্মল পরশ তার
খুলি দিল গত রজনীর দ্বার।

নবজীবনের রেখা
আলোরূপে প্রথম দিতেছে দেখা ;
কোনো চিহ্ন পড়ে নাই তাহে,
কোনো ভার ; ভাসিতেছে সত্তার প্রবাহে
সৃষ্টির আদিম তারাসম
এ চৈতন্য মম।
ক্ষোভ তার নাই দুঃখে সুখে ;
যাত্রার আরম্ভ তার নাহি জানি কোন্ লক্ষ্যমুখে।

পিছনের ডাক
আসিতেছে শীর্ণ হয়ে ; সম্মুখেতে নিস্তব্ধ নির্বাক্
ভবিষ্যৎ জ্যোতির্ময়
অশোক অভয়,
স্বাক্ষর লিখিল তাহে সূর্য অস্তগামী।
যে মন্ত্র উদাত্ত সুরে উঠে শূন্যে সেই মন্ত্র— 'আমি'।

শান্তিনিকেতন
৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

## পৃথিবী

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী,
শেষ-নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদীতলে।

মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা,
বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে,
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে ;
মানুষের জীবন দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে।

ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা
বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র,
তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত কর অট্টবিদ্রূপে ;
দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে, মহৎজীবনে যার অধিকার।
শ্রেয়কে কর দুর্মূল্য,
কৃপা কর না কৃপাপাত্রকে।
তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতিমুহূর্তের সংগ্রাম,
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।
জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি,
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা।
তোমার নির্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ,
ত্রুটি ঘটলে তার পূর্ণ মূল্য শোধ হয় বিনাশে।

তোমার ইতিহাসের আদিপর্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জয়,
সে পরুষ, সে বর্বর, সে মূঢ়।
তার অঙ্গুলি ছিল স্থূল, কলাকৌশলবর্জিত ;
গদা-হাতে মুষল-হাতে লণ্ডভণ্ড করেছে সে সমুদ্র পর্বত :
অগ্নিতে বাষ্পেতে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলেছে আকাশে।
জড়রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি,
প্রাণের 'পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা।

দেবতা এলেন পর-যুগে
মন্ত্র পড়লেন দানবদমনের,
জড়ের ঔদ্ধত্য হল অভিভূত ;
জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে।
উষা দাঁড়ালেন পূর্বাচলের শিখরচূড়ায়,
পশ্চিমসাগরতীরে সন্ধ্যা নামলেন মাথায় নিয়ে শান্তিঘট।

নম্র হল শিকলে-বাঁধা দানব,
তবু সেই আদিম বর্বর আঁকড়ে রইল তোমার ইতিহাস।
ব্যবস্থার মধ্যে সে হঠাৎ আনে বিশৃঙ্খলতা,
তোমার স্বভাবের কালো গর্ত থেকে
হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকেবেঁকে।
তোমার নাড়ীতে লেগে আছে তার পাগলামি।

দেবতার মন্ত্র উঠছে আকাশে বাতাসে অরণ্যে
দিনে রাত্রে
উদাত্ত অনুদাত্ত মন্দ্রস্বরে।
তবু তোমার বক্ষের পাতাল থেকে আধপোষা নাগ-দানব
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে ফণা তুলে,
তার তাড়নায় তোমার আপন জীবকে করছ আঘাত,
ছারখার করছ আপন সৃষ্টিকে।
শুভে অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠে,
তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে
আজ রেখে যাব আমার ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি।
বিরাট প্রাণের, বিরাট মৃত্যুর গুপ্তসঞ্চার
তোমার যে-মাটির তলায়
তাকে আজ স্পর্শ করি, উপলব্ধি করি সর্ব দেহে মনে।
অগণিত যুগযুগান্তরের
অসংখ্য মানুষের লুপ্তদেহ পুঞ্জিত তার ধুলায়।
আমিও রেখে যাব কয় মুষ্টি ধূলি
আমার সমস্ত সুখদুঃখের শেষ পরিণাম—
রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল-পরিচয়-গ্রাসী
নিঃশব্দ মহাধূলিরাশির মধ্যে।

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
এক দিকে আপক্কধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র,
সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে।
অস্তগামী সূর্য শ্যামশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী—
'আমি আনন্দিত।'
অন্য দিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।
বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেনপাখির মতো তোমার ঝড়,
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ,
তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু ক'রে
হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উবুড় হয়ে।

হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকলছেঁড়া কয়েদি-ডাকাতের মতো।

আবার ফাল্গুনে দেখেছি তোমার আতপ্ত দক্ষিনে হাওয়া
ছড়িয়ে দিয়েছে বিরহ-মিলনের স্বগতপ্রলাপ
আম্রমুকুলের গন্ধে।
চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে উপচিয়ে পড়েছে
স্বর্গীয় মদের ফেনা।
বনের মর্মরধ্বনি বাতাসের স্পর্ধায় ধৈর্য হারিয়েছে
অকস্মাৎ কল্লোলোচ্ছ্বাসে।

স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্যনবীনা,
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞহুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যুষে,
তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ
শতশত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ—
বিনা বেদনায় বিছিয়ে এসেছ তোমার বর্জিত সৃষ্টি
অগণ্য বিস্মৃতির স্তরে স্তরে।
জীবপালিনী, আমাদের পুষেছ
তোমার খণ্ডকালের ছোটো ছোটো পিঞ্জরে।
তারই মধ্যে সব খেলার সীমা
সব কীর্তির অবসান।

আজ আমি কোনো মোহ নিয়ে আসি নি তোমার সম্মুখে,
এতদিন যে দিনরাত্রির মালা গেঁথেছি বসে বসে
তার জন্যে অমরতার দাবি করব না তোমার দ্বারে।
তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত নিমীলিত হতে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো-একটি আসনের
সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোনো-একটি ফলবান খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে ;
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে।

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।

শান্তিনিকেতন
১৬ অক্টোবর ১৯৩৫

## ব্রাত্য

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।
দেবালয়ের মন্দিরদ্বারে
পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।
ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তাঁর আপন স্থানে
সকল বেড়ার বাইরে
সহজ ভক্তির আলোকে,
নক্ষত্রখচিত আকাশে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর-জনার মিলন-বিরহের
গহন বেদনায়।
যে দেখা বানিয়ে-দেখা বাঁধা ছাঁচে,
প্রাচীর ঘিরে দুয়ার তুলে,
সে দেখার উপায় নেই ওদের হাতে।
কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।
দেখেছি একতারা-হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।

কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।

পূজারী হাসিমুখে মন্দির থেকে বাহির হয়ে আসে,
আমাকে শুধায়, 'দেখে এলে তোমার দেবতাকে ?'
আমি বলি, 'না।'
অবাক হয়ে শুনে বলে, 'জানা নেই পথ ?'
আমি বলি, 'না।'
প্রশ্ন করে, 'কোনো জাত নেই বুঝি তোমার ?'
আমি বলি, 'না।'

এমন করে দিন গেল ;
আজ আপন মনে ভাবি—
'কে আমার দেবতা,
কার করেছি পূজা।'
শুনেছি যাঁর নাম মুখে-মুখে,
পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে,
কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।
তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব ব'লে
পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
আজ দেখেছি প্রমাণ হয় নি আমার জীবনে।
কেননা, আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।
মন্দিরের রুদ্ধদ্বারে এসে আমার পূজা
বেরিয়ে চলে গেল দিগন্তের দিকে—
সকল বেড়ার বাইরে,
নক্ষত্রখচিত আকাশতলে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর-জনার মিলন-বিরহের
বেদনাবন্ধুর পথে।

বালক ছিলেম যখন
পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের আদি মন্ত্রটি
পেয়েছি আপন পুলককম্পিত অন্তরে—
আলোর মন্ত্র।
পেয়েছি নারকেল-শাখার ঝালর-ঝোলা
আমার বাগানটিতে,
ভেঙে-পড়া শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলের উপর
একলা ব'সে।
প্রথম প্রাণের বহ্নি-উৎস থেকে

নেমেছে তেজোময়ী লহরী,
দিয়েছে আমার নাড়ীতে
অনির্বচনীয়ের স্পন্দন।
আমার চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া
অনাদিকালের কোন্ অস্পষ্ট বার্তা,
প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিস্ফুরণ।
হেমন্তের রিক্তশস্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে
আলোর নিঃশব্দ চরণধ্বনি
শুনেছি আমার রক্তচাঞ্চল্যে।
সেই ধ্বনি আমার অনুসরণ করেছে
জন্মপূর্বের কোন্ পুরাতন কালযাত্রা থেকে।
বিস্ময়ে আমার চিত্ত প্রসারিত হয়েছে অসীমকালে
যখন ভেবেছি
সৃষ্টির আলোকতীর্থে
সেই জ্যোতিতে আজ আমি জাগ্রত
যে জ্যোতিতে অযুত নিযুত বৎসর পূর্বে
সুপ্ত ছিল আমার ভবিষ্যৎ।
আমার পূজা আপনিই সম্পূর্ণ হয়েছে প্রতিদিন
এই জাগরণের আনন্দে।
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
রীতিবন্ধনের বাহিরে আমার আত্মবিস্মৃত পূজা
কোথায় হল উৎসৃষ্ট জানতে পারি নি।

যখন বালক ছিলেম ছিল না কেউ সাথি,
দিন কেটেছে একা একা
চেয়ে চেয়ে দূরের দিকে।
জন্মেছিলেম অনাচারের অনাদৃত সংসারে,
চিহ্নমোছা, প্রাচীরহারা।
প্রতিবেশীর পাড়া ছিল ঘন বেড়ায় ঘেরা,
আমি ছিলেম বাইরের ছেলে, নাম-না-জানা।
ওদের ছিল তৈরি বাসা, ভিড়ের বাসা—
ওদের বাঁধাপথের আসা-যাওয়া
দেখেছি দূরের থেকে
আমি ব্রাত্য, আমি পঙ্‌ক্তিহারা।
বিধানবাঁধা মানুষ আমাকে মানুষ মানে নি,

তাই আমার বন্ধুহীন খেলা ছিল সকল পথের চৌমাথায়,
ওরা তার ও-পাশ দিয়ে চলে গেছে
বসনপ্রান্ত তুলে ধরে।
ওরা তুলে নিয়ে গেল ওদের দেবতার পূজায়
শাস্ত্র মিলিয়ে বাছা-বাছা ফুল,
রেখে দিয়ে গেল আমার দেবতার জন্যে
সকল দেশের সকল ফুল,
এক সূর্যের আলোকে চিরস্বীকৃত।
দলের উপেক্ষিত আমি,
মানুষের মিলনক্ষুধায় ফিরেছি,
যে মানুষের অতিথিশালায়
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই।
লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সঙ্গী
যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে
আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে।
তারা বীর, তারা তপস্বী, তারা মৃত্যুঞ্জয়,
তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার স্বগোত্র,
তাদের নিত্যশুচিতায় আমি শুচি।
তারা সত্যের পথিক, জ্যোতির সাধক,
অমৃতের অধিকারী।
মানুষকে গণ্ডির মধ্যে হারিয়েছি
মিলেছে তার দেখা
দেশবিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে।
তাকে বলেছি হাতজোড় করে—
হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো
ভেদচিহ্নের তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

একদিন বসন্তে নারী এল সঙ্গীহারা আমার বনে
প্রিয়ার মধুর রূপে।
এল সুর দিতে আমার গানে,
নাচ দিতে আমার ছন্দে,

সুধা দিতে আমার স্বপ্নে।
উদ্দাম একটা ঢেউ হৃদয়ের তট ছাপিয়ে
হঠাৎ হল উচ্ছলিত,
ডুবিয়ে দিল সকল ভাষা,
নাম এল না মুখে।
সে দাঁড়াল গাছের তলায়,
ফিরে তাকাল আমার কুণ্ঠিত বেদনাকরুণ
মুখের দিকে।
ত্বরিত পদে এসে বসল আমার পাশে।
দুই হাতের মধ্যে আমার হাত তুলে নিয়ে বললে,
'তুমি চেন না আমাকে, তোমাকে চিনি নে আমি,
আজ পর্যন্ত কেমন করে এটা হল সম্ভব
আমি তাই ভাবি।'
আমি বললেম, 'দুই না-চেনার মাঝখানে
চিরকাল ধরে আমরা দুজনে বাঁধব সেতু,
এই কৌতূহল সমস্ত বিশ্বের অন্তরে।'

ভালোবেসেছি তাকে।
সেই ভালোবাসার একটা ধারা
ঘিরেছে তাকে স্নিগ্ধ বেষ্টনে
গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো।
অল্পবেগের সেই প্রবাহ
বহে চলেছে প্রিয়ার সামান্য প্রতিদিনের
অনুচ্চ তটচ্ছায়ায়।
অনাবৃষ্টির কার্পণ্যে কখনো সে হয়েছে ক্ষীণ,
আষাঢ়ের দাক্ষিণ্যে কখনো সে হয়েছে প্রগল্‌ভ।
তুচ্ছতার আবরণে অনুজ্জ্বল
অতি সাধারণ স্ত্রী-স্বরূপকে
কখনো করেছে লালন, কখনো করেছে পরিহাস,
আঘাত করেছে কখনো-বা।

আমার ভালোবাসার আর-একটা ধারা
মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী।
মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে
তারই অতল থেকে।
সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে

আমার সর্ব দেহে মনে—
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।
জ্বেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চিরবিরহের প্রদীপশিখা।
সেই আলোকে দেখেছি তাকে অসীম শ্রীলোকে,
দেখেছি তাকে বসন্তের পুষ্পপল্লবের প্লাবনে,
সিসুগাছের কাঁপন-লাগা পাতাগুলির থেকে
ঠিকরে পড়েছে যে রৌদ্রকণা
তার মধ্যে শুনেছি তার সেতারের দ্রুতঝংকৃত সুর।
দেখেছি ঋতুরঙ্গভূমিতে
নানা রঙের ওড়না-বদল-করা তার নাচ
ছায়ায় আলোয়।
ইতিহাসের সৃষ্টি-আসনে
ওকে দেখেছি বিধাতার বামপাশে :
দেখেছি সুন্দর যখন অবমানিত
কদর্য কঠোরের অশুচিস্পর্শে
তখন সেই রুদ্রাণীর তৃতীয় নেত্র থেকে
বিচ্ছুরিত হয়েছে প্রলয়-অগ্নি,
ধ্বংস করেছে মহামারীর গোপন আশ্রয়।

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ—
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত।
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

শান্তিনিকেতন
১৮ বৈশাখ ১৩৪৩

## আমি

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর',
সুন্দর হল সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা,
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহংকার—
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকার-পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।
তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
না, না, না—
না পান্না, না চুনি, না আলো, না গোলাপ,
না আমি, না তুমি!
ও দিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি'।
সেই আমির গহনে আলো-আঁধারের ঘটল সংগম,
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস।
'না' কখন ফুটে উঠে হল 'হাঁ', মায়ার মন্ত্রে,
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।

একে বোলো না তত্ত্ব;
আমার মন হয়েছে পুলকিত
বিশ্ব-আমির রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তূলি, পাত্রে নিয়ে রঙ।

পণ্ডিত বলছেন—
বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার,

মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে
পৃথিবীর পাঁজরের কাছে।
একদিন দেবে চরম টান তার সাগরে পর্বতে ;
মর্ত্যলোকে মহাকালের নূতন খাতায়
পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য,
গিলে ফেলবে দিনরাতের জমাখরচ ;
মানুষের কীর্তি হারাবে অমরতার ভান,
তার ইতিহাসে লেপে দেবে
অনন্ত রাত্রির কালি।
মানুষের যাবার দিনের চোখ
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ,
মানুষের যাবার দিনের মন
ছানিয়ে নেবে রস।
শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে,
জ্বলবে না কোথাও আলো।
বীণাহীন সভায় যন্ত্রীর আঙুল নাচবে,
বাজবে না সুর।
সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে
নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।
তখন বিরাট বিশ্বভুবনে
দূরে দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই—
'তুমি সুন্দর',
'আমি ভালোবাসি'।
বিধাতা কি আবার বস্‌বেন সাধনা করতে
যুগযুগান্তর ধ'রে ?
প্রলয়সন্ধ্যায় জপ করবেন—
'কথা কও, কথা কও',
বলবেন 'বলো, তুমি সুন্দর',
বলবেন 'বলো, আমি ভালোবাসি' ?

শান্তিনিকেতন
২৯ মে ১৯৩৬

## বাঁশিওয়ালা

'ওগো বাঁশিওয়ালা
বাজাও তোমার বাঁশি,
শুনি আমার নূতন নাম'
—এই বলে তোমাকে প্রথম চিঠি লিখেছি
মনে আছে তো ?

আমি তোমার বাংলাদেশের মেয়ে।
সৃষ্টিকর্তা পুরো সময় দেন নি
আমাকে মানুষ করে গড়তে
রেখেছেন আধাআধি করে।
অন্তরে বাহিরে মিল হয় নি
সেকালে আর আজকের কালে,
মিল হয় নি ব্যথায় আর বুদ্ধিতে,
মিল হয় নি শক্তিতে আর ইচ্ছায়।
আমাকে তুলে দেন নি এ যুগের পারানি নৌকোয়,
চলা আটক করে ফেলে রেখেছেন
কালস্রোতের ওপারে বালুডাঙায়।
সেখান থেকে দেখি
প্রখর আলোয় ঝাপসা দূরের জগৎ,
বিনা কারণে কাঙাল মন অধীর হয়ে ওঠে,
দুই হাত বাড়িয়ে দিই,
নাগাল পাই নে কিছুই কোনো দিকে।

বেলা তো কাটে না,
বসে থাকি জোয়ারজলের দিকে চেয়ে,
ভেসে যায় মুক্তিপারের খেয়া,
ভেসে যায় ধনপতির ডিঙা,
ভেসে যায় চলতি বেলার আলোছায়া।
এমন সময় বাজে তোমার বাঁশি
ভরা জীবনের সুরে।
মরা দিনের নাড়ীর মধ্যে
দব্‌দবিয়ে ফিরে আসে প্রাণের বেগ।

কী বাজাও তুমি,
জানি নে সে সুর জাগায় কার মনে কী ব্যথা।
বুঝি বাজাও পঞ্চম রাগে
দক্ষিণ হাওয়ার নবযৌবনের ভাটিয়ারি।
শুনতে শুনতে নিজেকে মনে হয়—
যে ছিল পাহাড়তলির ঝিরঝিরে নদী,
তার বুকে হঠাৎ উঠেছে ঘনিয়ে
শ্রাবণের বাদলরাত্রি।
সকালে উঠে দেখা যায় পাড়ি গেছে ভেসে,
একগুঁয়ে পাথরগুলোকে ঠেলা দিচ্ছে
অসহ্য স্রোতের ঘূর্ণিমাতন।

আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর,
ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, আগুনের ডাক,
পাঁজরের উপরে আছাড়খাওয়া
মরণসাগরের ডাক,
ঘরের শিকলনাড়া উদাসী হাওয়ার ডাক।
যেন হাঁক দিয়ে আসে
অপূর্ণের সংকীর্ণ খাদে
পূর্ণ স্রোতের ডাকাতি,
ছিনিয়ে নেবে, ভাসিয়ে দেবে বুঝি।
অঙ্গে অঙ্গে পাক দিয়ে ওঠে
কালবৈশাখীর ঘূর্ণি-মার-খাওয়া
অরণ্যের বকুনি।
ডানা দেয় নি বিধাতা,
তোমার গান দিয়েছে আমার স্বপ্নে
ঝোড়ো আকাশে উড়ো প্রাণের পাগলামি।

ঘরে কাজ করি শান্ত হয়ে ;
সবাই বলে ভালো।
তারা দেখে আমার ইচ্ছার নেই জোর,
সাড়া নেই লোভের,
ঝাপট লাগে মাথার উপর,
ধুলোয় লুটোই মাথা।
দুরন্ত ঠেলায় নিষেধের পাহারা কাত করে ফেলি
নেই এমন বুকের পাটা ;
কঠিন করে জানি নে ভালোবাসতে,

কাঁদতে শুধু জানি,
জানি এলিয়ে পড়তে পায়ে।

বাঁশিওয়ালা,
বেজে ওঠে তোমার বাঁশি--
ডাক পড়ে অমর্ত্যলোকে ;
সেখানে আপন গরিমায়
উপরে উঠেছে আমার মাথা।
সেখানে কুয়াশার পর্দাছেঁড়া
তরুণ সূর্য আমার জীবন।
সেখানে আগুনের ডানা মেলে দেয়
আমার বারণ-না-মানা আগ্রহ,
উড়ে চলে অজানা শূন্যপথে,
প্রথম ক্ষুধায় অস্থির গরুড়ের মতো।
জেগে ওঠে বিদ্রোহিণী,
তীক্ষ্ণ চোখের আড়ে জানায় ঘৃণা
চার দিকের ভীরুর ভিড়কে ;
কৃশ কুটিলের কাপুরুষতাকে।

বাঁশিওয়ালা,
হয়তো আমাকে দেখতে চেয়েছ তুমি।
জানি নে, ঠিক জায়গাটি কোথায়,
ঠিক সময় কখন,
চিনবে কেমন করে।
দোসরহারা আষাঢ়ের ঝিল্লিঝনক রাত্রে
সেই নারী তো ছায়ারূপে
গেছে তোমার অভিসারে চোখ-এড়ানো পথে।
সেই অজানাকে কত বসন্তে
পরিয়েছ ছন্দের মালা,
শুকোবে না তার ফুল।

তোমার ডাক শুনে একদিন
ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে
অন্ধকার কোণ থেকে
বেরিয়ে এল ঘোমটাখসা নারী।
যেন সে হঠাৎ-গাওয়া নতুন ছন্দ বাল্মীকির,

চমক লাগাল তোমাকেই।
সে নামবে না গানের আসন থেকে ;
সে লিখবে তোমাকে চিঠি,
রাগিণীর আবছায়ায় বসে।
তুমি জানবে না তার ঠিকানা।

ওগো বাঁশিওয়ালা,
সে থাক্ তোমার বাঁশির সুরের দূরত্বে।

শান্তিনিকেতন
১৬ জুন ১৯৩৬

## কাল রাত্রে

কাল রাত্রে
বাদলের-দানোয়-পাওয়া অন্ধকারে
বর্ষণের রিম্‌ঝিম্ প্রলাপে
চাপা দিয়েছিল
সন্ন্যাসী নিশীথের ধ্যানমন্ত্র।
জড়ত্বে ছিলেম পরাভূত,
ছিলেম উপবাসী ;
ছিল শিথিল শক্তি ধূলিশয়ান।
বুকে ভর দিয়ে বসেছিল
সমস্ত আকাশের সঙ্গহীনতা।
'চাই চাই' করে কেঁদে উঠেছিল প্রাণ
প্রহরে প্রহরে নিশাচর পাখির মতো।
নানা নাম ধরেছিল ভিক্ষা,
অন্তরের অন্ধস্তরে শিকড় চালিয়েছিল
আঁকাবাঁকা অশুচি কান্নার।
'চাই চাই' ব'লে
শূন্য হাৎড়ে বেড়িয়েছিল রাতকানা
যাকে চায় তাকে না জেনে।
শেষে ক্রুদ্ধ গর্জনে হেঁকে উঠল—
'নেই সে নেই, কোথাও নেই।'
সত্যহারা শূন্যতার গর্ত থেকে
কালো কামনার সাপের বংশ

বেরিয়ে এসে জড়িয়েছে কাঙালকে—
নাস্তিত্বের সেই শিকলবাঁধা ভৃত্যকে—
নিরর্থের বোঝায়
বেঁকেছে যার পিঠ,
নেমেছে যার মাথা।

ভোর হল রাত্রি।
আষাঢ়ের সকালে অকস্মাৎ হাওয়ায়
ঘন মেঘের দুর্গপ্রাচীর
পড়ল ভেঙেচুরে।
ছুটে বেরিয়ে এসেছে
প্রভাতের বাঁধনছেঁড়া আলো।
মুক্তির আনন্দঘোষণা
বেজে উঠল আকাশে আকাশে
আগুনের ভাষায়।
পাখিদের ছোটো কোমল তনুতে
দুরন্ত হয়ে উঠল প্রাণের উৎসুক ছন্দ।
চলল তাদের সুরের তীরখেলা
কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে, শাখা থেকে শাখায়।
সেতারের দ্রুততালের বাজন যেন
পাতায় পাতায় আলোর চমক।
মন দাঁড়িয়ে উঠল;
বললে, আমি পূর্ণ।
তার অভিষেক হল
আপনারই উদ্‌বেল তরঙ্গে।
তার আপন সঙ্গ
আপনাকে করলে বেষ্টন
শিলাতটকে ঝরনার মতো—
উপচে উঠে মিলতে চলল
চার দিকের সব-কিছুর মধ্যে।

চেতনার সঙ্গে আলোর রইল না কোনো ব্যবধান।
প্রভাতসূর্যের অন্তরে
দেখতে পেলেম আপনাকে
হিরণ্ময় পুরুষ;
ডিঙিয়ে গেলেম দেহের বেড়া,

পেরিয়ে গেলেম কালের সীমা,
গান গাইলেম 'চাই নে কিছু চাই নে'—
যেমন গাইছে রক্তপদ্মের রক্তিমা,
যেমন গাইছে সমুদ্রের ঢেউ,
সন্ধ্যাতারার শান্তি,
গিরিশিখরের নির্জনতা।

শান্তিনিকেতন
২৩ জুন ১৯৩৬

## আফ্রিকা

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বার বার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা-নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা,
বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।
সেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি
সংগ্রহ করছিলে দুর্গমের রহস্য,
চিনছিলে জল-স্থল-আকাশের দুর্বোধ সংকেত,
প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু
মন্ত্র জাগাচ্ছিল তোমার চেতনাতীত মনে।
বিদ্রূপ করছিলে ভীষণকে
বিরূপের ছদ্মবেশে,
শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে
আপনাকে উগ্র ক'রে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায়
তাণ্ডবের দুন্দুভিনিনাদে।
হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে

নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে;
দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।
সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়
মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘন্টা
সকালে সন্ধ্যায়, দয়াময় দেবতার নামে;
শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে;
কবির সংগীতে বেজে উঠছিল
সুন্দরের আরাধনা।
আজ যখন পশ্চিমদিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্তগহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল,
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তের কবি
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে,
বলো, 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।

শান্তিনিকেতন
২৬ মাঘ ১৩৪৩

## বাংলাদেশের মানুষ

বাংলাদেশের মানুষ হয়ে
ছুটিতে ধাও চিতোরে,
কাঁচড়াপাড়ার জলহাওয়াটা
লাগল এতই তিতো রে?

মরিস ভয়ে ঘরের প্রিয়ার,
পালাস ভয়ে ম্যালেরিয়ার,
হায় রে ভীরু, রাজপুতানার
ভূত পেয়েছে কি তোরে।
লড়াই ভালোবাসিস, সে তো
আছেই ঘরের ভিতরে।

## জিরাফের বাবা

জিরাফের বাবা বলে,—
'খোকা তোর দেহ
দেখে দেখে মনে মোর
কমে যায় স্নেহ।
সামনে বিষম উঁচু,
পিছনেতে খাটো,
এমন দেহটা নিয়ে
কী করে যে হাঁটো!'

খোকা বলে, 'আপনার
পানে তুমি চেহো—
মা যে কেন ভালোবাসে
বোঝে না তা কেহ।'

## আদর ক'রে মেয়ের নাম

আদর ক'রে মেয়ের নাম রেখেছে ক্যালিফর্নিয়া,
গরম হল বিয়ের হাট ওই মেয়েরই দর নিয়া।

মহেশদাদা খুঁজিয়া গ্রামে গ্রামে
পেয়েছে ছেলে ম্যাসাচুসেট্স্ নামে,
শাশুড়ি বুড়ি ভীষণ খুশি নামজাদা সে বর নিয়া
ভাটের দল চেঁচিয়ে মরে নামের গুণ বর্ণিয়া।

## মন উড়ু উড়ু

মন উড়ু উড়ু, চোখ ঢুলু ঢুলু,
ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক—
আলুথালু ভাষা, ভাব এলোমেলো,
ছন্দটা নির্‌বাঁধুনিক।

পাঠকেরা বলে, 'এ তো নয় সোজা,
বুঝি কি বুঝি নে যায় না সে বোঝা।'
কবি বলে, 'তার কারণ, আমার
কবিতার ছাঁদ আধুনিক।'

## স্মরণ

যখন রব না আমি মর্ত্যকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

হেথায় যে মঞ্জরী দোলে শাখে শাখে,
পুচ্ছ নাচায়ে যত পাখি গায়,
ওরা মোর নাম ধ'রে কভু নাহি ডাকে,
মনে নাহি করে বসি নিরালায়।
কত যাওয়া কত আসা এই ছায়াতলে
আনমনে নেয় ওরা সহজেই,
মিলায় নিমেষে কত প্রতি পলে পলে
হিসাব কোথাও তার কিছু নেই।
ওদের এনেছে ডেকে আদিসমীরণে
ইতিহাস-লিপিহারা যেই কাল
আমারে সে ডেকেছিল কভু খনে খনে,
রক্তে বাজায়েছিল তারি তাল।
সেদিন ভুলিয়াছিনু কীর্তি ও খ্যাতি,
বিনা পথে চলেছিল ভোলা মন—
চারি দিকে নামহারা ক্ষণিকের জ্ঞাতি
আপনারে করেছিল নিবেদন।

সেদিন ভাবনা ছিল মেঘের মতন,
কিছু নাহি ছিল ধরে রাখিবার—
সেদিন আকাশে ছিল রূপের স্বপন,
রঙ ছিল উড়ো ছবি আঁকিবার।
সেদিনের কোনো দানে ছোটো বড়ো কাজে
স্বাক্ষর দিয়ে দাবি করি নাই—
যা লিখেছি যা মুছেছি শূন্যের মাঝে
মিলায়েছে, দাম তার ধরি নাই।

সেদিনের হারা আমি, চিহ্নবিহীন
পথ বেয়ে কোরো তার সন্ধান—
হারাতে হারাতে যেথা চলে যায় দিন,
ভরিতে ভরিতে ডালি অবসান।
মাঝে মাঝে পেয়েছিল আহ্বানপাঁতি
যেখানে কালের সীমা-রেখা নেই—
খেলা করে চলে যায় খেলিবার সাথি
গিয়েছিল দায়হীন সেখানেই।
দিই নাই, চাই নাই, রাখি নি কিছুই
ভালোমন্দের কোনো জঞ্জাল—
চলে-যাওয়া ফাগুনের ঝরা ফুলে ভুঁই
আসন পেতেছে মোর ক্ষণকাল।
সেইখানে মাঝে মাঝে এল যারা পাশে
কথা তারা ফেলে গেছে কোন্ ঠাঁই—
সংসার তাহাদের ভোলে অনায়াসে,
সভাঘরে তাহাদের স্থান নাই।
বাসা যার ছিল ঢাকা জনতার পারে,
ভাষাহারাদের সাথে মিল যার,
যে আমি চায় নি কারে ঋণী করিবারে,
রাখিয়া যে যায় নাই ঋণভার,
সে আমারে কে চিনেছ মর্ত্যকায়ায়—
কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না ডেকো না সভা, এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

শান্তিনিকেতন
২৫ চৈত্র ১৩৪৩

## সন্ধ্যা

দিন সে প্রাচীন অতি প্রবীণ বিষয়ী
তীক্ষ্ণদৃষ্টি, বস্তুরাজ্যজয়ী,
দিকে দিকে প্রসারিয়া গনিছে সম্বল আপনার।
নবীনা শ্যামলা সন্ধ্যা পরেছে জ্যোতির অলংকার
চিরনববধূ,
অন্তরে সলজ্জ মধু
অদৃশ্য ফুলের কুঞ্জে রেখেছে নিভৃতে।
অবগুণ্ঠনের অলক্ষিতে
তার দূর পরিচয়
শেষ নাহি হয়।
দিনশেষে দেখা দেয় সে আমার বিদেশিনী—
তারে চিনি তবু নাহি চিনি।

[২০-২২ মে ১৯৩৭]

## বাসাবাড়ি

এই শহরে এই তো প্রথম আসা।
আড়াইটা রাত, খুঁজে বেড়াই কোন্ ঠিকানায় বাসা।
লণ্ঠনটা ঝুলিয়ে হাতে আন্দাজে যাই চলি
অজগরের ভূতের মতন গলির পরে গলি।

ধাঁধা ক্রমেই বেড়ে ওঠে, এক জায়গায় থেমে
দেখি পথের বাঁ দিক থেকে ঘাট গিয়েছে নেমে।
আঁধার-মুখোশ-পরা বাড়ি সামনে আছে খাড়া ;
হাঁ-করা-মুখ দুয়ারগুলো, নাইকো শব্দসাড়া।
চৌতলাতে একটা ধারে জানলাখানার ফাঁকে
প্রদীপশিখা ছুঁচের মতো বিঁধছে আঁধারটাকে।
বাকি মহল যত
কালো মোটা ঘোমটা-দেওয়া দৈত্যনারীর মতো।
বিদেশীর এই বাসাবাড়ি— কেউবা কয়েক মাস
এইখানে সংসার পেতেছে, করছে বসবাস ;
কাজকর্ম সাঙ্গ করি কেউবা কয়েক দিনে
চুকিয়ে ভাড়া কোন্‌খানে যায়, কেই বা তাদের চিনে।

শুধাই আমি, 'আছ কি কেউ, জায়গা কোথায় পাই ?'
মনে হল জবাব এল, 'আমরা না ই নাই।'
সকল দুয়োর জানলা হতে, যেন আকাশ জুড়ে
ঝাঁকে ঝাঁকে রাতের পাখি শূন্যে চলল উড়ে।
একসঙ্গে চলার বেগে হাজার পাখা তাই
অন্ধকারে জাগায় ধ্বনি, 'আমরা না ই নাই।'
আমি শুধাই, 'কিসের কাজে এসেছ এইখানে ?'
জবাব এল, 'সেই কথাটা কেহই নাহি জানে।
যুগে যুগে বাড়িয়ে চলি নেই-হওয়াদের দল,
বিপুল হয়ে ওঠে যখন দিনের কোলাহল
সকল কথার উপরেতে চাপা দিয়ে যাই—
নাই, নাই , নাই।'

পরের দিনে সেই বাড়িতে গেলেম সকালবেলা—
ছেলেরা সব পথে করছে লড়াই-লড়াই খেলা,
কাঠি হাতে দুই পক্ষের চলছে ঠকাঠকি।
কোণের ঘরে দুই বুড়োতে বিষম বকাবকি—
বাজিখেলায় দিনে দিনে কেবল জেতা হারা,
দেনাপাওনা জমতে থাকে, হিসাব হয় না সারা।
গন্ধ আসছে রান্নাঘরের, শব্দ বাসন মাজার ;
শূন্য ঝুড়ি দুলিয়ে হাতে ঝি চলেছে বাজার।
একে একে এদের সবার মুখের দিকে চাই,
কানে আসে রাত্রিবেলার 'আমরা না ই নাই।'

আলমোড়া
৯ জুন ১৯৩৭

## এ জন্মের সাথে লগ্ন

এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিল সূত্র যবে
ছিঁড়িল অদৃশ্য ঘাতে, সে মুহূর্তে দেখিনু সম্মুখে
অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে
নিরাসক্ত নির্মমের পানে। অকস্মাৎ মহা-একা
ডাক দিল একাকীরে প্রলয়তোরণচূড়া হতে।
অসংখ্য অপরিচিত জ্যোতিষ্কের নিঃশব্দতা-মাঝে
মেলিনু নয়ন ; জানিলাম, একাকীর নাই ভয়,
ভয় জনতার মাঝে ; একাকীর কোনো লজ্জা নাই,

লজ্জা শুধু যেথা-সেথা যার-তার চক্ষুর ইঙ্গিতে।
বিশ্বসৃষ্টিকর্তা একা, সৃষ্টিকাজে আমার আহ্বান
বিরাট নেপথ্যলোকে তাঁর আসনের ছায়াতলে।
পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মলিন জীর্ণতা
ফেলিয়া পশ্চাতে, রিক্তহস্তে মোরে বিরচিতে হবে
নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়।

শান্তিনিকেতন
২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭

## পশ্চাতের নিত্যসহচর

পশ্চাতের নিত্যসহচর, অকৃতার্থ হে অতীত,
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেতভূমি হতে
নিয়েছ আমার সঙ্গ, পিছু-ডাকা অক্লান্ত আগ্রহে
আবেশ-আবিল সুরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার,
বাসাছাড়া মৌমাছির গুন্ গুন্ গুঞ্জরন যেন
পুষ্পরিক্ত মৌনী বনে। পিছু হতে সম্মুখের পথে
দিতেছ বিস্তীর্ণ করি অস্তশিখরের দীর্ঘ ছায়া
নিরন্ত ধূসরপাণ্ডু বিদায়ের গোধূলি রচিয়া।
পশ্চাতের সহচর, ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন ;
রেখেছ হরণ করি মরণের অধিকার হতে
বেদনার ধন যত, কামনার রঙিন ব্যর্থতা,
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও। আজি মেঘমুক্ত শরতের
দূরে-চাওয়া আকাশেতে ভারমুক্ত চিরপথিকের
বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তারি হব অনুগামী।

শান্তিনিকেতন
৪ অক্টোবর ১৯৩৭

## রঙ্গমঞ্চে একে একে

রঙ্গমঞ্চে একে একে নিবে গেল যবে দীপশিখা,
রিক্ত হল সভাতল, আঁধারের মসী-অবলেপে
স্বপ্নচ্ছবি-মুছে-যাওয়া সুষুপ্তির মতো শান্ত হল
চিত্ত মোর নিঃশব্দের তর্জনীসংকেতে। এতকাল

যে সাজে রচিয়াছিনু আপনার নাট্যপরিচয়
প্রথম উঠিতে যবনিকা, সেই সাজ মুহূর্তেই
হল নিরর্থক। চিহ্নিত করিয়াছিনু আপনারে
নানা চিহ্নে, নানা বর্ণপ্রসাধনে, সহস্রের কাছে ;
মুছিল তা ; আপনাতে আপনার নিগূঢ় পূর্ণতা
আমারে করিল স্তব্ধ, সূর্যাস্তের অন্তিম সংকারে
দিনান্তের শূন্যতায় ধরার বিচিত্র চিত্রলেখা
যখন প্রচ্ছন্ন হয়, বাধামুক্ত আকাশ যেমন
নির্বাক্ বিস্ময়ে স্তব্ধ তারাদীপ্ত আত্মপরিচয়ে।

শান্তিনিকেতন
৯ অক্টোবর ১৯৩৭

## অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়

দেখিলাম— অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,
চিত্র-করা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,
নিয়ে তার বাঁশিখানি। দূর হতে দূরে যেতে যেতে
ম্লান হয়ে আসে তার রূপ, পরিচিত তীরে তীরে
তরুচ্ছায়া-আলিঙ্গিত লোকালয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে
সন্ধ্যা-আরতির ধ্বনি, ঘরে ঘরে রুদ্ধ হয় দ্বার,
ঢাকা পড়ে দীপশিখা, খেয়ানৌকা বাঁধা পড়ে ঘাটে।
দুই তটে ক্ষান্ত হল পারাপার, ঘনাল রজনী,
বিহঙ্গের মৌনগান অরণ্যের শাখায় শাখায়
মহানিঃশব্দের পায়ে রচি দিল আত্মবলি তার।
এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ববৈচিত্র্যের 'পরে
স্থলে জলে। ছায়া হয়ে, বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়। নক্ষত্রবেদীর তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া, ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড়হাতে—
হে পূষন্, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

শান্তিনিকেতন
৮ ডিসেম্বর ১৯৩৭

## যেদিন চৈতন্য মোর

যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তিগুহা হতে,
নিয়ে এল দুঃসহ বিস্ময়ঝড়ে দারুণ দুর্যোগে
কোন্ নরকাগ্নিগিরিগহ্বরের তটে ; তপ্ত ধূমে
গর্জি উঠি ফুঁসিছে সে মানুষের তীব্র অপমান,
অমঙ্গলধ্বনি তার কম্পান্বিত করে ধরাতল,
কালিমা মাখায় বায়ুস্তরে। দেখিলাম এ কালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। এক দিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার ; অন্য দিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ. বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরি
কৃপণের সতর্ক সম্বল ; সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো
ক্ষণিক গর্জন অন্তে ক্ষীণস্বরে তখনি জানায়
নিরাপদ নীরব নম্রতা। রাষ্ট্রপতি যত আছে
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ-নির্দেশ
রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ ওষ্ঠ-অধরের চাপে
সংশয়ে সংকোচে। এ দিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণীনদীপার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি,
আকাশেরে করিল অশুচি। মহাকালসিংহাসনে-
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা-'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন—
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্রকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।

শান্তিনিকেতন
২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৭

## নাগিনীরা চারি দিকে

নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

শান্তিনিকেতন
২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৭

## জন্মদিন

আজ মম জন্মদিন। সদ্যই প্রাণের প্রান্তপথে
ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির অন্ধকার হতে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে। মনে হতেছে, কী জানি,
পুরাতন বৎসরের গ্রন্থিবাঁধা জীর্ণ মালাখানি
সেথা গেছে ছিন্ন হয়ে; নবসূত্রে পড়ে আজি গাঁথা
নব জন্মদিন। জন্মোৎসবে এই-যে আসন পাতা
হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব টিকা
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে, নূতন অরুণলিখা
যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত।

আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে,
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারাসম—
এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা।

প্রাচীন অতীত, তুমি
নামাও তোমার অর্ঘ্য; অরূপ প্রাণের জন্মভূমি
উদয়শিখরে তার দেখো আদিজ্যোতি। করো মোরে
আশীর্বাদ, মিলাইয়া যাক তৃষাতপ্ত দিগন্তরে
মায়াবিনী মরীচিকা। ভরেছিনু আসক্তির ডালি

কাঙালের মতো ; অশুচি সঞ্চয়পাত্র করো খালি,
ভিক্ষামুষ্টি ধুলায় ফিরায়ে লও, যাত্রাতরী বেয়ে
পিছু ফিরে আর্ত চক্ষে যেন নাহি দেখি চেয়ে চেয়ে
জীবনভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে।

হে বসুধা,
নিত্য নিত্য বুঝায়ে দিতেছ মোরে— যে তৃষ্ণা, যে ক্ষুধা
তোমার সংসাররথে সহস্রের সাথে বাঁধি মোরে
টানায়েছে রাত্রিদিন স্থূল সূক্ষ্ম নানাবিধ ডোরে
নানা দিকে নানা পথে, আজ তার অর্থ গেল কমে
ছুটির গোধূলিবেলা তন্দ্রালু আলোকে। তাই ক্রমে
ফিরায়ে নিতেছ শক্তি, হে কৃপণা, চক্ষুকর্ণ থেকে
আড়াল করিছ স্বচ্ছ আলো ; দিনে দিনে টানিছে কে
নিষ্প্রভ নেপথ্যপানে। আমাতে তোমার প্রয়োজন
শিথিল হয়েছে, তাই মূল্য মোর করিছ হরণ,
দিতেছ ললাটপটে বর্জনের ছাপ। কিন্তু জানি,
তোমার অবজ্ঞা মোরে পারে না ফেলিতে দূরে টানি।
তব প্রয়োজন হতে অতিরিক্ত যে মানুষ, তারে
দিতে হবে চরম সম্মান তব শেষ নমস্কারে।
যদি মোরে পঙ্গু কর, যদি মোরে কর অন্ধপ্রায়,
যদি বা প্রচ্ছন্ন কর নিঃশক্তির প্রদোষচ্ছায়ায়,
বাঁধো বার্ধক্যের জালে, তবু ভাঙা মন্দিরবেদীতে
প্রতিমা অক্ষুণ্ণ রবে সগৌরবে ; তারে কেড়ে নিতে
শক্তি নাই তব।

ভাঙো ভাঙো, উচ্চ করো ভগ্নস্তূপ,
জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দস্বরূপ
রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে। সুধা তারে দিয়েছিল আনি
প্রতিদিন চতুর্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী ;
প্রত্যুত্তরে নানা ছন্দে গেয়েছে সে 'ভালোবাসিয়াছি'।
সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি
ছাড়ায়ে তোমার অধিকার। আমার সে ভালোবাসা
সব ক্ষয়ক্ষতিশেষে অবশিষ্ট রবে ; তার ভাষা
হয়তো হারাবে দীপ্তি অভ্যাসের ম্লানস্পর্শ লেগে,
তবু সে অমৃতরূপ সঙ্গে রবে যদি উঠি জেগে
মৃত্যুপরপারে। তারি অঙ্গে এঁকেছিল পত্রলিখা

আম্রমঞ্জরীর রেণু, এঁকেছে পেলব শেফালিকা
সুগন্ধি শিশিরকণিকায় ; তারি সূক্ষ্ম উত্তরীতে
গেঁথেছিল শিল্পকারু প্রভাতের দোয়েলের গীতে
চকিত কাকলিসূত্রে ; প্রিয়ার বিহ্বল স্পর্শখানি
সৃষ্টি করিয়াছে তার সর্ব দেহে রোমাঞ্চিত বাণী,
নিত্য তাহা রয়েছে সঞ্চিত। যেথা তব কর্মশালা
সেথা বাতায়ন হতে কে জানি পরায়ে দিত মালা
আমার ললাট ঘেরি সহসা ক্ষণিক অবকাশে,
সে নহে ভৃত্যের পুরস্কার ; কী ইঙ্গিতে কী আভাসে
মুহূর্তে জানায়ে চলে যেত অসীমের আত্মীয়তা
অধরা অদেখা দূত, বলে যেত ভাষাতীত কথা
অপ্রয়োজনের মানুষেরে।

সে মানুষ, হে ধরণী,
তোমার আশ্রয় ছেড়ে যাবে যবে, নিয়ো তুমি গনি
যা-কিছু দিয়েছ তারে, তোমার কর্মীর যত সাজ,
তোমার পথের যে পাথেয় ; তাহে সে পাবে না লাজ ;
রিক্ততায় দৈন্য নহে। তবু জেনো, অবজ্ঞা করি নি
তোমার মাটির দান, আমি সে মাটির কাছে ঋণী—
জানায়েছি বারংবার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে
অমূর্তের পেয়েছি সন্ধান। যবে আলোতে আলোতে
লীন হত জড়যবনিকা, পুষ্পে পুষ্পে তৃণে তৃণে
রূপে রসে সেই ক্ষণে যে গূঢ় রহস্য দিনে দিনে
হ'ত নিশ্বসিত, আজি মর্ত্যের অপর তীরে বুঝি
চলিতে ফিরানু মুখ তাহারি চরম অর্থ খুঁজি।

যবে শান্ত নিরাসক্ত গিয়েছি তোমার নিমন্ত্রণে
তোমার অমরাবতী সুপ্রসন্ন সেই শুভক্ষণে
মুক্তদ্বার ; বুভুক্ষুর লালসারে করে সে বঞ্চিত ;
তাহার মাটির পাত্রে যে অমৃত রয়েছে সঞ্চিত
নহে তাহা দীন ভিক্ষু লালায়িত লোলুপের লাগি।
ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে, হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান,
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে। ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,

মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তারা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি,
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।

শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব, 'এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের ;
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।'
বলে যাব, 'দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।'

বৃথা বাক্য থাক্। তব দেহলিতে, শুনি, ঘণ্টা বাজে
শেষপ্রহরের ঘণ্টা ; সেইসঙ্গে ক্লান্ত বক্ষোমাঝে
শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে
ধ্বনিতেছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পূরবীর সুরে।
জীবনের স্মৃতিদীপে আজিও দিতেছে যারা জ্যোতি
সেই ক'টি বাতি দিয়ে রচিব তোমার সন্ধ্যারতি
সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে ; দিনান্তের শেষ পলে
রবে মোর মৌনবীণা মূর্ছিয়া তোমার পদতলে।—
আর রবে পশ্চাতে আমার নাগকেশরের চারা
ফুল যার ধরে নাই, আর রবে খেয়াতরীহারা
এ পারের ভালোবাসা— বিরহস্মৃতির অভিমানে
ক্লান্ত হয়ে রাত্রিশেষে ফিরিবে সে পশ্চাতের পানে।

গৌরীপুর-ভবন। কালিম্পং
২৫ বৈশাখ ১৩৪৫

## ধ্বনি

জন্মেছিনু সূক্ষ্ম তারে বাঁধা মন নিয়া,
চারি দিক হতে শব্দ উঠিত ধ্বনিয়া
নানা কম্পে নানা সুরে
নাড়ীর জটিল জালে ঘুরে ঘুরে।
বালকের মনের অতলে দিত আনি
পাণ্ডুনীল আকাশের বাণী
চিলের সুতীক্ষ্ণ সুরে,
নির্জন দুপুরে,
রৌদ্রের প্লাবনে যবে চারি ধার
সময়েরে করে দিত একাকার
নিষ্কর্ম তন্দ্রার তলে।
ও পাড়ায় কুকুরের সুদূর কলহকোলাহলে
মনেরে জাগাত মোর অনির্দিষ্ট ভাবনার পারে
অস্পষ্ট সংসারে।
ফেরিওলাদের ডাক সূক্ষ্ম হয়ে কোথা যেত চলি,
যে-সকল অলিগলি
জানি নি কখনো
তারা যেন কোনো
বোগ্‌দাদের বসোরার
পরদেশী পসরার
স্বপ্ন এনে দিত বহি।
রহি রহি
রাস্তা হতে শোনা যেত সহিসের ডাক ঊর্ধ্বস্বরে,
অন্তরে অন্তরে
দিত সে ঘোষণা কোন্‌ অস্পষ্ট বার্তার,
অসম্পন্ন উধাও যাত্রার।
একঝাঁক পাতিহাঁস
টলোমলো গতি নিয়ে উচ্চকলভাষ
পুকুরে পড়িত ভেসে।
বটগাছ হতে বাঁকা রৌদ্ররশ্মি এসে
তাদের সাঁতারকাটা জলে
সবুজ ছায়ার তলে
চিকন সাপের মতো পাশে পাশে মিলি
খেলাত আলোর কিলিবিলি।

বেলা হলে
হলদে গামছা কাঁধে হাত দোলাইয়া যেত চলে
কোন্‌খানে কে যে।
ইস্কুলে উঠিত ঘণ্টা বেজে
সে ঘণ্টার ধ্বনি
নিরর্থ আহ্বানঘাতে কাঁপাইত আমার ধমনী।
রৌদ্রক্লান্ত ছুটির প্রহরে
আলস্যে-শিথিল শান্তি ঘরে ঘরে ;
দক্ষিণে গঙ্গার ঘাট থেকে
গম্ভীরমন্দ্রিত হাঁক হেঁকে
বাষ্পশ্বাসী সমুদ্রখেয়ার ডিঙা
বাজাইত শিঙা
রৌদ্রের প্রান্তর বহি
ছুটে যেত দিগন্তে শব্দের অশ্বারোহী।
বাতায়নকোণে
নির্বাসনে
যবে দিন যেত বয়ে
না-চেনা ভুবন হতে ভাষাহীন নানা ধ্বনি লয়ে
প্রহরে প্রহরে দূত ফিরে ফিরে
আমারে ফেলিত ঘিরে।
জনপূর্ণ জীবনের যে আবেগ পৃথ্বীনাট্যশালে
তালে ও বেতালে
করিত চরণপাত,
কভু অকস্মাৎ,
কভু মৃদুবেগে ধীরে,
ধ্বনিরূপে মোর শিরে
স্পর্শ দিয়ে চেতনারে জাগাইত ধোঁয়ালি চিন্তায়,
নিয়ে যেত সৃষ্টির আদিম ভূমিকায়।
চোখে-দেখা এ বিশ্বের গভীর সুদূরে
রূপের অদৃশ্য অন্তঃপুরে
ছন্দের মন্দিরে বসি রেখা-জাদুকর কাল
আকাশে আকাশে নিত্য প্রসারে বস্তুর ইন্দ্রজাল।
যুক্তি নয়, বুদ্ধি নয়,
শুধু যেথা কত কী যে হয়—
কেন হয় কিসে হয় সে প্রশ্নের কোনো
নাহি মেলে উত্তর কখনো।

যেথা আদিপিতামহী পড়ে বিশ্ব-পাঁচালির ছড়া
ইঙ্গিতের অনুপ্রাসে গড়া—
কেবল ধ্বনির ঘাতে বক্ষস্পন্দে দোলন দুলায়ে
মনেরে ভুলায়ে
নিয়ে যায় অস্তিত্বের ইন্দ্রজাল যেই কেন্দ্রস্থলে,
বোধের প্রত্যুষে যেথা বুদ্ধির প্রদীপ নাহি জ্বলে।

[ শান্তিনিকেতন ]
২১ অক্টোবর ১৯৩৮

## শ্যামা

উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ, গলায় পলার হারখানি।
চেয়েছি অবাক মানি
তার পানে।
বড়ো বড়ো কাজল নয়ানে
অসংকোচে ছিল চেয়ে
নবকৈশোরের মেয়ে,
ছিল তারি কাছাকাছি বয়স আমার।
স্পষ্ট মনে পড়ে ছবি। ঘরের দক্ষিণখোলা দ্বার,
সকালবেলার রোদে বাদামগাছের মাথা
ফিকে আকাশের নীলে মেলেছে চিকন ঘন পাতা।
একখানি সাদা শাড়ি কাঁচা কচি গায়ে,
কালো পাড় দেহ ঘিরে ঘুরিয়া পড়েছে তার পায়ে।
দুখানি সোনার চুড়ি নিটোল দু হাতে,
ছুটির মধ্যাহ্নে পড়া কাহিনীর পাতে
ওই মূর্তিখানি ছিল। ডেকেছে সে মোরে মাঝে মাঝে
বিধির খেয়াল যেথা নানাবিধ সাজে
রচে মরীচিকালোক নাগালের পারে
বালকের স্বপ্নের কিনারে।
দেহ ধরি মায়া
আমার শরীরে মনে ফেলিল অদৃশ্য ছায়া
সূক্ষ্মস্পর্শময়ী।
সাহস হল না কথা কই।
হৃদয় ব্যথিল মোর অতিমৃদুগুঞ্জরিত সুরে—
ও যে দূরে, ও যে বহুদূরে,

যত্ত দূরে শিরীষের ঊর্ধ্বশাখা, যেথা হতে ধীরে
ক্ষীণ গন্ধ নেমে আসে প্রাণের গভীরে।

একদিন পুতুলের বিয়ে,
পত্র গেল দিয়ে।
কলরব করেছিল হেসে খেলে
নিমন্ত্রিত-দল। আমি মুখচোরা ছেলে
এক পাশে সংকোচে পীড়িত। সন্ধ্যা গেল বৃথা--
পরিবেশনের ভাগে পেয়েছিনু মনে নেই কী তা।
দেখেছিনু দ্রুতগতি দুখানি পা আসে যায় ফিরে,
কালো পাড় নাচে তারে ঘিরে।
কটাক্ষে দেখেছি তার কাঁকনে নিরেট রোদ
দু হাতে পড়েছে যেন বাঁধা। অনুরোধ উপরোধ
শুনেছিনু তার স্নিগ্ধ স্বরে।
ফিরে এসে ঘরে
মনে বেজেছিল তারি প্রতিধ্বনি
অর্ধেক রজনী।

তার পরে একদিন
জানাশোনা হল বাধাহীন।
একদিন নিয়ে তার ডাকনাম
তারে ডাকিলাম।
একদিন ঘুচে গেল ভয়,
পরিহাসে পরিহাসে হল দোঁহে কথা-বিনিময়।
কখনো বা গড়ে-তোলা দোষ
ঘটায়েছে ছল-করা রোষ।
কখনো বা শ্লেষবাক্যে নিষ্ঠুর কৌতুক
হেনেছিল দুখ।
কখনো বা দিয়েছিল অপবাদ
অনবধানের অপরাধ।
কখনো দেখেছি তার অযত্নের সাজ—
রন্ধনে ছিল সে ব্যস্ত, পায় নাই লাজ—
পুরুষসুলভ মোর কত মূঢ়তারে
ধিক্কার দিয়েছে নিজ স্ত্রীবুদ্ধির তীব্র অহংকারে।
একদিন বলেছিল, 'জানি হাত দেখা।'
হাতে তুলে নিয়ে হাত নতশিরে গনেছিল রেখা—

বলেছিল, 'তোমার স্বভাব—
প্রেমের লক্ষণে দীন।' দিই নাই কোনোই জবাব।
পরশের সত্য পুরস্কার
খণ্ডিয়া দিয়েছে দোষ মিথ্যা সে নিন্দার।
তবু ঘুচিল না
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।
সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,
কাছে পেয়ে না-পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।

পুলকে বিষাদে মেশা দিন পরে দিন
পশ্চিমে দিগন্তে হয় লীন।
চৈত্রের আকাশতলে নীলিমার লাবণ্য ঘনাল,
আশ্বিনের আলো
বাজাল সোনার ধানে ছুটির সানাই।
চলেছে মন্থর তরী নিরুদ্দেশে স্বপ্নেতে বোঝাই।

[ শান্তিনিকেতন ] । ৩১ অক্টোবর ১৯৩৮

## প্রশ্ন

বাঁশবাগানের গলি দিয়ে মাঠে
চলতেছিলেম হাটে।
তুমি তখন আনতেছিলে জল,
পড়ল আমার ঝুড়ির থেকে
একটি রাঙা ফল।
হঠাৎ তোমার পায়ের কাছে
গড়িয়ে গেল ভুলে,
নিই নি ফিরে তুলে।
দিনের শেষে দিঘির ঘাটে
তুলতে এলে জল,
অন্ধকারে কুড়িয়ে তখন
নিলে কি সেই ফল।
এই প্রশ্নই গানে গেঁথে
একলা বসে গাই,
বলার কথা আর কিছু মোর নাই।

[ শান্তিনিকেতন ]। ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৮

## ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে

পাকুড়তলির মাঠে
বামুন-মারা দিঘির ঘাটে
আদিবিশ্ব-ঠাকুরমায়ের আস্‌মানি এক চেলা
ঠিক দুক্ষুর বেলা
বেগ্‌নি-সোনা দিক্‌-আঙিনার কোণে
বসে বসে ভুঁইজোড়া এক চাটাই বোনে
হলদে রঙের শুকনো ঘাসে।
সেখান থেকে ঝাপসা স্মৃতির কানে আসে
ঘুমলাগা রোদ্‌দুরে
ঝিম্‌ঝিমিনি সুরে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে,
সুন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাতদলের মেলে।'

সুদূর কালের দারুণ ছড়াটিকে
স্পষ্ট করে দেখি নে আজ, ছবিটা তার ফিকে।
মনের মধ্যে বেঁধে না তার ছুরি,
সময় তাহার ব্যথার মূল্য সব করেছে চুরি।
বিয়ের পথে ডাকাত এসে হরণ করলে মেয়ে,
এই বারতা ধুলোয়-পড়া শুকনো পাতার চেয়ে
উত্তাপহীন, ঝেঁটিয়ে-ফেলা আবর্জনার মতো।
দুঃসহ দিন দুঃখেতে বিক্ষত
এই কটা তার শব্দমাত্র দৈবে রইল বাকি,
আগুন-নেভা ছাইয়ের মতন ফাঁকি।
সেই মরা দিন কোন্‌ খবরের টানে
পড়ল এসে সজীব বর্তমানে।
তপ্ত হাওয়ার বাজপাখি আজ বারে বারে
ছোঁ মেরে যায় ছড়াটারে,
এলোমেলো ভাবনাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে
টুকরো করে ওড়ায় ধ্বনিটাকে।
জাগা মনের কোন্‌ কুয়াশা স্বপ্নেতে যায় ব্যেপে,
ধোঁয়াটে এক কম্বলেতে ঘুমকে ধরে চেপে,
রক্তে নাচে ছড়ার ছন্দে মিলে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।'

জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলেছে বাঁশতলায়,
ঢঙ্‌ঢঙিয়ে ঘন্টা দোলে গলায়।

বিকেলবেলার চিকন আলোর আভাস লেগে
ঘোলা রঙের আলস ভেঙে উঠি জেগে।
হঠাৎ দেখি বুকে বাজে টন্‌টনানি
পাঁজরগুলোর তলায় তলায় ব্যথা হানি।
চটকা ভাঙে যেন খোঁচা খেয়ে—
কই আমাদের পাড়ার কালো মেয়ে—
ঝুড়ি ভরে মুড়ি আনত, আনত পাকা জাম,
সামান্য তার দাম,
ঘরের গাছের আম আনত কাঁচামিঠা,
আনির স্থলে দিতেম তাকে চার-আনিটা।
ওই-যে অন্ধ কলু বুড়ির কান্না শুনি—
কদিন হল জানি নে কোন্ গোঁয়ার খুনি
সমথ তার নাতনিটিকে
কেড়ে নিয়ে ভেগেছে কোন্ দিকে।
আজ সকালে শোনা গেল চৌকিদারের মুখে,
যৌবন তার দ'লে গেছে, জীবন গেছে চুকে।
বুক-ফাটানো এমন খবর জড়ায়
সেই সেকালের সামান্য এক ছড়ায়।
শাস্ত্রমানা আস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে—
'উপায় নাই রে, নাই প্রতিকার' বাজে আকাশ জুড়ে।
অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার ছন্দে মিলে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।'

জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলেছে বাঁশতলায়,
ঢঙ্‌ঢঙিয়ে ঘন্টা দোলে গলায়।

শান্তিনিকেতন
২৮ মার্চ ১৯৩৯

## অত্যুক্তি

মন যে দরিদ্র, তার
তর্কের নৈপুণ্য আছে, ধনৈশ্বর্য নাইকো ভাষার।
কল্পনাভাণ্ডার হতে তাই করে ধার
বাক্য-অলংকার।
কখন হৃদয় হয় সহসা উতলা—
তখন সাজিয়ে বলা
আসে অগত্যাই ;
শুনে তাই
কেন তুমি হেসে ওঠ, আধুনিকা প্রিয়ে,
অত্যুক্তির অপবাদ দিয়ে।
তোমার সম্মানে ভাষা আপনারে করে সুসজ্জিত,
তারে তুমি বারে বারে পরিহাসে কোরো না লজ্জিত।
তোমার আরতি-অর্ঘ্যে অত্যুক্তিবঞ্চিত ভাষা হেয়,
অসত্যের মতো অশ্রদ্ধেয়।
নাই তার আলো,
তার চেয়ে মৌন ঢের ভালো।
তব অঙ্গে অত্যুক্তি কি কর না বহন
সন্ধ্যায় যখন
দেখা দিতে আসো।
তখন যে হাসি হাসো
সে তো নহে মিতব্যয়ী প্রত্যহের মতো—
অতিরিক্ত মধু কিছু তার মধ্যে থাকে তো সংহত।
সে হাসির অতিভাষা
মোর বাক্যে ধরা দেবে নাই সে প্রত্যাশা।
অলংকার যত পায় বাক্যগুলো তত হার মানে,
তাই তার অস্থিরতা বাড়াবাড়ি ঠেকে তব কানে।
কিন্তু, ওই আশমানি শাড়িখানি
ও কি নহে অত্যুক্তির বাণী।
তোমার দেহের সঙ্গে নীল গগনের
ব্যঞ্জনা মিলায়ে দেয়, সে যে কোন্ অসীম মনের
আপন ইঙ্গিত—
সে যে অঙ্গের সংগীত।
আমি তারে মনে জানি সত্যেরও অধিক।
সোহাগবাণীরে মোর হেসে কেন বলো কাল্পনিক।

পুরী। ৭ মে ১৯৩৯

## জন্মদিন

তোমরা রচিলে যারে
নানা অলংকারে
তারে তো চিনি নে আমি,
চেনেন না মোর অন্তর্যামী
তোমাদের স্বাক্ষরিত সেই মোর নামের প্রতিমা।
বিধাতার সৃষ্টিসীমা
তোমাদের দৃষ্টির বাহিরে।

কালসমুদ্রের তীরে
বিরলে রচেন মূর্তিখানি
বিচিত্রিত রহস্যের যবনিকা টানি
রূপকার আপন নিভৃতে।
বাহির হইতে
মিলায়ে আলোক অন্ধকার
কেহ এক দেখে তারে কেহ দেখে আর।
খণ্ড খণ্ড রূপ আর ছায়া,
আর কল্পনার মায়া,
আর মাঝে মাঝে শূন্য, এই নিয়ে পরিচয় গাঁথে
অপরিচয়ের ভূমিকাতে।
সংসারখেলার কক্ষে তাঁর
যে খেলেনা রচিলেন মূর্তিকার
মোরে লয়ে মাটিতে আলোতে,
সাদায় কালোতে,
কে না জানে সে ক্ষণভঙ্গুর
কালের চাকার নীচে নিঃশেষে ভাঙিয়া হবে চুর।
সে বহিয়া এনেছে যে দান
সে করে ক্ষণেকতরে অমরের ভান—
সহসা মুহূর্তে দেয় ফাঁকি,
মুঠি-কয় ধূলি রয় বাকি,
আর থাকে কালরাত্রি সব-চিহ্ন-ধুয়ে-মুছে-ফেলা।
তোমাদের জনতার খেলা
রচিল যে পুতুলিরে
সে কি লুব্ধ বিরাট ধূলিরে

এড়ায়ে আলোকে নিত্য রবে।
এ কথা কল্পনা কর যবে
তখন আমার
আপন গোপন রূপকার
হাসেন কি আঁখিকোণে,
সে কথাই ভাবি আজ মনে।

পুরী
২৫ বৈশাখ ১৩৪৬

## রোম্যান্‌টিক

আমারে বলে যে ওরা রোম্যান্‌টিক
সে কথা মানিয়া লই
রসতীর্থ-পথের পথিক।
মোর উত্তরীয়ে
রঙ লাগায়েছি, প্রিয়ে।
দুয়ার-বাহিরে তব আসি যবে
সুর করে ডাকি আমি ভোরের ভৈরবে।
বসন্তবনের গন্ধ আনি তুলে
রজনীগন্ধার ফুলে
নিভৃত হাওয়ায় তব ঘরে।
কবিতা শুনাই মৃদুস্বরে,
ছন্দ তাহে থাকে,
তার ফাঁকে ফাঁকে
শিল্প রচে বাক্যের গাঁথুনি—
তাই শুনি
নেশা লাগে তোমার হাসিতে।
আমার বাঁশিতে
যখন আলাপ করি মুলতান
মনের রহস্য নিজ রাগিণীর পায় যে সন্ধান।
যে কল্পলোকের কেন্দ্রে তোমারে বসাই
ধূলি-আবরণ তার সযত্নে খসাই—
আমি নিজে সৃষ্টি করি তারে।
ফাঁকি দিয়ে বিধাতারে
কারুশালা হতে তাঁর চুরি করে আনি রঙ-রস,

আনি তাঁরি জাদুর পরশ।
জানি, তার অনেকটা মায়া,
অনেকটা ছায়া।
আমারে শুধাও যবে 'এরে কভু বলে বাস্তবিক ?'
আমি বলি, 'কখনো না, আমি রোম্যান্‌টিক।'
যেথা ওই বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেথাকার দেনা
শোধ করি— সে নহে কথায় তাহা জানি—
তাহার আহ্বান আমি মানি।
দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমণী দস্যুভীতা—
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম ;
সেথায় নির্মম কর্ম ;
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরী বাজুক 'মাভৈঃ' ;
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।
সেথায় সুন্দর যেন ভৈরবের সাথে
চলে হাতে হাতে।

## রাত্রি

অভিভূত ধরণীর দীপ- নেভা তোরণদুয়ারে
আসে রাত্রি,
আধা অন্ধ, আধা বোবা,
বিরাট অস্পষ্ট মূর্তি,
যুগারম্ভসৃষ্টিশালে অসমাপ্তি পুঞ্জীভূত যেন
নিদ্রার মায়ায়।
হয় নি নিশ্চিত ভাগ সত্যের মিথ্যার,
ভালোমন্দ যাচাইয়ের তুলাদণ্ডে
বাটখারা ভুলের ওজনে।
কামনার যে পাত্রটি দিনে ছিল আলোয় লুকানো
আঁধার তাহারে টেনে আনে—
ভরে দেয় সুরা দিয়ে
রজনীগন্ধার গন্ধে,

ঝিমিঝিমি ঝিল্লির ঝননে,
আধ-দেখা কটাক্ষে ইঙ্গিতে।
ছায়া করে আনাগোনা সংশয়ের মুখোশ-পরানো,
মোহ আসে কালো মূর্তি লালরঙে এঁকে,
তপস্বীরে করে সে বিদ্রূপ।
বেড়াজাল হাতে নিয়ে সঞ্চরে আদিম মায়াবিনী
যবে গুপ্ত গুহা হতে গোধূলির ধূসর প্রান্তরে
দস্যু এসে দিবসের রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে যায়।

বিশ্বনাট্যে প্রথম অঙ্কের
অনিশ্চিত প্রকাশের যবনিকা
ছিন্ন করে এসেছিল দিন,
নির্বারিত করেছিল বিশ্বের চেতনা
আপনার নিঃসংশয় পরিচয়।
আবার সে আচ্ছাদন
মাঝে মাঝে নেমে আসে স্বপ্নের সংকেতে।
আবিল বুদ্ধির স্রোতে ক্ষণিকের মতো
মেতে ওঠে ফেনার নর্তন।
প্রবৃত্তির হালে বসে কর্ণধার করে
উদ্‌ভ্রান্ত চালনা তন্দ্রাবিষ্ট চোখে।
নিজেরে ধিক্কার দিয়ে মন বলে ওঠে,
'নহি নহি আমি নহি অপূর্ণ সৃষ্টির
সমুদ্রের পঙ্কলোকে অন্ধ তলচর
অর্ধস্ফুট শক্তি যার বিহ্বলতা-বিলাসী মাতাল
তরলে নিমগ্ন অনুক্ষণ।
আমি কর্তা, আমি মুক্ত, দিবসের আলোকে দীক্ষিত,
কঠিন মাটির 'পরে
প্রতি পদক্ষেপ যার
আপনারে জয় ক'রে চলা।'

পুনশ্চ। শান্তিনিকেতন
২৬ জুলাই ১৯৩৯

## উদ্‌বৃত্ত

তব দক্ষিণ হাতের পরশ
কর নি সমর্পণ।
লেখে আর মোছে তব আলো ছায়া
ভাবনার প্রাঙ্গণে
খনে খনে আলিপন।

বৈশাখে কৃশ নদী
পূর্ণ স্রোতের প্রসাদ না দিল যদি,
শুধু কুণ্ঠিত বিশীর্ণ ধারা
তীরের প্রান্তে
জাগাল পিয়াসি মন।

যতটুকু পাই ভীরু বাসনার
অঞ্জলিতে
নাই বা উচ্ছলিল,
সারা দিবসের দৈন্যের শেষে
সঞ্চয় সে যে
সারা জীবনের স্বপ্নের আয়োজন।

[ মংপু ]
৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

## আধোজাগা

রাত্রে কখন মনে হল যেন
ঘা দিলে আমার দ্বারে,
জানি নাই আমি জানি নাই, তুমি
স্বপ্নের পরপারে।
অচেতন মনোমাঝে
নিবিড় গহনে ঝিমিঝিমি ধ্বনি বাজে,
কাঁপিছে তখন বেণুবনবায়ু
ঝিল্লির ঝংকারে।

জাগি নাই আমি জাগি নাই গো,
আধোজাগরণ বহিছে তখন
মৃদুমন্থরধারে।

গভীর মন্দ্রস্বরে
কে করেছে পাঠ পথের মন্ত্র
মোর নির্জন ঘরে।
জাগি নাই আমি জাগি নাই, যবে
বনের গন্ধ রচিল ছন্দ
তন্দ্রার চারি ধারে।

[ জানুয়ারি ১৯৪০ ]

## দেওয়া-নেওয়া

বাদল দিনের প্রথম কদমফুল
আমায় করেছ দান,
আমি তো দিয়েছি ভরা শ্রাবণের
মেঘমল্লার গান।
সজল ছায়ার অন্ধকারে
ঢাকিয়া তারে
এনেছি সুরের শ্যামল খেতের
প্রথম সোনার ধান।

আজ এনে দিলে যাহা
হয়তো দিবে না কাল,
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল।

স্মৃতিবন্যার উছল প্লাবনে
আমার এ গান শ্রাবণে শ্রাবণে
ফিরিয়া ফিরিয়া বাহিবে তরণী
ভরি তব সম্মান।

[ শান্তিনিকেতন ]
১০ জানুয়ারি ১৯৪০

## নতুন রঙ

এ ধূসর জীবনের গোধূলি,
ক্ষীণ তার উদাসীন স্মৃতি,
মুছে-আসা সেই ম্লান ছবিতে
রঙ দেয় গুঞ্জনগীতি।

ফাগুনের চম্পকপরাগে
সেই রঙ জাগে,
ঘুমভাঙা কোকিলের কূজনে
সেই রঙ লাগে,
সেই রঙ পিয়ালের ছায়াতে
ঢেলে দেয় পূর্ণিমাতিথি।

এই ছবি ভৈরবী-আলাপে
দোলে মোর কম্পিত বক্ষে,
সেই ছবি সেতারের প্রলাপে
মরীচিকা এনে দেয় চক্ষে,
বুকের লালিম-রঙে রাঙানো
সেই ছবি স্বপ্নের অতিথি।

[ শান্তিনিকেতন ] ১৩ জানুয়ারি ১৯৪০

## আসা-যাওয়া

ভালোবাসা এসেছিল
এমন সে নিঃশব্দে চরণে
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে,
দিই নি আসন বসিবার।
বিদায় সে নিল যবে, খুলিতেই দ্বার
শব্দ তার পেয়ে,
ফিরায়ে ডাকিতে গেনু ধেয়ে।
তখন সে স্বপ্ন কায়াহীন,
নিশীথে বিলীন—
দূরপথে তার দীপশিখা
একটি রক্তিম মরীচিকা।

[ শান্তিনিকেতন ] ২৮ মার্চ ১৯৪০

## অসম্ভব

পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ যবে ভাবিনু মনে,
একা একা কোথা চলিতেছিলাম নিষ্কারণে।
শ্রাবণের মেঘ কালো হয়ে নামে বনের শিরে,
খর বিদ্যুৎ রাতের বক্ষ দিতেছে চিরে,
দূর হতে শুনি বারুণী নদীর তরল রব—
মন শুধু বলে অসম্ভব এ অসম্ভব।

এমনি রাত্রে কতবার মোর বাহুতে মাথা
শুনেছিল সে যে কবির ছন্দে কাজরি-গাথা।
রিমিঝিমি ঘন বর্ষণে বন রোমাঞ্চিত,
দেহে আর মনে এক হয়ে গেছে যে বাঞ্ছিত
এল সেই রাতি বহি শ্রাবণের সে বৈভব—
মন শুধু বলে অসম্ভব এ অসম্ভব।

দূরে চলে যাই নিবিড় রাতের অন্ধকারে,
আকাশের সুর বাজিছে শিরায় বৃষ্টিধারে।
যূথীবন হতে বাতাসেতে আসে সুধার স্বাদ,
বেণীবাঁধনের মালায় পেতেম যে সংবাদ
এই তো জেগেছে নবমালতীর সে সৌরভ—
মন শুধু বলে অসম্ভব এ অসম্ভব।

ভাবনার ভুলে কোথা চলে যাই অন্যমনে
পথসংকেত কত জানায়েছে যে বাতায়নে।
শুনিতে পেলেম সেতারে বাজিছে সুরের দান
অশ্রুজলের আভাসে জড়িত আমারি গান।
কবিরে ত্যজিয়া রেখেছ কবির এ গৌরব—
মন শুধু বলে অসম্ভব এ অসম্ভব।

শান্তিনিকেতন
১৬ জুলাই ১৯৪০

## আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে

মনে ভাবিতেছি যেন অসংখ্য ভাষার শব্দরাজি
ছাড়া পেল আজি,
দীর্ঘকাল ব্যাকরণদুর্গে বন্দী রহি
অকস্মাৎ হয়েছে বিদ্রোহী
অবিশ্রাম সারি সারি কুচকাওয়াজের পদক্ষেপে—
উঠেছে অধীর হয়ে ক্ষেপে।
লঙ্ঘিয়াছে বাক্যের শাসন,
নিয়েছে অবুদ্ধিলোকে অবদ্ধ ভাষণ,
ছিন্ন করি অর্থের শৃঙ্খলপাশ
সাধুসাহিত্যের প্রতি ব্যঙ্গহাস্যে হানে পরিহাস।
সব ছেড়ে অধিকার করে শুধু শ্রুতি—
বিচিত্র তাদের ভঙ্গি, বিচিত্র আকৃতি।
বলে তারা, আমরা যে এই ধরণীর
নিঃশ্বসিত পবনের আদিম ধ্বনির
জন্মেছি সন্তান,
যখনি মানবকণ্ঠে মনোহীন প্রাণ
নাড়ীর দোলায় সদ্য জেগেছে নাচিয়া
উঠেছি বাঁচিয়া।
শিশুকণ্ঠে আদিকাব্যে এনেছি উচ্ছলি
অস্তিত্বের প্রথম কাকলি।
গিরিশিরে যে পাগল-ঝোরা
শ্রাবণের দূত, তারি আত্মীয় আমরা
আসিয়াছি লোকালয়ে
সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র লয়ে।

মর্মরমুখর বেগে
যে ধ্বনির কলোৎসব অরণ্যের পল্লবে পল্লবে,
যে ধ্বনি দিগন্তে করে ঝড়ের ছন্দের পরিমাপ,
নিশান্তে জাগায় যাহা প্রভাতের প্রকাণ্ড প্রলাপ,
সে ধ্বনির ক্ষেত্র হতে হরিয়া করেছে পদানত
বন্য ঘোটকের মতো
মানুষ শব্দেরে তার জটিল নিয়মসূত্রজালে
বার্তাবহনের লাগি অনাগত দূর দেশে কালে।

বল্গাবদ্ধ শব্দ-অশ্বে চড়ি
মানুষ করেছে দ্রুত কালের মন্থর যত ঘড়ি।
জড়ের অচল বাধা তর্কবেগে করিয়া হরণ
অদৃশ্য রহস্যালোকে গহনে করেছে সঞ্চরণ,
ব্যূহে বাঁধি শব্দ-অক্ষৌহিণী
প্রতি ক্ষণে মূঢ়তার আক্রমণ লইতেছে জিনি।

কখনো চোরের মতো পশে ওরা স্বপ্নরাজ্যতলে,
ঘুমের ভাঁটার জলে
নাহি পায় বাধা—
যাহা-তাহা নিয়ে আসে, ছন্দের বাঁধনে পড়ে বাঁধা ;
তাই দিয়ে বুদ্ধি অন্যমনা
করে সেই শিল্পের রচনা
সূত্র যার অসংলগ্ন স্খলিত শিথিল
বিধির সৃষ্টির সাথে না রাখে একান্ত তার মিল
যেমন মাতিয়া উঠে দশ-বিশ কুকুরের ছানা,
এ ওর ঘাড়েতে চড়ে, কোনো উদ্দেশ্যের নাই মানা,
কে কাহারে লাগায় কামড়,
জাগায় ভীষণ শব্দে গর্জনের ঝড়,
সে কামড়ে সে গর্জনে কোনো অর্থ নাই হিংস্রতার,
উদ্দাম হইয়া উঠে শুধু ধ্বনি শুধু ভঙ্গি তার।

মনে মনে দেখিতেছি, সারা বেলা ধরি
দলে দলে শব্দ ছোটে অর্থ ছিন্ন করি—
আকাশে আকাশে যেন বাজে
আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে।

গৌরীপুর ভবন। কালিম্পঙ। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

## গহন রজনীমাঝে

গহন রজনীমাঝে
রোগীর আবিল দৃষ্টিতলে
যখন সহসা দেখি
তোমার জাগ্রত আবির্ভাব
মনে হয় যেন
আকাশে অগণ্য গ্রহতারা

অন্তহীন কালে
আমারি প্রাণের দায় করিছে স্বীকার।
তার পরে জানি যবে
তুমি চলে যাবে,
আতঙ্ক জাগায় অকস্মাৎ
উদাসীন জগতের ভীষণ স্তব্ধতা।

জোড়াসাঁকো
১২ নভেম্বর ১৯৪০। রাত্রি দুটো

## সকালে জাগিয়া উঠি

সকালে জাগিয়া উঠি
ফুলদানে দেখিনু গোলাপ ;
প্রশ্ন এল মনে—
যুগ-যুগান্তের আবর্তনে
সৌন্দর্যের পরিণামে যে শক্তি তোমারে আনিয়াছে
অপূর্ণের কুৎসিতের প্রতি পদে পীড়ন এড়ায়ে
সে কি অন্ধ, সে কি অন্যমনা,
সেও কি বৈরাগ্যব্রতী সন্ন্যাসীর মতো
সুন্দরে ও অসুন্দরে ভেদ নাহি করে—
শুধু জ্ঞানক্রিয়া, শুধু বলক্রিয়া তার,
বোধের নাইকো কোনো কাজ ?
কারা তর্ক করে বলে, সৃষ্টির সভায়
সুশ্রী কুশ্রী বসে আছে সমান আসনে—
প্রহরীর কোনো বাধা নাই।
আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে—
লক্ষকোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা,
ছন্দ নাহি ভাঙে তার, সুর নাহি বাধে,
বিকৃতি না ঘটায় স্খলন ;
ওই তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ।

উদয়ন। ২৪ নভেম্বর ১৯৪০। সকাল

## মধ্যদিনে আধো ঘুমে

মধ্যদিনে আধো ঘুমে আধো জাগরণে
বোধ করি স্বপ্নে দেখেছিনু—
আমার সত্তার আবরণ
খসে পড়ে গেল
অজানা নদীর স্রোতে
লয়ে মোর নাম মোর খ্যাতি,
কৃপণের সঞ্চয় যা-কিছু,
লয়ে কলঙ্কের স্মৃতি
মধুর ক্ষণের স্বাক্ষরিত ;
গৌরব ও অগৌরব
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যায়,
তারে আর পারি না ফিরাতে ;
মনে মনে তর্ক করি আমিশূন্য আমি.
যা-কিছু হারাল মোর
সবচেয়ে কার লাগি বাজিল বেদনা।
সে মোর অতীত নহে
যারে লয়ে সুখে দুঃখে কেটেছে আমার রাত্রিদিন।
সে আমার ভবিষ্যৎ
যারে কোনো কালে পাই নাই,
যার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা আমার
ভূমিগর্ভে বীজের মতন
অঙ্কুরিত আশা লয়ে
দীর্ঘরাত্রি স্বপ্ন দেখেছিল
অনাগত আলোকের লাগি।

উদয়ন
২৪ নভেম্বর ১৯৪০। বিকেল

## ধূসর গোধূলিলগ্নে

ধূসর গোধূলিলগ্নে সহসা দেখিনু একদিন—
মৃত্যুর দক্ষিণবাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা ;
চিনিলাম তখনি দোঁহারে।

দেখিলাম, নিতেছে যৌতুক
বরের চরম দান মরণের বধূ ;
দক্ষিণবাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে।

উদয়ন
৪ ডিসেম্বর ১৯৪০। সকাল

## অলস মনের আকাশেতে

অলস মনের আকাশেতে
প্রদোষ যখন নামে
কর্ম্মরথের ঘড়ঘড়ানি
যে-মুহূর্তে থামে
এলোমেলো ছিন্নচেতন
টুকরো কথার ঝাঁক
জানি নে কোন্ স্বপ্নরাজের
শুনতে যে পায় ডাক,
ছেড়ে আসে কোথা থেকে
দিনের বেলার গর্ত,
কারো আছে ভাবের আভাস
কারো বা নেই অর্থ,
ঘোলা মনের এই যে সৃষ্টি
আপন অনিয়মে
ঝিঁঝির ডাকে অকারণের
আসর তাহার জমে।
একটুখানি দীপের আলো
শিখা যখন কাঁপায়
চার দিকে তার হঠাৎ এসে
কথার ফড়িং ঝাঁপায়।

পষ্ট আলোর সৃষ্টিপানে
যখন চেয়ে দেখি
মনের মধ্যে সন্দেহ হয়
হঠাৎ মাতন এ কী।
বাইরে থেকে দেখি একটা
নিয়মঘেরা মানে,

ভিতরে তার রহস্য কী
কেউ তা নাহি জানে।
খেয়ালস্রোতের ধারায় কী সব
ডুবছে এবং ভাসছে,
ওরা কী যে দেয় না জবাব
কোথা থেকে আসছে।
আছে ওরা এই তো জানি
বাকিটা সব আঁধার,
চলছে খেলা একের সঙ্গে
আর-একটাকে বাঁধার।
বাঁধনটাকেই অর্থ বলি
বাঁধন ছিঁড়লে তারা
কেবল পাগল বস্তুর দল
শূন্যেতে দিক্‌হারা।

উদয়ন। ৫ জানুয়ারি ১৯৪১

## ঐকতান

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন ;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক—
রয়ে গেছে ফাঁক।

কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা একতান
কত-না নিস্তব্ধক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।
দুর্গম তুষারগিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়
আমার অন্তরে বার বার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার।
দক্ষিণমেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা
মহাজনশূন্যতায় দীর্ঘ রাত্রি করিতেছে সারা,
সে আমার অর্ধরাত্রে অনিমেষ চোখে
অনিদ্রা করেছে স্পর্শ অপূর্ব আলোকে।
সুদূরের মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝর
মনের গহনে মোর পাঠায়েছে স্বর।
প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে—
তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ,
সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ,
গীতভারতীর আমি পাই তো প্রসাদ
নিখিলের সংগীতের স্বাদ।

সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে,
তার পূর্ণ পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষী খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূরপ্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।

তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।
সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্যমূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।

এসো, কবি, অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার—
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারি ধার
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাও তো উদ্‌বারি।
সাহিত্যের ঐকতান-সংগীতসভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়—
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূর যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১৮ জানুয়ারি ১৯৪১। সকাল

## এ আমির আবরণ

এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক,
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।
সর্ব মানুষের মাঝে
এক চিরমানবের আনন্দকিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকীরিত।
সংসারের ক্ষুব্ধতার স্তব্ধ ঊর্ধ্বলোকে
নিত্যের যে শান্তিরূপ তাই যেন দেখে যেতে পারি;
জীবনের জটিল যা বহু নিরর্থক,
মিথ্যার বাহন যাহা সমাজের কৃত্রিম মূল্যেই,
তাই নিয়ে কাঙালের অশান্ত জনতা
দূরে ঠেলে দিয়ে
এ জন্মের সত্য অর্থ স্পষ্ট চোখে জেনে যাই যেন
সীমা তার পেরোবার আগে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১১ মাঘ ১৩৪৭। সন্ধ্যা

## ভালোবাসা এসেছিল

ভালোবাসা এসেছিল একদিন তরুণ বয়সে
নির্ঝরের প্রলাপকল্লোলে,
অজানা শিখর হতে
সহসা বিস্ময় বহি আনি,
ভ্রূভঙ্গিত পাষাণের নিশ্চল নির্দেশ
লঙ্ঘিয়া উচ্ছল পরিহাসে,
বাতাসেরে করি' ধৈর্যহারা,
পরিচয়ধারা-মাঝে তরঙ্গিয়া অপরিচয়ের
অভাবিত রহস্যের ভাষা,
চারি দিকে স্থির যাহা পরিমিত নিত্যপ্রত্যাশিত
তারি মধ্যে মুক্ত করি' ধাবমান বিদ্রোহের ধারা।

আজ সেই ভালোবাসা স্নিগ্ধ সান্ত্বনার স্তব্ধতায়
রয়েছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্ন গভীরে।
চারি দিকে নিখিলের বৃহৎ শান্তিতে
মিলেছে সে সহজ মিলনে—
তপস্বিনী রজনীর তারার আলোয় তার আলো,
পূজারত অরণ্যের পুষ্প-অর্ঘ্যে তাহার মাধুরী।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
৩০ জানুয়ারি ১৯৪১। দুপুর

## বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে

বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে
আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে
সূর্য তারা ল'য়ে
যুগযুগান্তের পরিমাপে।
অনাদি অদৃশ্য হতে আমিও এসেছি
ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নিয়ে
এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে।
প্রস্থানের অঙ্কে আজ এসেছি যেমনি
দীপশিখা ম্লান হয়ে এল,
ছায়াতে পড়িল ধরা এ খেলার মায়ার স্বরূপ,
শ্লথ হয়ে এল ধীরে
সুখ দুঃখ নাট্যসজ্জাগুলি।
দেখিলাম, যুগে যুগে নটনটী বহু শত শত
ফেলে গেছে নানারঙা বেশ তাহাদের
রঙ্গশালা-দ্বারের বাহিরে।
দেখিলাম চাহি
শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্য-প্রাঙ্গণে
নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১। বিকেল

## ওরা কাজ করে

অলস সময়ধারা বেয়ে
মন চলে শূন্যপানে চেয়ে।
সে মহাশূন্যের পথে ছায়া-আঁকা ছবি পড়ে চোখে।
কত কাল দলে দলে গেছে কত লোকে
সুদীর্ঘ অতীতে
জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে।
এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল,
এসেছে মোগল—
বিজয়রথের চাকা
উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয়পতাকা।
শূন্যপথে চাই,
আজ তার কোনো চিহ্ন নাই।
নির্মল সে নীলিমায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় রাঙাল
যুগে যুগে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের আলো।
আরবার সেই শূন্যতলে
আসিয়াছে দলে দলে
লৌহবাঁধা পথে
অনলনিশ্বাসী রথে
প্রবল ইংরেজ,
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।
জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ-বেড়া জাল;
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।

মাটির পৃথিবীপানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কলকলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগযুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল।

ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে—
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্রনদীর ঘাটে ঘাটে,
পঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।
গুরু গুরু গর্জন গুন্ গুন্ স্বর
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখসুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১। সকাল

## এ দ্যুলোক মধুময়

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি,
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে —
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।

শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১। সকাল

## ফুলদানি হতে একে একে

ফুলদানি হতে একে একে
আয়ুক্ষীণ গোলাপের পাপড়ি পড়িল ঝরে ঝরে।
ফুলের জগতে
মৃত্যুর বিকৃতি নাহি দেখি।
শেষ-ব্যঙ্গ নাহি হানে জীবনের পানে অসুন্দর।
যে মাটির কাছে ঋণী
আপনার ঘৃণা দিয়ে অশুচি করে না তারে ফুল,
রূপে গন্ধে ফিরে দেয় ম্লান অবশেষ।
বিদায়ের সকরুণ স্পর্শ আছে তাহে,
নাইকো ভর্ৎসনা ।
জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোঁহে যবে করে মুখোমুখি
দেখি যেন সে মিলনে
পূর্বাচলে অস্তাচলে
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টিবিনিময়—
সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত সুন্দর অবসান।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১। বিকেল

## রূপনারানের কূলে

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় ;
সত্য যে কঠিন.
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দিতে।

১৩-১৪ মে ১৯৪১
উদয়ন। শান্তিনিকেতন
রাত্রি ৩/১৫ মিনিট

## প্রথম দিনের সূর্য

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে,
কে তুমি—
মেলে নি উত্তর।

বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,
কে তুমি—
পেল না উত্তর।

জোড়াসাঁকো। ২৭ জুলাই ১৯৪১। সকাল

## দুঃখের আঁধার রাত্রি

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে ;
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত—
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।

যত বার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
তত বার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হার-জিত-খেলা— জীবনের মিথ্যা এ কুহক—
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা—
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

জোড়াসাঁকো
২৯ জুলাই ১৯৪১। বিকেল

## তোমার সৃষ্টির পথ

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত :
তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।

বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।

কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

জোড়াসাঁকো
৩০ জুলাই ১৯৪১। সকাল সাড়ে-নটা

# পাঠপ্রসঙ্গ

তারকার আত্মহত্যা। কবিতাটির বিষয়ে জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি অনুমাননির্ভর মন্তব্য[১] : 'তারকা হইতেছেন কাদম্বরী দেবী। এই কাদম্বরী দেবী তাঁহার শেষ জীবনাহুতি-দানের পূর্বে আর একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তারকার আত্মহত্যা কবিতার উৎস সেইখানে অনুসন্ধনীয়।' তবে এ-বিষয়ে কবির নিজস্ব বক্তব্য ছিল এইরকম[২] : 'দায়িত্বহীন কর্মহীন দিনগুলি। তখনও বিবাহ হয় নাই। গান আরম্ভ— কবিতা এখানেই লেখা। সেইরূপ বিনা-কষ্টের কষ্ট— অনির্দিষ্ট বেদনা, তারকার আত্মহত্যা। তখন বাংলা সাহিত্যে ঐরূপ ব্যক্তিগত একটা গভীর বেদনার ক্রন্দন ছিল। ইহার পূর্বে এই ভাব ও এই শ্রেণীর লিরিক প্রকাশ ছিল না। বলিব, ইহা সেই রকমের ভাব যাহা কেবল রাগিণী বা সুরেই বলা চলে। ইহা কোনো কথা বা ফ্যাক্টের বিবৃতি নহে। সন্ধ্যাসঙ্গীতের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে বোধহয় এই ভাবটি ছিল না। সন্ধ্যাসঙ্গীতের ক্যারেক্টারিস্টিক নোট : হৃদয়ের গীতধ্বনি।'

মরণ। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১২৯১) প্রকাশের আগে 'ছবি ও গান' (১২৯০) বইটিতে 'অভিসার' নামে এবং পরে চয়নিকা র প্রথম সংস্করণে (১৩১৬) 'মরণাধিক' নামে কবিতাটি ছাপা হয়েছিল। কবিতাটির পাঠও আছে অনেকরকম। এখানে ব্যবহার করা হয়েছে গীতবিতান -এর সংহত এবং সংক্ষেপিত পাঠটি।

এ-কবিতার 'জটাজুট' শব্দটি 'জটাজূট' বানানেই বিভিন্ন বইতে অনেকদিন ধরে ছাপা হচ্ছে। বিশেষ এই রচনাটিতে যথাযথ হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণের একটা গুরুত্ব আছে, ছন্দের দিক থেকে তাই 'জটাজুট' পাঠই গ্রাহ্য মনে হয়। কাব্যগ্রন্থাবলী, কাব্যগ্রন্থ বা বিশ্বভারতী-রচনাবলীর নজিরে এখানে 'জটাজুট'ই গৃহীত হল। গীতবিতান, সঞ্চয়িতা, পাঠান্তর-সংবলিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র-রচনাবলীতে আছে 'জটাজূট'।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। প্রথম প্রকাশের সময়ে কবিতাটির চেহারা ছিল অন্যরকম। দীর্ঘ সেই কবিতা দীর্ঘতর হয়ে ওঠে 'প্রভাতসংগীত' (১২৯০) বইতে। বিশ্বভারতী-রচনাবলী প্রকাশের সময়ে কমে যায় অনেক লাইন। হ্রস্বতম রূপ আছে সঞ্চয়িতায়। সেটিই এখানে নেওয়া হয়েছে, যদিও স্তবক বা পঙ্‌ক্তির বিন্যাস ঠিক সঞ্চয়িতা-অনুগামী নয়। জায়গা কমাবার জন্য সঞ্চয়িতায় অনেকসময়েই স্তবক/পঙ্‌ক্তির ধরন পালটে দেওয়া হয়েছে। এ-রকম কখনো কখনো আগেও ঘটেছে, কাব্যগ্রন্থাবলী বা কাব্যগ্রন্থ সংকলনের সময়ে। এই সংগ্রহের সর্বত্রই মূল বিন্যাস ব্যবহৃত।

পূর্ণিমায়। কবিতাটি প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'র (১৩১৯) 'কারোয়ার' অধ্যায়ে এই বর্ণনাংশ স্মরণীয় : 'সমুদ্রের মোহানার কাছে আসিয়া পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইল। সেইখানে নৌকা হইতে নামিয়া বালুতটের উপর দিয়া হাঁটিয়া বাড়ির দিকে চলিলাম। তখন নিশীথরাত্রি, সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, ঝাউবনের নিয়তমর্মরিত চাঞ্চল্য একেবারে থামিয়া গিয়াছে, সুদূরবিস্তৃত বালুকারাশির প্রান্তে তরুশ্রেণীর ছায়াপুঞ্জ নিস্পন্দ, দিক্‌চক্রবালে নীলাভ শৈলমালা পাণ্ডুরনীল আকাশতলে নিমগ্ন। এই উদার শুভ্রতা এবং নিবিড় স্তব্ধতার মধ্য দিয়া আমরা

কয়েকটি মানুষ কালো ছায়া ফেলিয়া নীরবে চলিতে লাগিলাম। বাড়িতে যখন পৌঁছিলাম তখন ঘুমের চেয়েও কোন্ গভীরতার মধ্যে আমার ঘুম ডুবিয়া গেল। সেই রাত্রেই যে-কবিতাটি লিখিয়াছিলাম তাহা সুদূর প্রবাসের সেই সমুদ্রতীরের একটি বিগত রজনীর সহিত বিজড়িত। সেই স্মৃতির সহিত তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাঠকদের কেমন লাগিবে সন্দেহ করিয়া মোহিতবাবুর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে ইহা ছাপানো হয় নাই।'

কারোয়ারের এই বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে গগনেন্দ্রনাথ যে ছবিটি এঁকেছিলেন 'জীবনস্মৃতি'র জন্য, কবিতার সঙ্গে সেটি রইল।

নিষ্ঠুর সৃষ্টি। আদি রূপে কবিতাটির নাম ছিল 'বিরহবিলাপ', মুদ্রিত পাণ্ডুলিপিতে তা দেখা যাবে। পাণ্ডুলিপিতেই কিছু অংশ কেটে দেওয়া আছে; তা ছাড়াও সূচনা আর শেষের এইসব স্তবক গ্রন্থে বর্জিত। সূচনায়:

কে এদের নিয়ে যায়, কে এদের কাছাকাছি আনে,
বাঁধা যদি নাহি পড়ে এত দৃঢ় কেন এই স্নেহ!
দূর হতে কেন টানে
ব্যথা কেন বাজে প্রাণে
কাঁদায়ে কি ফল তবে, কাঁদিলে ফেরে না যদি কেহ!

আর শেষ দুটি স্তবক ছিল:

হাসিতেছি কাঁদিতেছি প্রান্তে বসি এ বিশ্বজগতে—
সর্ব্বত্র রয়েছ তুমি পরিপূর্ণ গম্ভীর অপার!
তোমার আপন মতে
লয়ে চলিয়াছ পথে,
ভেদ করি সুখ দুঃখ, মিলন বিরহ অন্ধকার!
আমি কাঁদিতেছি বলে পথ হতে ফিরাবে না মোরে,
আমি মাগিতেছি বলে দিবে না আমার অমঙ্গল!
তাইত সাহস ক'রে
কাঁদি ও চরণ ধ'রে,
যাহা মনে আসে তাই বলে যাই হৃদয় দুর্ব্বল!

একাল ও সেকাল। উপান্ত্য পঙ্‌ক্তিতে 'সারাদিন সারাবেলা' (চয়নিকা, বিশ্বভারতী-রচনাবলী, ইন্ডিয়ান প্রেসের কাব্যগ্রন্থ) আর 'সারানিশি, সারাবেলা' (কাব্যগ্রন্থাবলী, কাব্যগ্রন্থ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রচনাবলী) দুরকম পাঠই পাওয়া যায়।

দুরন্ত আশা। কবিতাটির সূচনায় একটি বিকল্পপাঠ আছে কাব্যগ্রন্থ-সংস্করণে। 'মর্মে যবে মত্ত আশা সর্পসম ফোঁসে' লাইনটির জায়গায় সেখানে ছিল 'হৃদয়ে যবে বিকল আশা সাপের মত ফোঁসে'।

সুরদাসের প্রার্থনা। কাব্যগ্রন্থাবলী এবং কাব্যগ্রন্থ-সংস্করণে কবিতাটির নাম 'আঁখির অপরাধ'।

দুটি সংগ্রহেই কবিতার সূচনাংশ থেকে বেশ কয়েকটি লাইন বর্জিত। 'পবিত্র তুমি, নির্মল তুমি, তুমি দেবী, তুমি সতী,/কুৎসিত দীন অধম পামর পঙ্কিল আমি অতি' দিয়ে শুরু করেই এর পরবর্তী পঙ্‌ক্তি হিসেবে ছিল 'জান কি আমি এ পাপ-আঁখি মেলি' তোমারে দেখেছি চেয়ে'।

গুরু গোবিন্দ। ১২৯২ সালের শ্রাবণ মাসে 'বালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: '... সুসময়ের জন্য ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে, আয়োজন করিতে হইবে, বহুদিন অবিশ্রাম চিন্তা করিয়া মনে মনে সমস্ত সংকল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে, তবে যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যাহারা দুই দিনেই দেশের উপকার করিয়া সমস্ত চুকাইয়া দিতে চায়, যাহাদের ধৈর্য নাই, যাহারা অপেক্ষা করিতে জানে না, তাহাদের তড়িঘড়ি কাজ ও আড়ম্বর দেখিয়া লোকের চমক লাগিয়া যায়, কিন্তু তাহারা বড়ো লোক নহে, তাহাদের কাজ স্থায়ী হয় না। তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্যের জন্য সমস্ত জীবন দিতে চাহে না, জীবনের গোটাকতক দিন দিতে চাহে মাত্র, অথচ তাড়াতাড়ি বড়ো লোক বলিয়া খুব একটা প্রশংসা পাইতে চাহে। গোবিন্দ সেরূপ লোক ছিলেন না। তিনি প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া যমুনাতীরের ছোটো ছোটো পাহাড়ের মধ্যে বিজনে পারস্যভাষা-শিক্ষা ও শাস্ত্র-অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন ; বাঘ ও বন্য শূকর শিকার করিয়া এবং মনে মনে আপনার সংকল্প স্থির করিয়া অবসরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।'

এর প্রায় তিন বছর পর লেখা হল 'গুরু গোবিন্দ' কবিতাটি। 'মানসী' (১২৯৭) বই থেকে পরে এটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল 'কথা'য় (১৩০৬)। কাব্যগ্রন্থ এবং 'কথা' কাব্যে কবিতার শেষ স্তবকটি বর্জিত।

সোনার তরী। 'আর আছে ?— আর নাই' অংশটি প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, রেকর্ডের আবৃত্তিতে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই বলেন 'আরো আছে ?— আর নাই'।

নিদ্রিতা। কবিতাটির প্রথম স্তবক :

রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে,
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।
যেখানে যত মধুর মুখ আছে
বাকি তো কিছু রাখি নি দেখিবার।
কেহ বা ডেকে কয়েছে দুটো কথা,
কেহ বা চেয়ে করেছে আঁখি নত,
কাহারো হাসি ছুরির মতো কাটে
কাহারো হাসি আঁখিজলেরই মতো।
গরবে কেহ গিয়েছে নিজ ঘর,
কাঁদিয়া কেহ চেয়েছে ফিরে ফিরে।
কেহ বা কারে কহে নি কোনো কথা
কেহ বা গান গেয়েছে ধীরে ধীরে।

এমনি করে ফিরেছি দেশে দেশে ;
অনেক দূরে তেপান্তর-শেষে
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা,
তাহারি গলে এসেছি দিয়ে মালা।

কাব্যগ্রন্থ এবং সঞ্চয়িতার নজিরে, প্রথম এই স্তবকটি এখানেও বর্জিত হল।

'অরুণরাঙা আজি এ নিশিশেষে' লাইনটির 'অরুণরাঙা'ও সঞ্চয়িতা-পাঠ। পাণ্ডুলিপি এবং অন্যান্য মুদ্রণে এর বদলে আছে 'আমারি মতো'। কাব্যগ্রন্থ-সংস্করণে অবশ্য আরো চারটি লাইন ঈষৎ ভিন্নভাবে ছিল। যেমন : 'একদা রাতে নবীন মধুমাসে / স্বপন হতে উঠিনু চমকিয়া' বা 'নয়ন মেলি পূর্বপানে চেয়ে' বা 'দুগ্ধফেনশয্যা করি আলা'।

সুপ্তোত্থিতা। কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সময়ে ছাপা হয়েছিল 'নিদ্রোত্থিতা' নামে। 'খসিয়া-পড়া আঁচলখানি বক্ষে তুলি দিল' লাইনটিতে সঞ্চয়িতায় আছে 'তুলি নিল'।

হিংটিংছট। 'সাহিত্য' পত্রিকায় (ফাল্গুন ১২৯৯) নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রশ্ন তুলেছিলেন : 'এই ব্যঙ্গপূর্ণ রচনার লক্ষ্য কে ?' তাঁর উত্তর ছিল : 'এই বিদ্রূপ ও ঘৃণাপূর্ণ কবিতার লক্ষ্য চন্দ্রনাথবাবু।' ঐ পত্রিকারই (বৈশাখ ১৩০০) 'রবীন্দ্র বাবুর পত্র' লেখাটিতে ছাপা হয় কবির কৈফিয়ৎ। চন্দ্রনাথ বসুকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন, 'ইহা কাহারও সরল অথবা অসরল কোন প্রকার বুদ্ধিতে কখনো উদয় হইতে পারে তাহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।'

'পাখির মতন রাজা করে ঝট্‌পট্‌' লাইনটি অনেক মুদ্রণে (যেমন, ইন্ডিয়ান প্রেসের কাব্যগ্রন্থ বা বিশ্বভারতী-রচনাবলী) আছে 'ছট্‌ফট্‌', কিন্তু পাণ্ডুলিপি বা চয়নিকা-সঞ্চয়িতা সর্বত্রই 'ঝট্‌পট্‌'।

বৈষ্ণব কবিতা। কাব্যগ্রন্থ এবং পুরোনো চয়নিকার পাঠ এখানে নেওয়া হল। গৃহীত পাঠের পর মূল কবিতায় আরো এই অংশটুকু আছে :

বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্যপথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয়গৃহতরে
যথাসাধ্য যে যাহার ; যুগে যুগান্তরে
চিরদিন পৃথিবীতে যুবকযুবতী
নরনারী এমনি চঞ্চল মতিগতি।
দুই পক্ষে মিলে একেবারে আত্মহারা
অবোধ অজ্ঞান। সৌন্দর্যের দস্যু তারা
লুটেপুটে নিতে চায় সব। এত গীতি
এত ছন্দ, এত ভাবে উচ্ছ্বাসিত প্রীতি,

এত মধুরতা দ্বারের সম্মুখ দিয়া
বহে যায়— তাই তারা পড়েছে আসিয়া
সবে মিলি কলরবে সেই সুধাস্রোতে।
সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হতে
কলস ভরিয়া তারা লয়ে যায় তীরে
বিচার না করি কিছু, আপন কুটিরে
আপনার তরে। তুমি মিছে ধর দোষ,
হে সাধু পণ্ডিত, মিছে করিতেছ রোষ।
যাঁর ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে
অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন বসে।

যেতে নাহি দিব। 'সোনার তরী'র প্রথম-দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০০/১৩০১) আর ইন্ডিয়ান প্রেসের কাব্যগ্রন্থে 'চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই' লাইনটিতে 'চিরজীবী'র পরিবর্তে আছে 'চিরঞ্জীবী'। কাব্যগ্রন্থ-সংস্করণে অবশ্য এই লাইনটি এবং মধ্যবর্তী আরো প্রায় ষাট লাইন বর্জিত।

বিদায়-অভিশাপ। রচনাটির সূচনায় একটি গদ্যভূমিকাংশ এইরকম : 'দেবগণকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বৃহস্পতিপুত্র কচ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত তৎসমীপে গমন করেন। সেখানে সহস্র বৎসর অতিবাহন করিয়া এবং নৃত্য গীত বাদ্য দ্বারা শুক্রদুহিতা দেবযানীর মনোরঞ্জনপূর্বক সিদ্ধকাম হইয়া কচ দেবলোকে প্রত্যাগমন করেন। দেবাযানীর নিকট হইতে বিদায়কালীন ব্যাপার| পরে| বিবৃত হইল।'

রচনাটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি আলোচনা পাই ক্ষিতিমোহন সেনের সূত্রে[৩] : 'মনে আছে, ১৮ই বৈশাখ, সোমবার, "বিদায়-অভিশাপ" আলোচনা-প্রসঙ্গে কবি পুরুষ-প্রকৃতির কথা পাড়িলেন। তিনি বলিলেন, "পুরুষ অর্থাৎ আত্মা সদাই অগ্রসর হয়ে চলতে চায়। প্রকৃতি বা নারী চায় তাকে বেঁধে রাখতে। সৌন্দর্য, সেবা প্রভৃতি সবই হোলো প্রকৃতির অনুনয়েরই লীলাময় নানা রূপ। কিন্তু পুরুষকে যে যুগ-যুগান্তর বেয়ে লোক-লোকান্তর পার হয়ে ক্রমাগতই এগিয়ে চলতেই হবে। তাই এমন সাগ্রহ অনুনয় সত্ত্বেও পথে সে কোথাও থেমে যেতে অক্ষম। তাই সর্বচরাচরময় পুরুষের এই 'যাই-যাই' বিদায়-বাণী নিরন্তর ধ্বনিত। আর নিখিল চরাচরে ক্রমাগত চলেচে প্রকৃতির 'থাকো থাকো' বলে বেদনা-ভরা কাতর অনুনয়। প্রকৃতির এই সবেদন অনুনয়-বাণীরই নিবেদন সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্যে সর্বত্র ধ্বনিত হচ্চে। বিশ্বজগৎ এই বেদনাতেই করুণ।... 'কচ ও দেবযানী'তে প্রণয়িনীরূপে প্রকৃতির এই বেদনা-বাণী, 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় কন্যা ও নিঃশব্দ গৃহলক্ষ্মীরূপে প্রকৃতির এই ব্যথা। 'কর্ণকুন্তীসংবাদে' মাতৃরূপে এই আহ্বানই ফুটে উঠেচে।" ... '

এও লক্ষণীয় যে, 'কবির এই কথায় সত্যেন্দ্র দত্ত, অজিতকুমার ও সুকুমার রায় কবির সঙ্গে অনেক তর্ক করিলেন।'

এবার ফিরাও মোরে। সঞ্চয়িতার 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে শ্রীকানাই সামন্ত আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, 'সাধনা' পত্রিকায় ছাপা হবার সময়ে (চৈত্র ১৩০০) 'মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে' লাইনটিতে 'বিষণ্ণ'র পরিবর্তে শব্দটি ছিল 'নিষণ্ণ'। পাঠক ভেবে দেখতে পারেন সেই পাঠটিই সংগততর কি না।

প্রসঙ্গত, 'সোনার তরী' কাব্যের 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটির একটি লাইনও (এই সংকলনে ৭১ পৃষ্ঠার প্রথম লাইন) লক্ষ করবার মতো।

সিন্ধুপারে। আলোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন[৪]: 'ছেলেবেলা ১৬/১৭ বছর বয়সে আমেদাবাদে শাহীবাগের বাদশাহী বাড়ীতে কিছুদিন ছিলাম। সেই বাড়ীতে কত পাষাণমূর্তি, কত শিলা-শিল্প! তখন তা নিয়ে কিছুই করি নি। বহুকাল পরে সেগুলি দেখা দিল ক্ষুধিত পাষাণ গল্পে ও সিন্ধুপারে কবিতায়।'

দুঃসময়। রচনাটির সময় হিসেবে যে ১৫ বৈশাখের উল্লেখ আছে, সে কেবল এর সূচনাকাল। 'স্বর্গপথে' নামে ঐদিন কবিতাটির একটি খসড়া করেন কবি, বহুল পরিবর্তনের পরে এর থেকে কোনো-এক সময়ে গড়ে ওঠে 'দুঃসময়' (১৩০৪) আর 'অসময়' (১৩০৬) নামে দূরবর্তী দুটি লেখা। পাণ্ডুলিপির তৃতীয় আর চতুর্থ দুটি স্তবকই দুটুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে 'কল্পনা'র এই ভিন্ন দুটি কবিতায়।

মদনভস্মের পর। পর পর দুদিনে লেখা 'মদনভস্মের পূর্বে' আর 'মদনভস্মের পর' কবিতাদুটির প্রথমটি এই সংকলনে নেই। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে কাব্যগ্রন্থ-সংস্করণে (১৩১০) রচনাদুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে 'যৌবন-স্বপ্ন' আর 'প্রেম' এই দুই ভিন্ন অংশে।

দেবতার গ্রাস। রচনার পর থেকে দীর্ঘকাল দেখা যায় 'আপনার রুদ্রনৃত্যে দেয় করতালি / লক্ষ লক্ষ হাতে'র পর প্রত্যাশিত কোনো মিলান্তক অংশ নেই। অনেক পরে এখানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে 'আকাশেরে দেয় গালি/ ফেনিল আক্রোশে।'

গান্ধারীর আবেদন। একই ভাবে,

যত দণ্ড দিলে তুমি যত দোষীজনে
ফিরিয়া লাগিবে আসি দণ্ডদাতা ভূপে—
ন্যায়ের বিচার তব নির্মমতা রূপে
পাপ হয়ে তোমারে দাগিবে।....

অংশটিতে (দ্র ইন্ডিয়ান প্রেসের কাব্যগ্রন্থ বা সঞ্চয়িতা) পরে একটি নূতন লাইন জুড়ে দেওয়া হয়েছে মিলের প্রয়োজনে:

যত দণ্ড দিলে তুমি যত দোষীজনে
ধর্মাধিপ নামে, কর্তব্যের প্রবর্তনে,

দ্বিতীয় এই পাঠটি আছে বিশ্বভারতীর এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রচনাবলীতে। এই অতিরিক্ত পাঠটি সঞ্চয়িতায় নেই।

কর্ণকুন্তীসংবাদ। এই কবিতাতেও আছে অনুরূপ একটি যোজিত পঙক্তি। কর্ণের শেষ সংলাপে

এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
জয়হীন চেষ্টার সংগীত, আশাহীন
কর্মের উদ্যম— হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম।

এর মিলছুট তৃতীয় লাইনটির পর 'চরম বিশ্বাস-ক্ষীণ ব্যর্থতায় লীন' লাইনটি কবি লিখে দেন সঞ্চয়িতার প্রথম প্রকাশের সময়ে। তার পর থেকে কোনো মুদ্রণে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে, কোনোটিতে হচ্ছে না। সঞ্চয়িতায় আছে, বিশ্বভারতী রচনাবলীতে নেই, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রচনাবলীতে আছে। স্মরণীয় যে 'কাহিনী'-সংবলিত বিশ্বভারতী রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ড ছাপা হয়েছিল কবির জীবনকালেই, ১৩৪৭ সালের অগ্রহায়ণে।

কৃষ্ণকলি। 'আমিই জানি আর জানে সে মেয়ে' পাঠই আছে বিশ্বভারতী আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রচনাবলীতে। কিন্তু চয়নিকা, সঞ্চয়িতা, গীতবিতান -এর পাঠ 'সেই মেয়ে'। পাণ্ডুলিপিতে 'সেই মেয়ে' লিখে 'ই'টা কেটে দেওয়া আছে; কিন্তু কবিকণ্ঠের আবৃত্তিতে শুনি 'সেই মেয়ে'।

তোমার ইঙ্গিতখানি। এই কবিতা থেকে শুরু করে 'পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত' পর্যন্ত 'নৈবেদ্য'র (১৩০৮) কালাঙ্কহীন রচনাগুলি প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা এই চিঠির টুকরোটি (৫ অগ্রহায়ণ ১৩০৭) লক্ষণীয়[৫]: 'আমি আজকাল নানা গোলমালের মধ্যে "নৈবেদ্য" বলে এক একটি কবিতা প্রত্যহ আমার কোন এক অবসরে লিখে ফেলে আমার অন্তর্য্যামীকে নিবেদন করে দিই।' কিংবা, মৃণালিনী দেবীকে লেখা (২ পৌষ ১৩০৭)[৬] 'সকালে নাবার ঘরে দুটো নৈবেদ্য লিখ্‌তে পেরেছিলুম।'

শতাব্দীর সূর্য আজি। 'বিরোধমূলক আদর্শ' (আশ্বিন ১৩০৮) নামে প্রায় সমকালীন একটি গদ্যরচনার অংশ[৭]: 'সম্প্রতি উত্তরোত্তর ব্যাপ্যমান মিলিটারিত্বের রক্তিমায় য়ুরোপের গণ্ডস্থল যে টক্‌টকে হইয়া উঠিতেছে, সে কি স্বাস্থ্যের লক্ষণ? তাহার ন্যাশনালত্বের ব্যাধি অতিমেদস্ফীতির ন্যায় তাহার হৃদয়কে, তাহার মর্মস্থানকে, তাহার ধর্মনীতিকে আক্রমণ করিতেছে, ইহা কি আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি না?...

'স্বার্থের আদর্শ, বিরোধের আদর্শ যতই দৃঢ়, যতই উচ্চ, যতই রন্ধ্রহীন হইয়া ধর্মের গতিকে বাধা দিতে থাকে ততই তাহার বিনাশ আসন্ন হইয়া আসে। য়ুরোপের নেশনতন্ত্রে এই স্বার্থ বিরোধ ও বিদ্বেষের প্রাচীর প্রতিদিনই কঠিন ও উন্নত হইয়া উঠিতেছে।'

প্রেম এসেছিল। 'প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি দ্বার' ধরনের কথা অনেকদিন পর কীভাবে একাধিক বার ফিরে এসেছিল, জীবনপ্রান্তের এই দুটি রচনার সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখা যায়: 'ভালোবাসা এসেছিল এমন সে নিঃশব্দ চরণে' (আসা-যাওয়া, 'সানাই') আর 'ভালোবাসা এসেছিল একদিন তরুণ বয়সে' (১৩, 'আরোগ্য')। দুটিই এই সংকলনভুক্ত।

ভালো তুমি বেসেছিলে। এই কবিতার 'আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছ রাখি' বা 'আমার তারায় তব

মুগ্ধদৃষ্টি রাখি' লাইনগুলির সঙ্গে ভিন্নপ্রসঙ্গে লেখা 'ছবি' কবিতার কোনো-কোনো লাইন তুলনীয় হতে পারে।

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি। এই লেখাটি থেকে শুরু করে 'শিশুলীলা' পর্যন্ত কবিতাগুলি মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের (১৩১০) বিভিন্ন বিভাগে প্রবেশক হিসেবে মুদ্রিত ছিল: 'যৌবনস্বপ্ন' বিভাগে 'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি', 'বিশ্ব' বিভাগে 'আমি চঞ্চল হে', 'লীলা'য় 'তোমারে পাছে সহজে বুঝি', 'কণিকা'র সূচনায় 'হায়, গগন নহিলে', 'রূপক'-ভাগে 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে' এবং 'শিশু'র প্রবেশক হিসেবে 'শিশুলীলা'। শেষটি ছাড়া বাকি কবিতাগুলি পরে 'উৎসর্গ' কাব্যের (১৩২১) অন্তর্গত হয়।

শেষ খেয়া। এ-কবিতার কয়েকটি লাইন এক-এক সংস্করণে এক-এক রকম। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রথম লাইনটি এই সংকলনে গৃহীত।

১· নামিয়ে মুখ চুকিয়ে সুখ যাবার মুখে যায় যারা (চয়নিকা, বিশ্বভারতী-রচনাবলী)
নামায়ে মুখ চুকায়ে সুখ যাবার মুখে যায় যারা (ইন্ডিয়ান প্রেসের কাব্যগ্রন্থ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রচনাবলী)

২· ফুলের বাহার নাইকো যাহার ফসল যাহার ফলল না (চয়নিকা, ইন্ডিয়ান প্রেস কাব্যগ্রন্থ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রচনাবলী)
ফুলের বার নাইকো আর ফসল যার ফলল না (বিশ্বভারতী-রচনাবলী)

৩· অশ্রু যাহার ফেলতে হাসি পায় (চয়নিকা, ইন্ডিয়ান প্রেস কাব্যগ্রন্থ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রচনাবলী)
চোখের জল ফেলতে হাসি পায় (বিশ্বভারতী-রচনাবলী)

ত্যাগ। 'ঘোমটা খসায়ে বাতায়নে থেকে' (চয়নিকা, বিশ্বভারতী-রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রচনাবলী) লাইনটিতে সঞ্চয়িতা অনুযায়ী 'বাতায়ন থেকে'।

আগমন। 'আমার ধর্ম' (আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪) প্রবন্ধে কবিতাটি বিষয়ে একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য আছে[৮]: '...যে মহারাজ এলেন তিনি কে? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ করে শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ মনে করে নি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জনের মতো ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে, তিনি আসছেন, পাছে তাদের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল— এলেন রাজা।'

ভারততীর্থ। এই কবিতার দুটি শব্দ নিয়ে মুদ্রণসমস্যা আছে।

১· পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার (পাণ্ডুলিপি, বিশ্বভারতী-রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রচনাবলী)
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার (চয়নিকা, ইন্ডিয়ান প্রেসের কাব্যগ্রন্থ, সঞ্চয়িতা)

২· যজ্ঞশালায় খোলা আজি দ্বার (পাণ্ডুলিপি, চয়নিকা, ইন্ডিয়ান প্রেসের কাব্যগ্রন্থ, বিশ্বভারতী-রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রচনাবলী)
যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার (সঞ্চয়িতা)

এই সংগ্রহে গৃহীত হল 'পশ্চিম' এবং 'যজ্ঞশালায়'।

ছবি। কবিতাটির রচনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের কথা জানিয়েছেন ক্ষিতিমোহন সেন[৯] :
'বুদ্ধগয়া হতে সঙ্গীদের বিদায় দিয়ে চারুকে (বন্দ্যোপাধ্যায়) নিয়ে এলাম এলাহাবাদে। ভাগ্নে সত্যপ্রকাশের জামাতা শ্রীমান প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে রয়েচি। এইখানে একটি ছবি দেখে আমার মন মহাযুদ্ধ ও বিশ্বসমস্যার পথ হতে মুক্তি পেয়ে নূতন পথ ধরলো। ছবি কবিতায় আমার নিজের মনের বেদনার প্রকাশ।'

এই 'একটি ছবি' প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন পাদটীকায় লিখেছেন : 'তাঁরই পরলোকগতা পত্নীর ছবি'। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী বেশ নির্ভরযোগ্য ভাবেই জানাচ্ছেন[১০] : I had once asked Gurudev directly as to whether the poem "Chhabi" in Balaka was inspired by Mrinalini Devi's portrait. He replied. "No. The poem was addressed to Notun Bouthan's photograph."

ঝড়ের খেয়া। কবিতাটির মধ্যবর্তী এক অংশে

কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন,
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন,

এইভাবেই ছাপা হচ্ছে অনেকদিন ধরে। দুটি ভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে কিন্তু আছে 'শিরে নিয়ে'। 'বলাকা' প্রথম সংস্করণ (১৩২৩) এবং ইন্ডিয়ান প্রেসের কাব্যগ্রন্থ-সংস্করণেও তা-ই।

সন্ধ্যা ও প্রভাত। 'লিপিকা' (১৩২৯) থেকে গৃহীত তিনটি রচনা প্রসঙ্গে 'পুনশ্চ' কাব্যের এই ভূমিকাংশ স্মরণীয় : 'গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম। তিনি স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু চেষ্টা করেন নি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি, বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।'

এই উদ্‌ধৃতির উপান্ত্য বাক্যে 'অল্প কয়েকটি' কথাটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি', তবে 'লিপিকা'র প্রথম সংস্করণে কখনো-কখনো বাক্যের মধ্যে কিছুটা ফাঁক দেখানো হয়েছিল।

'সন্ধ্যা ও প্রভাত' কবিতাটির সঙ্গে 'পুষ্পাঞ্জলি' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি অগ্রন্থিত পুরোনো গদ্যরচনার (বৈশাখ ১২৯২) অংশবিশেষ মিলিয়ে পড়বার যোগ্য :

'সূর্যদেব, তুমি কোন্ দেশ অন্ধকার করিয়া এখানে উদিত হইলে? কোন্‌খানে সন্ধ্যা হইল? এদিকে তুমি জুঁইফুলগুলি ফুটাইলে, কোন্‌খানে রজনীগন্ধা ফুটিতেছে? প্রভাতের কোন্ পরপারে সন্ধ্যার মেঘের ছায়া অতি কোমল লাবণ্যে গাছগুলির উপরে পড়িয়াছে! এখানে আমাদিগকে জাগাইতে আসিয়াছ, সেখানে কাহাদিগকে ঘুম পাড়াইয়া আসিলে? সেখানকার বালিকারা ঘরে দীপ জ্বালাইয়া ঘরের দুয়ারটি খুলিয়া সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া কি তাহাদের পিতার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।...'

সতেরো বছর। ওই একই 'পুষ্পাঞ্জলি'র এই অংশটি তুলনীয়: 'যে আমাকে সে জানিত সে সেই সতেরো বৎসরের খেলাধুলা, সতেরো বৎসরের সুখ দুঃখ, সতেরো বৎসরের বসন্ত বর্ষা। সে আমাকে যখন ডাকিত তখন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অধিকাংশই, আমার এই সতেরো বৎসর তাহার সমস্ত খেলাধুলা লইয়া তাহাকে সাড়া দিত। ইহাকে সে ছাড়া আর-কেহ জানিত না, জানে না। সে চলিয়া গেছে, এখন আর ইহাকে কেহ ডাকে না, এ আর-কাহারো ডাকে সাড়া দেয় না! তাঁহার সেই বিশেষ কণ্ঠস্বর, তাহার সেই অতি পরিচিত সুমধুর স্নেহের আহ্বান ছাড়া জগতে এ আর-কিছুই চেনে না।

…আমি কেবল ভাবিতেছি, এমন তো আরো সতেরো বৎসর যাইতে পারে! আবার তো কত নূতন ঘটনা ঘটিবে, কিন্তু তাহার সহিত তাঁহার তো কোনো সম্পর্কই থাকিবে না! …'

তপোভঙ্গ। 'হাতে দিল মঞ্জিরা বাঁশরি' অংশটির 'মঞ্জিরা' বা 'মঞ্জীরা' কোনো-কোনো মুদ্রণে আছে 'মন্দিবা' (চয়নিকা, শতবার্ষিক রচনাবলী)।

সাবিত্রী। পশ্চিমগামী হারুনা-মারু জাহাজে বসে ২৫ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ডায়ারিতে লিখছিলেন[১১]: 'সূর্যের উদয়াস্ত আজও বাদলার ছায়ায় ঢাকা পড়ে রইল। মেঘের থলিটার মধ্যে কৃপণ আকাশ তার সমস্ত সোনার আলো এঁটে বন্ধ করে রেখেছে।' আর তার পরদিন: 'আচ্ছন্ন সূর্যের আলোয় আমার চৈতন্যের স্রোতস্বিনীতে যেন ভাঁটা পড়ে গেছে। জোয়ার আসবে রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে।' একটু পরে আবার: 'এই বাদলার অন্ধকারে আজ আমার মধ্যে যে ছায়াচ্ছন্ন বিষাদ সে ওই ব্যাকুলতারই একটি রূপ। সেও বলছে, হে পূষন্, তোমার ওই ঢাকা খুলে ফেলো, তোমার জ্যোতির মধ্যে আমার আত্মাকে উজ্জ্বল দেখি। অবসাদ দূর হোক। আমার চিত্তের বাঁশিতে তোমার আলোকের নিশ্বাস পূর্ণ করো— সমস্ত আকাশ আনন্দের গানে জাগ্রত হয়ে উঠুক। আমার প্রাণ-যে তোমার আলোকেরই একটি প্রকাশ, আমার দেহও তাই। …'

'সাবিত্রী' কবিতাটির সঙ্গে এই কথাগুলিকে মিলিয়ে নেওয়া যায়। কবিতাটি তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন ২৫ তারিখ বিকেলে, শেষ করেছেন ২৬-এর সকালবেলায়: 'কাল অপরাহ্ণে আচ্ছন্ন সূর্যের উদ্দেশে একটা কবিতা সুরু করেছি, আজ শেষ হ'ল।'

পাণ্ডুলিপিতে এবং 'প্রবাসী' পত্রিকায় মুদ্রণকালে (অগ্রহায়ণ ১৩৩১) কবিতাটির শেষ দুই স্তবকের আগে আরো এই দুটি স্তবক ছিল:

তোমার উৎসব-ধারা যাওয়া-আসা দু'কূল ধ্বনিয়া
ছুটে চলে যায়।
তোমার নর্তকীদল বিরহ মিলন ঝঞ্ঝনিয়া
খঞ্জনী বাজায়।
স্মৃতি-বিস্মৃতির ছন্দ-আন্দোলনে উত্তাল ছন্দিত
মুক্তি আর বন্ধ দোঁহে নৃত্য করে নূপুর-মন্দ্রিত,
দুঃখ আর সুখ।
বিশ্বের হৃৎপিণ্ড সেই দ্বন্দ্ববেগে নিয়ত স্পন্দিত
করে ধুক্ ধুক্॥

এই ভালো, এই মন্দ, এই ছন্দ আঘাতে সংঘাতে
নিক্‌ মোরে টেনে।
আলো আঁধারের দোলে পুনঃপুনঃ আশা আশঙ্কাতে
যাক্‌ মোরে হেনে।
সেই তরঙ্গের ঊর্দ্ধে দিক্‌ দেখা, হে রুদ্র নিষ্ঠুর,
জ্যোতিঃশতদল তব স্থির দীপ্ত আসন বিষ্ণুর
অম্লান মহিমা।
সব দ্বন্দ্ব মগ্ন করে গন্ধ তার আনন্দের সুর,
নাহি তার সীমা।।

পদধ্বনি। ২৪ অক্টোবরে আন্ডেস জাহাজে লেখা এই কবিতাটি প্রসঙ্গে ডায়ারি-র এই অংশটি[১১] লক্ষণীয় :

'বিষুবরেখা পার হয়ে চলেছি, এমন সময় হঠাৎ কখন শরীর গেল বিগড়ে ; বিছানা ছাড়া গতি রইল না। ··· রোগ-গারদের দারোগা আমার বুকের উপর দুর্বলতার বিষম একটা বোঝা চাপিয়ে রেখে দিলে ; মাঝে মাঝে মনে হত, এটা স্বয়ং যমরাজের পায়ের চাপ। দুঃখের অত্যাচার যখন অতিমাত্রায় চ'ড়ে ওঠে তখন তাকে পরাভূত করতে পারি নে ; কিন্তু তাকে অবজ্ঞা করবার অধিকার তো কেউ কাড়তে পারে না— আমার হাতে তার একটা উপায় আছে, সে হচ্ছে কবিতা-লেখা। ···

কয়দিন রুদ্ধকক্ষে সংকীর্ণ শয্যায় পড়ে পড়ে মৃত্যুকে খুব কাছে দেখতে পেয়েছিলাম, মনে হয়েছিল প্রাণকে বহন করবার যোগ্য শক্তি আমার শেষ হয়ে গেছে।'

কবিতাটির সঙ্গে রইল দুটি পাণ্ডুলিপি-চিত্র। কাটাকুটি থেকে ছবির আভাস। মনে রাখা ভালো যে এরও বেশ কয়েকদিন পরে তিনি পৌঁছবেন আর্জেন্টিনায়, পরিচিত হবেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে।

সাগরিকা। মায়র জাহাজ থেকে ১৯২৭ সালের দোসরা অক্টোবর অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে (চিঠিপত্র ১১, পৃ ৭২-৭৩) লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ: 'জাহাজে বসে একটা কবিতা লিখেচি। বউমাকে তার একটা কপি পাঠিয়েছি। কিন্তু ইতিমধ্যেই তার কিছু পাঠান্তর হয়েচে। তার প্রতি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে নূতন পাঠ তোমাকে পৃষ্ঠান্তরে পাঠাই।' অবশ্য এরও পরে, পয়লা অক্টোবরে লেখা এই কবিতার বহুল পরিবর্তন করেন কবি বাইশে অক্টোবর।

পাণ্ডুলিপি আর 'প্রবাসী'তেও (কার্তিক ১৩৩৪) 'বালী' নামের এই কবিতায় পঞ্চম স্তবকের পরে এই একটি অতিরিক্ত স্তবক ছিল :

পরের দিনে তরুণ উষা বেণুবনের আগে
জাগিল যবে নব অরুণরাগে
নীরবে আসি দাঁড়ানু তব আঙন-বাহিরেতে,
শুনিনু কান পেতে—

গভীর স্বরে জপিছ কোন্‌খানে
উদ্‌বোধন মন্ত্র যাহা নিয়েছ তব কানে,
একদা দোঁহে পড়েছি যেই মোহমোচন বাণী
মহাযোগীর চরণ স্মরি যুগল করি পাণি।

শিশুতীর্থ। ১৯৩০ সালের জুলাই মাসে জার্মানির ওবেরঅমেরগাউ গ্রামে সেখানকার বিখ্যাত প্যাশান প্লে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই দেখারই অভিঘাতে লেখা হয়েছিল The Child নামে তাঁর ইংরেজি কবিতা। সহচর অমিয় চক্রবর্তী দেশে তখন (২৪ জুলাই) খবর পাঠাচ্ছিলেন যে, 'রবীন্দ্রনাথ সারাদিন ধরে ইংরেজিতে একটা নূতন রকম টেকনীকে ফিল্মের জন্য নাটক লিখচেন। ছবির মতো এও তাঁর নূতন সৃষ্টির নেশা।'

এর বছরখানেক পর কবিতাটির বাংলা অনুবাদ হল 'শিশুতীর্থ' নামে। 'বিচিত্রা'য় প্রকাশকালে (ভাদ্র ১৩৩৮) অবশ্য নাম ছিল 'সনাতনম্ এনম্ আহুর্ উতাদ্যস্যাৎ পুনর্নবঃ'।

কলকাতায় 'গীতোৎসব' অনুষ্ঠানের (২৮ ভাদ্র—১ আশ্বিন ১৩৩৮) একটি অংশ ছিল এই 'শিশুতীর্থ' রচনাটির নৃত্যাভিনয়।

বহুদিন পরে, আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনটি হাতে পেয়ে, বুদ্ধদেব বসুকে লিখেছিলেন (২০ আগস্ট ১৯৪০) রবীন্দ্রনাথ[১৩]: 'সংকলনকর্তার কাছে আমার একটা কৃতজ্ঞতা নিবেদন করবার আছে। দীর্ঘকাল হোলো শিশুতীর্থ ব'লে একটি গদ্যছন্দের রচনা বানিয়েছিলেম। আজ পর্যন্ত সেটা কারো যে চোখে পড়েছে তার কোনো প্রমাণ পাই নি। তোমরা যে সেই কক্ষচ্যুত পথহারাকে অখ্যাতি থেকে উদ্ধার করেছ এতে খুশি হয়েছি।'

এইসঙ্গে মনে রাখা ভালো যে এই চিঠিটি লিখবার আগে সঞ্চয়িতার তিনটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়ে গেছে, তার অনেক গ্রহণবর্জনের ইতিহাসে 'শিশুতীর্থ' কবিতাটিকে কবি নিজেও কিন্তু কখনো গণ্য করেন নি।

প্রশ্ন। ১৩৩৮ সালের পৌষ মাসে লেখা এই কবিতাটির সঙ্গে আমরা মিলিয়ে নিতে পারি তাঁর সমকালীন গদ্যরচনার ('হিজলি ও চট্টগ্রাম')[১৪] কয়েকটি লাইন :

'এই-যে হিজলির গুলি চালানো ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা-কিছু আমার বলবার সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে।…

ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষকনামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরের নরঘাতক নিষ্ঠুরতা-দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে' (কার্তিক ১৩৩৮)।

'হিজলি কারার যে রক্ষীরা সেখানকার দুজন রাজবন্দীকে খুন করেছে তাদের প্রতি কোনো একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সংবাদপত্র খৃষ্টোপদিষ্ট মানবপ্রেমের পুনঃপুনঃ ঘোষণা করেছেন' (অগ্রহায়ণ ১৩৩৮)।

কালো ঘোড়া। নিজের এবং অন্য কয়েকজন শিল্পীর আঁকা একত্রিশটি ছবিকে অবলম্বন করে একত্রিশটি কবিতার সংকলন হল 'বিচিত্রিতা' (১৩৪০)। ছবিগুলিও বইটিতে মুদ্রিত। এরই

অন্তর্গত 'কালো ঘোড়া' লেখা হয়েছিল গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি থেকে।

'যারে নিয়ে এল সে-যে ব্যথায় মূর্তিত মোর প্রিয়া' লাইনটিতে 'মূর্তিত'র জায়গায় 'মূর্চ্ছিত' ছাপা আছে 'বিচিত্রিতা'র প্রথম সংস্করণে। বিশ্বভারতী-রচনাবলী বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রচনাবলীতে 'মূর্তিত'।

'কালো ঘোড়া' ছবিটিও এইসঙ্গে মুদ্রিত হল।

অনাগতা। মনীষী দে-র আঁকা ছবি থেকে এই কবিতা।

'সেই দূরে ছায়ারূপে রয়েছে সে' লাইনটির 'বিচিত্রিতা'-পাঠ 'সেই দূর ছায়ারূপে রয়েছে সে'। পাণ্ডুলিপি-সূত্রে বিশ্বভারতী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রচনাবলীতে 'দূরে'।

বাঁশি। গদ্যছন্দের উদাহরণ হিসেবে এই কবিতাটির ব্যবহার বহুল-প্রচলিত। কিন্তু এটি গদ্য-কবিতা নয়। মিলহীন ছন্দোবদ্ধ এই কবিতা। 'পরিশেষ' (১৩৩৯) থেকে 'পুনশ্চ'তে (১৩৩৯) গৃহীত এই কবিতা (এবং অনুরূপ আরো কয়েকটি কবিতা) প্রসঙ্গে 'পুনশ্চ'র এই ভূমিকাংশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়: 'এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্যছন্দ আছে, কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি।'

জলপাত্র। ১৩৩৯ সালের ৮ শ্রাবণ লেখা হল এই কবিতা, পরের বছর শ্রাবণে লেখা গদ্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'।

বিশ্বশোক। জার্মানিতে দৌহিত্র নীতীন্দ্র-র মৃত্যু হয় ১৩৩৯ সালের বাইশে শ্রাবণ। এগারোই ভাদ্র লেখেন 'বিশ্বশোক' কবিতাটি। ঠিক সেই সময়েই (২৮ আগস্ট ১৯৩২) মীরাদেবীকে এই চিঠিটি[১৫] লিখছিলেন কবি, '...লজ্জা হয় যদি আমার শোক নিয়ে একটুও সরে পড়ি সকলের সংসার থেকে, লেশমাত্র ভার চাপাই নিজের অচল বেদনা দিয়ে বিশ্ব-সংসারের সচল চাকার উপরে। কত অসহ্য দুঃখ বেদনা ঘরে ঘরে আছে, কাল প্রতিদিন তা একটু একটু করে মুছে মুছে দিচ্ছে। আমার জীবনের উপরেও সেই বিশ্বব্যাপী কালের হাত কাজ করচে। আর সেই জগৎজোড়া আরোগ্যের কাজকে যেন একটুও কঠিন না করি—শোকদুঃখের চলাচল সহজ হয়ে যাক, প্রাত্যহিক দিনযাত্রাকে বাধা না দিক্।...'

মনে হয়েছিল, আজ। কবিতাটির সঙ্গে তুলনীয় সমকালীন (২৮ আষাঢ় ১৩৪১) পাণ্ডুলিপির এই ছন্দোবদ্ধ রচনা[১৬]:

দুঃখ যেন জাল পেতেছে চার দিকে ;
চেয়ে দেখি যার দিকে
সবাই যেন দুর্গ্রহদের মন্ত্রণায়
গুমরে কাঁদে যন্ত্রণায়।
লাগছে মনে এই জীবনের মূল্য নেই,
আজকে দিনের চিত্তদাহের তুল্য নেই।
যেন এ দুখ অন্তহীন,
ঘরছাড়া মন ঘুরবে কেবল পন্থহীন।

এমন সময় অকস্মাৎ
মনের মধ্যে হানল চমক তড়িদ্‌ঘাত,
এক নিমেষেই ভাঙল আমার বন্ধ দ্বার,
ঘুচল হঠাৎ অন্ধকার।
সুদূর কালের দিগন্তলীন বাগ্‌বাদিনীর পেলেম সাড়া,
শিরায় শিরায় লাগল নাড়া।
যুগান্তরের ভগ্নশেষে
ভিত্তিছায়ায় ছায়ামূর্তি মুক্তকেশে
বাজায় বীণা ; পূর্বকালের কী আখ্যানে
উদার সুরের তানের তন্তু গাঁথছে গানে ;
দুঃসহ কোন্‌ দারুণ দুখের স্মরণ-গাঁথা
করুণ গাথা ;
দুর্দাম কোন্‌ সর্বনাশের ঝঞ্ঝাঘাতের
মৃত্যুমাতাল বজ্রপাতের
গর্জরবে
রক্তরঙিন যে-উৎসবে
রুদ্রদেবের ঘূর্ণি নৃত্যে উঠল মাতি
প্রলয়রাতি,
তাহারি ঘোর শঙ্কাকাঁপন বারে বারে
ঝংকারিয়া কাঁপছে বীণার তারে তারে।

জানিয়ে দিলে আমায়, অয়ি
অতীতকালের হৃদয়পদ্মে নিত্য-আসীন ছায়াময়ী,
আজকে দিনের সকল লজ্জা সকল গ্লানি
পাবে যখন তোমার বাণী,
বর্ষশতের ভাসান-খেলার নৌকা যবে
অদৃশ্যেতে মগ্ন হবে
মর্মদহন দুঃখশিখা
হবে তখন জ্বলনবিহীন আখ্যায়িকা,
বাজবে তারা অসীম কালের নীরব গীতে
শান্ত গভীর মাধুরীতে ;
ব্যথার ক্ষত মিলিয়ে যাবে নবীন ঘাসে,
মিলিয়ে যাবে সুদূর যুগের শিশুর উচ্চহাসে।

আধুনিকা। বিশ্বভারতী-রচনাবলীর (ত্রয়োবিংশ খণ্ড) গ্রন্থপরিচয়ে বলা আছে : '১৩৪১ সালের মাঘের "বিচিত্রা"য় "নারীপ্রগতি" কবিতাটি বাহির হইলে "অপরাজিতা দেবী" রবীন্দ্রনাথকে অনুরূপ ছন্দে একটি উত্তর লিখিয়া পাঠান। "আধুনিকা" কবিতাটি তাহারই প্রত্যুত্তরে

রচিত। অপরাজিতা দেবীর উত্তর "সে-কালিনী ও আধুনিকা" এবং রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর ১৩৪১ সালে চৈত্রের "প্রবাসী"তে (পৃ ৮২৯-৩৪) একত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।'

এখানে স্মরণীয় যে কবিতাটি প্রথমে ছিল 'বীথিকা' কাব্যে। 'দ্বারীর অনবধানে এই কবিতাটি "বীথিকা"য় অনধিকার প্রবেশ করেছিল। সেই পরিহসিতাকে যথাযোগ্য স্থানে ফিরিয়ে আনা গেল।' এই মন্তব্যসহ রবীন্দ্রনাথ লেখাটিকে পরে 'প্রহাসিনী'র (১৩৪৫) অন্তর্গত করেন। এই সংকলনেও তাই 'প্রহাসিনী'র লেখা হিসেবেই কবিতাটি চিহ্নিত হল।

নিমন্ত্রণ। কবিতাটি 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (১৩৪২ আষাঢ়) যেভাবে ছাপা হয়েছিল, তার পাঠ অনেকটাই ভিন্ন।

জয়ী। কবিতাটির প্রথম স্তবক লেখা হয়ে গিয়েছিল অনেকদিন আগে, একটু ভিন্ন চেহারায়। ১৯২৭ সালের ২৫ অক্টোবর আবা-মারু জাহাজের কর্মচারীদের জন্য একটি স্বাক্ষরলিপি ছিল সেই প্রথম স্তবক। একটি মরুভূমির ছবির ধারে লেখা হয়েছিল :

রূপহীন, বর্ণহীন, স্তব্ধমরু, নাই শব্দসুর—
তৃষ্ণাতরবারি হাতে আসন্ন মৃত্যুর—
সে-মহানৈঃশব্দমাঝে বেজে ওঠে মানবের বাণী,
"বাধা নাহি মানি।"

শেষ। ১৯৩৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বরে লেখা এই কবিতার 'বহি লয়ে অতীতের সকল বেদনা/…আলিঙ্গন ধীরে ধীরে শিথিল করিয়া/এই দেহ যেতেছে সরিয়া/মোর কাছ হতে' নিশ্চয় আমাদের মনে করিয়ে দেবে পরবর্তী 'প্রান্তিক'-এর বিখ্যাত উচ্চারণ : 'দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি/নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা'।

পৃথিবী। কবিতাটির তারিখ যদিও দেওয়া থাকে ১৬ অক্টোবর ১৯৩৫, কিন্তু ঐ তারিখের মূল পাণ্ডুলিপিতে অনেকটাই স্বতন্ত্র পাঠ পাওয়া যায়। সেই পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ মুদ্রিত আছে চলতি সঞ্চয়িতায়। অনেক পরিবর্তনের পর পাওয়া গেছে প্রচলিত এই পাঠ। প্রচলিত পাঠগুলিতেও

বনের মর্মরধ্বনি বাতাসের স্পর্ধায় ধৈর্য হারিয়েছে
অকস্মাৎ কল্লোলোচ্ছ্বাসে।

এই দুটি লাইনের একটি ভিন্ন রূপ আছে :

বনের মর্মরধ্বনি ঝঞ্ঝাবায়ুর স্পর্ধায় ধৈর্য হারিয়েছে
অকস্মাৎ কলোচ্ছ্বাসে।

বিশ্বভারতী-রচনাবলী, চয়নিকা বা সঞ্চয়িতার নজিরে প্রথম পাঠটিই গৃহীত হল। স্মরণীয় যে এই পাঠ কবির জীবনকালের শেষ-সংস্করণ সঞ্চয়িতাতেও (বৈশাখ ১৩৪৬) ছিল।

আফ্রিকা। এ কবিতার দুটি স্বতন্ত্র ছন্দোবদ্ধ পাঠও আছে। বিশ্বভারতী-রচনাবলীর (বিংশ খণ্ড) 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে তা মুদ্রিত।

বিশ্বভারতী বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রচনাবলীতে কবিতাটির তারিখ দেওয়া আছে ২৮ মাঘ। কিন্তু ২৬ মাঘ যে এর তারিখ (সঞ্চয়িতায় সেইরকমই আছে) তা বোঝা যায় অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে। ২৭ মাঘ (৯ ফেব্রুয়ারি) তারিখের চিঠিতে তিনি লিখছেন[১৭], 'আফ্রিকার উপরে কবিতা লিখতে অনুরোধ করেছিলে। লিখেছি। কিন্তু কিসের জন্যে বুঝতে পারি নে। আধুনিকের ভঙ্গী আমার অনভ্যস্ত।' এই চিঠিতেই ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখ-চিহ্নিত যে 'আফ্রিকা' কবিতাটি পাওয়া যাচ্ছে, তার দুটি মাত্র লাইনে সামান্য বদল হয়েছে পরে। প্রথম লাইনে 'যুগে'র বদলে ছিল 'যুগ', আর শেষ দিক থেকে তৃতীয় লাইনটিতে 'বলো, ক্ষমা করো'র বদলে ছিল 'ক্ষমাভিক্ষা করো—'। এই মাত্র।

'এসো যুগান্তের কবি' লাইনটি বিশ্বভারতী-রচনাবলীতে অনেকদিন ধরে ছাপা হয়ে আসছে 'এসো যুগান্তরের কবি'। পাণ্ডুলিপি থেকে শুরু করে অন্য সমস্তরকম মুদ্রণেই 'যুগান্তের' আছে।

শ্যামা। এই কবিতার একটি লাইনে দুই ভিন্ন পাঠ আছে। 'ঘরের দক্ষিণে খোলা দ্বার' আর 'ঘরের দক্ষিণখোলা দ্বার'। প্রথমটিই বহুল প্রচলিত, কিন্তু 'আকাশপ্রদীপ'-এর (১৩৪৬) নজিরে দ্বিতীয়টিই এখানে গৃহীত হল।

উদ্‌বৃত্ত। এখান থেকে শুরু করে 'আসা-যাওয়া' পর্যন্ত পাঁচটি রচনার গীতিরূপগুলিই বেশি পরিচিত। এর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগে গান, পরে তাকে কবিতার চেহারা দেওয়া হয়েছে। গীতিরূপগুলিও এখানে দেওয়া হল :

যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম তব অকৃপণ করে,
মন তবু জানে জানে—
চকিত ক্ষণিক আলোছায়া তব আলিপন আঁকিয়া যায়
ভাবনার প্রাঙ্গণে॥
বৈশাখের শীর্ণ নদী ভরা স্রোতের দান না পায় যদি
তবু সংকুচিত তীরে তীরে
ক্ষীণ ধারায় পলাতক পরশখানি দিয়ে যায়,
পিয়াসি লয় তাহা ভাগ্য মানি॥
মম ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে
যতটুকু পাই রয় উচ্ছলিতে।
দিবসের দৈন্যের সঞ্চয় যত
যত্নে ধরে রাখি,
সে যে রজনীর স্বপ্নের আয়োজন।

আধোজাগা। গানের রূপ ছিল :

স্বপ্নে আমার মনে হল কখন ঘা দিলে আমার দ্বারে, হায়।
আমি জাগি নাই জাগি নাই গো,
তুমি মিলালে অন্ধকারে, হায়॥

অচেতন মনোমাঝে তখন রিমিঝিমি ধ্বনি বাজে,
কাঁপিল বনের ছায়া * ঝিল্লিঝংকারে।
আমি জাগি নাই জাগি নাই গো, নদী বহিল বনের পারে ॥

পথিক এল দুই প্রহরে পথের আহ্বান আনি ঘরে।
শিয়রে নীরব বীণা বেজেছিল কি জানি না—
জাগি নাই জাগি নাই গো,
ঘিরেছিল বনগন্ধ ঘুমের চারি ধারে ॥

দেওয়া-নেওয়া। ১৯৪০ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখের কবিতা ১৯৩৯ সালের ৩০ জুলাই তারিখে এই গান হিসেবে প্রথম লেখা হয়েছিল :

বাদল-দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান,
আমি দিতে এসেছি শ্রাবণের গান ॥
মেঘের ছায়ায় অন্ধকারে রেখেছি ঢেকে তারে
এই-যে আমার সুরের ক্ষেতের প্রথম সোনার ধান ॥
আজ এনে দিলে, হয়তো দিবে না কাল—
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল।
এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে তব বিস্মৃতিস্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী বহি তব সম্মান ॥

নতুন রঙ। এ কবিতাও ১৯৪০ সালের ১৩ জানুয়ারির, কিন্তু এর গানের রূপ প্রায় দশ মাস আগেকার, ফাল্গুন ১৩৪৫ (মার্চ-এপ্রিল ১৯৩৯)। গানেরও আছে দুই ভিন্ন পাঠ :

১· ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লান স্মৃতি।
সেই সুরের কায়া মোর সাথের সাথি, স্বপ্নের সঙ্গিনী,
তারি আবেশ লাগে মনে বসন্তবিহ্বল বনে ॥
দেখি তার বিরহী মূর্তি বেহাগের তানে
সকরুণ নত নয়ানে।
পূর্ণিমা জ্যোৎস্নালোকে মিলে যায়
জাগ্রত কোকিল-কাকলিতে মোর বাঁশির গীতে ॥

২· ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত মলিন যেই স্মৃতি
মুছে-আসা সেই ছবিটিতে রঙ এঁকে দেয় মোর গীতি।
বসন্তের ফুলের পরাগে যেই রঙ জাগে,
ঘুম-ভাঙা পিক-কাকলিতে যেই রঙ লাগে,
যেই রঙ পিয়ালছায়ায় ঢালে শুক্লসপ্তমীর তিথি ॥
সেই ছবি দোলা খায় রক্তের হিল্লোলে,
সেই ছবি মিশে যায় নির্ঝরকল্লোলে,
দক্ষিণসমীরণে ভাসে, পূর্ণিমাজ্যোৎস্নায় হাসে—
সে আমারি স্বপ্নের অতিথি ॥

* স্বরলিপির পাঠ 'হাওয়া'

আসা-যাওয়া। এটির ক্ষেত্রে অবশ্য গীতিরূপটি পরে। কবিতার সময় ২৮ মার্চ ১৯৪০, গানের সময় ১০ এপ্রিল ১৯৪০।

প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে।
তাই স্বপ্ন মনে হল তারে—
দিই নি তাহারে আসন।
বিদায় নিল যবে, শব্দ পেয়ে গেনু ধেয়ে।
সে তখন স্বপ্ন কায়াবিহীন
নিশীথতিমিরে বিলীন—
দূরপথে দীপশিখা রক্তিম মরীচিকা ॥

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে। 'জন্মদিনে' বইটির শিরোনামহীন কুড়ি-সংখ্যক কবিতাটি এই নামে ছাপা হয়েছিল 'প্রবাসী' পত্রিকায়, ১৩৪৭ সালের চৈত্র মাসে।

গহন রজনী। ১৩৪৭ সালের পৌষে 'প্রবাসী'তে এই নামে ছাপা হয়েছিল 'রোগশয্যায়' বইটির সাত নম্বর কবিতা।

ঐকতান। 'জন্মদিনে'র দশ-সংখ্যক কবিতার এই বহুল-পরিচিত নামটি ছিল 'প্রবাসী'-তে, ১৩৪৭ সালের ফাল্গুনে। বিশ্বভারতী-রচনাবলীতে এই কবিতার তারিখ ছাপা আছে ২১ জানুয়ারি।

রূপনারানের কূলে। শ্রীমতী রানী চন্দ তাঁর 'আলাপচারি-রবীন্দ্রনাথ' বইটিতে ১৪ মে (১৯৪১) তারিখের ডায়েরি হিসেবে লিখেছেন[১৮]: 'ভোরবেলা গুরুদেবের ঘরে ঢুকে দেখি তিনি তখনো ঘুমোচ্ছেন, তাঁর বিছানার পাশে একখানি ছোটো কাগজে লেখা আছে কয়েক লাইন কবিতা। শেষ-রাত্রে গুরুদেব বলেছেন— কাছে যিনি ছিলেন লিখে রেখেছেন··· ।'

কাগজটিতে লেখা ছিল 'রূপনারানের কূলে' কবিতাটির প্রথম এগারো লাইন। এর পর: 'গুরুদেব জাগলেন; হাত-মুখ ধোবার পর কফি খেলেন। পরে কবিতাটি তাঁকে দেখালুম। তিনি কাগজটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, আরো কয়েক লাইন লিখে রাখ্:

সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন—
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দিতে।

তারপর বললেন: আসল কথাটা কী জানিস, রাত্রি হচ্ছে ঘুমে স্বপ্নে অন্ধকারে জড়িত। এই স্বপ্ন মানুষের বুদ্ধিকে দুঃখ দিয়ে বেড়ায়। এই কুহেলিকা যখন সরে যায় তখনি দেখা যায় সত্যের রূপ। আমরা রাত্রিবেলায় থাকি সেই কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে। সকাল চাই কেন। কেন থাকি ভোরের আলোর জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে। ভোরের আলো আমাদের প্রাণে আশ্বাস এনে দেয়। পৃথিবীর সত্যরূপ-বাস্তবরূপ দেখায়। তখন আর ভাবনা থাকে না। সত্য কঠিন—অনেক দুঃখ, দাবি নিয়ে আসে। স্বপ্নে তা তো থাকে না, কিন্তু তবুও আমরা সেই কঠিনকেই ভালোবাসি। ···'

কবিতাটির রচনাকাল হিসেবে সাধারণত দেওয়া থাকে ১৩ মে। কিন্তু এই বর্ণনা অনুযায়ী হওয়া উচিত ১৩-১৪ মে।

প্রথম দিনের সূর্য। কবিতাটি প্রসঙ্গে 'গুরুদেব' বইটিতে লিখেছেন শ্রীমতী রানী চন্দ[১৯] : 'আজ ২৭শে। সকালে গুরুদেব একটি কবিতা মুখে মুখে বললেন, আমি লিখে নিলাম। ...গুরুদেব বললেন, সকালবেলার অরুণ আলোর মতো মনে পড়ে কয়েক লাইন— লিখে রাখ্, নয়তো হারিয়ে ফেলব। প্রত্যেক বারই ভাবি ঝুলি খালি হয়ে গেল— এবারে চুপচাপ থাকি ; পারি নে। এ পাগলামি নয়তো কি ?

কবিতার কয়েকটা জায়গায় বলে বলে কাটাকুটি করালেন। ফিরে আর-একটা কাগজে তা লিখে দিলাম গুরুদেবকে। গুরুদেব শুয়ে শুয়েই বুকের উপরে কবিতার কাগজটি ধরে আরো তিন জায়গায় নিজের হাতে কেটে অন্য কথা বসালেন।'

দুঃখের আঁধার রাত্রি। ২৯ জুলাই তারিখে লেখা এই কবিতাটির বিষয়ে শ্রীমতী রানী চন্দের ডায়েরি[২০] : 'আজ বিকেলে গুরুদেব একটি কবিতা বললেন, লিখে নিলাম। কবিতাটি বলা শেষ হয়ে গেলে ধীরে ধীরে যেন আপন মনেই বললেন, ভয়কে ভয় করলেই ভয়।'

তোমার সৃষ্টির পথ। অপারেশনের অল্প আগে লেখা কবিজীবনের এই শেষ কবিতাটি বিষয়ে শ্রীমতী রানী চন্দ লিখেছেন[২১] : 'গুরুদেব অনেকক্ষণ হল চুপ করে আছেন। কি যেন ভাবছেন। বুঝলাম কিছু কথা মনে এসেছে— কাগজ কলম নিয়ে পাশে বসলাম। আমাকে কাছে বসতে দেখে ইশারা করলেন— লেখো। আমি লিখে যেতে লাগলাম, গুরুদেব ধীরে ধীরে বলে যেতে লাগলেন—'

এর পর কবিতাটির একুশ লাইন উদ্‌ধৃত করে রানী চন্দ আবার লিখেছেন : 'কবিতাটি বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন গুরুদেব। আজকাল কিছু ভাবতে গেলে অল্পেতেই তাঁর ক্লান্তি আসে ; এ কথা তিনি নিজেও বলেন।

গুরুদেব আবার বুকে দু হাত জড়ো করে চুপচাপ চোখ বুজে রইলেন। অনেকক্ষণ কাটল এইভাবে, সাড়ে নয়টার সময় বললেন, লিখে নে—

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

বললেন, সকালবেলার কবিতাটির সঙ্গে জুড়ে দিস।'

সেইদিনই যে অপারেশন, তখনও পর্যন্ত তা জানতেন না রবীন্দ্রনাথ। সাড়ে দশটার সময়ে তাঁকে হঠাৎ জানানো হল যে সেদিনই ওটা হয়ে যাবে। তার পর, রানী চন্দের বর্ণনায় :

'গুরুদেব একটু হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, আজই ? পরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তা ভালো, এ রকম হঠাৎ হয়ে যাওয়াই ভালো।

'তারপরে আর আমাদের সঙ্গে তেমন কোনো কথাবার্তা কইলেন না।

'কিছুক্ষণ বাদে কেবল বললেন, একবার পড়ে শোনা তো কি লিখেছি আজ।

'কবিতাটি পড়ে শোনালাম। বললেন, কিছু গোলমাল আছে— তা থাক্, ডাক্তাররা তো বলছে অপারেশনের পরে মাথাটা আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে; ভালো হয়ে পরে ঠিক করব'খন।'

ঠিক করা আর হয় নি। অপারেশন হয় এগারোটা কুড়ি মিনিটে। কয়েকদিন আচ্ছন্ন ভাবে কাটাবার পর মৃত্যু হল ৭ আগস্ট।

১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, প্রথম খণ্ড, ১৩৭৭, পৃ ১১৯।
২ জীবনস্মৃতির জন্মকথা, শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৮৩, পৃ ১৩।
৩ ক্ষিতিমোহন সেন, বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, ১৩৬২, পৃ ৫।
৪ তদেব, পৃ ৩৮।
৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৯৫৭, পৃ ১৬।
৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র, প্রথম খণ্ড, ১৩৭২, পৃ ৪৭।
৭ রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৪৮, পৃ ৫৯৫-৯৬।
৮ রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৭২, পৃ ২২৮।
৯ ক্ষিতিমোহন সেন, বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, ১৩৬২, পৃ ৬১।
১০ শ্রীকানাই সামন্ত, রবীন্দ্রপ্রতিভা, ১৩৬৮, পৃ ৩৯৬।
১১ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ঊনবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৫২, পৃ ৩৭৫, ৪৩৮।
১২ তদেব, পৃ ৪২৭-২৮।
১৩ ২০ আগস্ট ১৯৪০ তারিখে লেখা এই চিঠি 'কবিতা' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় ১৩৪৮ সালের পৌষে। আরো দ্রষ্টব্য, 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮১, পৃ ১৮।
১৪ রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৫৪, পৃ ৪৫৩-৫৪, ৪৫৫।
১৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র, চতুর্থ খণ্ড, ১৩৫০, পৃ ১৫০-৫১।
১৬ রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৫১, পৃ ১২৩-২৪।
১৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র, একাদশ খণ্ড, ১৩৮১, পৃ ২০১।
১৮ শ্রীরানী চন্দ, আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯০, পৃ ১০১-০২।
১৯ শ্রীরানী চন্দ, গুরুদেব, ১৩৮৭, পৃ ১৫৭।
২০ তদেব, পৃ ১৬০।
২১ তদেব, পৃ ১৬০-৬৩।

## শিরোনাম-সূচী

শিরোনাম। গ্রন্থ



শিরোনাম। গ্রন্থ

## প্রথম ছত্রের সূচী